দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন

ডেল কার্নেগী

("হাউ টু স্টপ্ ওরিং এণ্ড স্টার্ট লিভিং বাই—ডেল কার্নেগী)

সম্পাদনা ও ভাষান্তর

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

● পরিবেশক ●

নাথ ব্রাদার্স ● ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
স্বাধীনতা দিবস-১৯৫৮

পুনর্মুদ্রণ ঃ মার্চ ১৯৮৯
পুনর্মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর ১৯৯৬

প্রকাশক ঃ
এস, নাথ
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদপট ঃ কুমার অজিত

মুদ্রক ঃ
ট্রায়ো প্রসেস,
পি, ১২৮ সি আই টি রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০১৪ -

প্রকাশকের নিবেদন

সারা পৃথিবীতে আজ ডেল কার্নেগীর নাম জানেন না এমন একজনও শিক্ষিত মানুষ নেই। আজ পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডেল কার্নেগীর লেখা বই পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

একখানি বই লিখে মানুষের মনে চিরকালের জন্য আসন পেয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যা দুনিয়ায় নিঃসন্দেহে তেমন বেশি নেই। অথচ এই মানুষটি একদিন সামান্য ভাবেই তাঁর কর্মজীবন সুরু করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে আত্মবিশ্বাস আর কর্মশক্তি বাড়িয়ে তুলে কার্নেগী তাদের সুখী আর দুশ্চিন্তাহীন জীবনের সন্ধান দিয়েছেন।

১৯১২ সালে ওয়াই. এম. সি. এ'র হয়ে নিউ ইয়র্ক শহরে শিক্ষকের জীবন বেছে নিয়েছিলেন ডেল কার্নেগী। সমাজের উঁচু স্তর থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত তাঁর ছাত্র হতে দ্বিধা করেন নি। সকলের কথা চিন্তা করেই তিনি লিখে ফেলেন 'প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ'-গ্রন্থটি, আর এই বই তাঁকে তুলে নিয়ে যায় জনপ্রিয়তার উচ্চতম শিখরে। বই আরও কয়েকখানি লিখেছিলেন ডেল কার্নেগী, এবং সব কটি বই-ই মানুষকে তার জীবন উপভোগ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে চলেছে আজও।

আজও লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে চলেছে কার্নেগীর বইগুলি।

ডেল কার্নেগীর অন্যান্য বই

* প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ
* ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সাফল্যের সহজ উপায়
* জনসংযোগ ও বিক্রয় প্রতিনিধি কিভাবে হবেন
* স্বামীর সাফল্যে স্ত্রীর ভূমিকা

কি এমন বাস্তব, যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য আছে যার জন্য এই বই পড়তে হবে ?

★ এই বই মানুষের যত রকমের দুশ্চিন্তা আছে তা দূর করতে সাহায্য করবে।

★ ব্যবসার বা কাজের আনুষঙ্গিক নানা দুশ্চিন্তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দূর করবে।

★ আপনি হয়ত আর্থিক দুশ্চিন্তায় জর্জরিত, এ বই আপনাকে ঐ দুশ্চিন্তা দূর করতে সাহায্য করবে।

★ অন্যের বিরূপ সমালোচনা আপনার ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে আপনাকে ঠিক পথে চলতে সাহায্য করবে।

★ গৃহকর্ত্রীরা এ বই থেকে কি ভাবে অবসাদ দূর করা যায় আর সজীবতা বজায় রাখা যায় জানতে পারবেন।

★ অবসাদ আর দুশ্চিন্তা কাটানোর চারটি কার্যকর পথের সন্ধানও এ বইতে দেওয়া হয়েছে।

★ এ বইতে পাবেন কি করে আপনার জীবনে অতিরিক্ত একটু সময় কাজে লাগাতে পেরে সুখী হতে পারেন।

★ আবেগ সংক্রান্ত ব্যাপারে কি ভাবে স্থির থাকা যায় এ বইয়ে সেকথা বিশদ ভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে।

★ কি ভাবে নিদ্রাহীনতার দুশ্চিন্তা দূর করে সুখী হতে পারেন সে কথাও এ বইয়ে লিপিবদ্ধ আছে।

★ এ বইয়ের বিশেষত্ব এই যে এতে প্রতিটি মানুষের, অর্থাৎ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার জীবনের যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয় সেই সমস্ত সমস্যা থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় এ বইয়ে তা পরিষ্কার ভাবে যুক্তি এবং তথ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া আছে এমন সব মানুষদের কথা যাঁরা দারিদ্রের চরমতম অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে উন্নতির চরম শিখরে উঠেছেন। আপনি যদি ভগবানে বিশ্বাসী হন তাহলে এই বই পাঠে আপনার জীবনযাত্রার পথ সুগম হবে। আর যদি নাস্তিক হন তাহলেও এ বই আপনার এগিয়ে যাওয়ার পথে সহায়ক হবে। দীর্ঘ সাত বছর অমানুষিক পরিশ্রমের ফসল এই বইটি। এর মধ্যে কোন রকম অযৌক্তিক বা অবাস্তব ঘটনার অবতারনা করা হয় নি। সেজন্য বাঙলা ভাষায় অনূদিত করা হল তাঁদের জন্য, যাঁরা বেকার, হতাশাগ্রস্ত এবং বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত।

'হে ঈশ্বর, আমাকে শান্তির কাজে নিয়োজিত করুন। যেখানে ঘৃণা আছে, সেখানে আমায় ভালবাসার বীজ বপন করতে দিন। যেখানে আঘাত আছে, সেখানে মার্জ্জনা করতে দিন। যেখানে সন্দেহ সেখানে দিন বিশ্বাস। যেখানে হতাশা, সেখানে আসুক আশা। যেখানে অন্ধকার সেখানে আসুক আলোক। হে পবিত্র প্রভু, আমি সান্ত্বনা চাই না—সান্ত্বনা দিতে চাই—ভালবাসা চাই না, ভালবাসতে চাই—ক্ষমা করলেই যেহেতু ক্ষমা পাওয়া যায়, তাই মৃত্যুর মধ্যেই ফিরে পাই অনন্ত জীবন!

—ফ্রান্সিস।

বিষয়ক্রমিক সূচী

—মুখবন্ধ—

এ বই কিভাবে লেখা হয় আর—কেন

পঁয়ত্রিশ বছর আগে নিউইয়র্কে আমিই ছিলাম সবচেয়ে এক অসুখী ছেলে। জীবিকার জন্য আমি মোটর ট্রাক বিক্রি করতাম। মোটর ট্রাক কিভাবে চলে আমি জানতাম না, জানার ইচ্ছেও ছিলনা। আমার কাজকে আমি ঘৃণা করতাম। আরশোলায় ভরা ওয়েস্ট ফিফ্‌টি সিক্সথ স্ট্রীটের একটা সস্তা কামরায় বাস করতেও আমার ঘৃণা হত। আমার মনে পড়ছে একদিন দেয়ালে টাঙানো একটা টাই নিতেই একগাদা আরশোলা ছড়িয়ে পড়েছিলো। নোংরা সব রেস্তোরায় খাবার খেতেও আমার ঘৃণা হতো। সেখানেও আরশোলা ছড়িয়ে থাকতো।

প্রতিদিন রাত্তিরে দারুণ যন্ত্রণা নিয়ে ঘরে এসে পেঁছিতাম—হতাশ, চিন্তা তিক্ততা আর বিদ্রোহের চিন্তায় সেই মাথার যন্ত্রণা। বিদ্রোহের কথা জাগতো আমার কলেজের সেই স্বপ্নের কথা ভেবে। ভবিষ্যত জীবনের কত স্বপ্নময় ছবিই না সে সময় আঁকতাম—আজ সেসব হয়ে উঠেছে দুঃস্বপ্ন। এটাই কি জীবন? যে স্বপ্নাবিষ্ট ভবিষ্যতের কথা ভেবেছি এটা কি তাই? এটাই কি আমার কাছে জীবনের অর্থ—যে কাজ পছন্দ করিনা তাই করা, আরশোলাময় ঘরে থাকা, নোংরা খাবার খাওয়া—আর ভবিষ্যতের কোন আশা না রাখা?…আমি শুধু চাইতাম পড়তে আর কলেজ জীবনে যে বই লেখার স্বপ্ন দেখতাম তাই লিখতে।

আমি জানতাম যে কাজ পছন্দ করিনা সেটা ছেড়ে দিলে লোকসানের বদলে আমার লাভই হবে। আমার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা চাইনা, আমি চাইতাম ভালভাবে বাঁচতে। ছোট্ট করে বললে আমি একটা সন্ধিক্ষণে এসে পেঁছেছিলাম—এমন অবস্থা নতুন জীবন সুরু করতে যাওয়া সব তরুণ তরুণীর জীবনেই একসময় আসে। অতএব আমি আমার মনস্থির করে ফেললাম—আর সেই সিদ্ধান্ত আমার জীবনেই আমূল পরিবর্তন এনে দিল। সেই থেকে গত পঁয়ত্রিশ বছর আমি জীবনে যে সুখ আর সমৃদ্ধির স্বাদ পেয়েছি তা আকাশ কুসুম উচ্চাশারও বাইরে।

আমি যা ঠিক করলাম তা এই: যে কাজে ঘেন্না হয় সেটা আমি ছেড়ে দেব, আর যেহেতু মিসৌরীর ওয়ারেনসবুর্গের স্টেট টিচার্স কলেজে চার বছর পড়াশুনা করেছি, তাই আমি রাত্রে বয়স্কদের শিক্ষাদান করে আমার জীবিকা অর্জন করব। এরপর আমি সারাদিন বই পড়ার সময় পাবো, শিক্ষাক্রম তৈরি করব, উপন্যাস আর ছোট গল্প লিখব। আমি চাই 'লেখার জন্য বাঁচতে, আর লিখে বাঁচতে'।

বয়স্কদের রাত্রি বেলায় কি বিষয় শেখাবো? আমার কলেজ জীবনের কথা চিন্তা করতেই মনে পড়লো আমি জনগণের সামনে বক্তৃতা দেবার যে শিক্ষা পেয়েছি আর অভিজ্ঞতা হয়েছে সে আমার কলেজী আর অন্যান্য শিক্ষার চেয়ে ঢের বেশি। কেন?

কারণ ঐ শিক্ষার ফলেই মানুষের সঙ্গে মেলামেশার পক্ষে আমি সাহস আর নিশ্চিন্ততা অর্জন করেছি· আমার ভীরুতা আর আত্মবিশ্বাসের অভাব দূর হয়ে গেছে।

এই কারণেই আমি কলম্বিয়া আর নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের রাতের ক্লাশে বক্তৃতা দেওয়া শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষক পদে নিয়োগের আবেদন পাঠাই। তবে ওই বিশ্ববিদ্যালয় দুটি জানালো তারা আমার সাহায্য ছাড়াই চালাতে পারবে।

তখন সত্যিই হতাশ হয়েছিলাম—তবে এখন আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা আমায় প্রত্যাখ্যান করে খুব উপকার করেছিলেন। কারণ আমি ওয়াই· এম· সি-এর রাতের স্কুলে পড়ানো সুরু করি, সেখানে আমার শিক্ষকতার দ্রুত আর হাতে হাতে ফল দেখাতে হতো। সেটা একটা পরীক্ষা বটে! ওই বয়স্করা আমার ক্লাসে কলেজী শিক্ষা আর সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে আসতেন না। তারা একটা কারণেই আসতেন: তাদের সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করতে। তারা চাইতেন যোগ্যতা নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাবলম্বী হতে, যাতে কোন ব্যবসা সংক্রান্ত সভায় ভয়ে জ্ঞান না হারিয়ে দুটো কথা বলতে পারেন। সেলসম্যানরা চাইতেন কড়া ধাতের ক্রেতাদের সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলার সাহস, এবং যাতে ঘাবড়ে গিয়ে ওই বাড়ির চারপাশে বার তিনেক চক্কর না দিতে হয়। তারা চাইতেন দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস। তারা ব্যবসায় উন্নতি চাইতেন আর—চাইতেন পরিবারের সুখ সমৃদ্ধির জন্য আরও বেশি টাকা রোজগার করতে। আমার ছাত্ররা যেহেতু কিস্তিতে তাদের মাইনে দিতেন—ফল না পেলেই সেটা দিতেন বন্ধ করে—আর আমারও নিয়মিত মাইনের কোন ব্যবস্থাও ছিলো না, ছিলো কেবল লাভের কিছু অংশ, অতএব বাঁচার জন্যে আমাকেও শিক্ষাদানের সময় বক্তৃতার ব্যবহারিক দিকটা নিয়ে সতর্ক থাকতে হতো।

তখন আমার মনে হতো খুব অসুবিধে নিয়ে শিক্ষকতা করছি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি সে সময় আমি কি অমূল্য শিক্ষাই না পেয়েছি। আমার ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতে হতো, তাদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে হতো। প্রতিটি শিক্ষাক্রমে আমাকে এমন অনুপ্রেরণা দিতে হতো যাতে তারা আবার আসে।

কাজটা বেশ উত্তেজনারই ছিলো, আমিও ভালোবাসতাম। আমি দেখে তাজ্জব হয়ে যাই, ওই ব্যবসাদার ছাত্ররা কি দ্রুত আত্মবিশ্বাস লাভ করে কেউ কেউ আবার পদোন্নতি আর বাড়তি মাইনেও পেয়ে যায়। আমার শিক্ষকতায় অতি আশাবাদী মনোভাবের চেয়ে ঢের বেশি সাফল্য এলো। তিনটে শিক্ষাক্রমের মধ্যে যে ওয়াই· এম· সি· এ· আমাকে প্রতি রাতে পাঁচ ডলারের বেশি দিতে চায়নি তারাই আমায় দিতে সুরু করলো ত্রিশ ডলার করে। প্রথমে আমি জনগণের সামনে বক্তৃতা দেওয়া শেখাতাম, পরে বুঝলাম ওই বয়স্কদের শেখা দরকার প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ কিভাবে করতে হয়। যেহেতু মানবিক সম্পর্কের বিষয়ে কোন বই পেলাম না সেহেতু আমি নিজেই একখানা বই লিখবো ঠিক করলাম। সেটা লেখাও হলো—তবে যেভাবে লেখা হয় সেভাবে নয়। বইখানা বেড়ে উঠলো এই বয়স্কদের ক্লাসে আমার সব অভিজ্ঞতায় নির্ভর করে। আমি বইটার নাম দিলাম 'প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ'।

বইখানা শুধু আমার নিজের বয়স্ক শিক্ষার ক্লাসের জন্য লিখেছিলাম, তাছাড়া সবার অজানা আরও চারখানা বইও আমি লিখেছিলাম, কিন্তু আদৌ ভাবিনি এগুলো খুব ভালো বিক্রি হবে। আমি বোধ হয় আজকের সবচেয়ে অবাক হওয়া কোনো লেখকের মধ্যে একজন।

সময় কেটে চলার ফাঁকে আমি বুঝলাম ঐসব বয়স্কদের সবচেয়ে বড় সমস্যা বোধ হয় দুশ্চিন্তা। আমার ছাত্রদের এক বিরাট অংশই ছিলেন ব্যবসায়ী, উচ্চপদের কর্মী, সেলসম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট এইসব নানা জীবিকার মানুষ—আর তাদের সকলেরই ছিলো নানা দুশ্চিন্তার সমস্যা। আমার ক্লাসে মেয়েরাও ছিলেন—কেউ ব্যবসা করতেন, কেউ ঘরকন্না। তাদেরও সমস্যা ছিলো। এটা তাই পরিষ্কার বুঝতে পারলাম এমন একখানা বই দরকার যাতে দুশ্চিন্তা দূর করার পথ বাতলে দেওয়া আছে। আমি নিউ ইয়র্কের ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউর পাবলিক লাইব্রেরীতে গিয়ে খোঁজ করতেই দেখলাম সেখানে 'দুশ্চিন্তা' সম্পর্কে মাত্র বাইশখানা বই আছে। অথচ অবাক হয়ে দেখলাম কীট (ক্রিমি) সম্বন্ধে বই রয়েছে একশ উননব্বই খানা। একেবারে নয় গুণ বেশি বই রাখা আছে দুশ্চিন্তার চেয়ে! অবাক হওয়ার মত নয়? যেহেতু দুশ্চিন্তা ব্যাপারটি আজকের দুনিয়ায় সকলের কাছেই মস্ত একটা সমস্যা তাই আপানার কি মনে হয় না যে প্রতিটি হাইস্কুল আর কলেজে 'দুশ্চিন্তা' কেমন করে দূরে করতে হয়, সে সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা একান্ত উচিত? তা সত্ত্বেও বলছি দেশের কোনো কলেজে যদি এমন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতো নিশ্চয়ই শুনতাম। তাই আশ্চর্য হওয়ার কারণ নেই ডেভিড শীবারি তার 'কিভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থেকে সফল হতে হয়' বইটিতে বলেছেন : 'আমরা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হই জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতাব নিরন্তর চাপে—যেভাবে চিন্তাশীল কোন ব্যক্তিকে হঠাৎ ব্যালে নাচতে বলায় তার যা অবস্থা হয় সেইভাবে।'

এর ফলশ্রুতি কি রকম? তাজ্জব হওয়ার মতই। আমাদের হাসপাতাল গুলোর অর্ধেকেরও বেশি স্নায়বিক আর ভাবালুতায় আক্রান্ত রোগীতেই ভর্তি।

আমি ওই লাইব্রেরীর তাকে রাখা বাইশখানা দুশ্চিন্তা সম্পর্কের বই নাড়াচাড়া করলাম। তাছাড়া দুশ্চিন্তা সম্পর্কে লেখা যতগুলি পেলাম সব কিনেও ফেললাম, তবুও আমার বয়স্কদের ক্লাসে কাজে লাগাতে পারি এমন একখানা বইও পেলাম না। তাই ঠিক করলাম নিজেই একখানা বই লিখে ফেলবো।

সাত বছর আগে বইটি লেখার জন্য নিজেকে তৈরি করলাম। কেমন ভাবে? যুগ যুগ ধরে দার্শনিকরা দুশ্চিন্তা নিয়ে যা বলেছেন সে সব পড়ে ফেললাম। তাছাড়া পড়লাম কনফুসিয়াস থেকে চার্চিল পর্যন্ত শত শত জীবনী। তাছাড়াও আমি নানা ধরনের মানুষের সাক্ষাৎকার নিলাম যেমন জ্যাক ডেম্পসী, জেনারেল ওমার ব্র্যাডলি, জেনারেল মার্ক ক্লার্ক, হেনরি ফোর্ড, এলিনর রুজভেল্ট ও ডরোথি ডিক্স। তবে এসব ছিলো ভূমিকা মাত্র, তখন আমি নিজেকে লেখার জন্য তৈরী করছিলাম।

শুধু দেখা সাক্ষাৎ আর পড়া ছাড়াও আমি আর একটা কাজও করি, সেটা ঢের

বেশি গুরুত্বের। আমি একটা গবেষণাগারে পাঁচ বছর কাজ করে যাই—গবেষণাগারটির কাজ ছিলো দুশ্চিন্তা দূর করা। এ গবেষণাগার বয়স্ক শিক্ষার ক্লাস ছাড়া কিছু নয়। যতদূর জানি দুনিয়ায় এটাই একমাত্র গবেষণাগার। আমার পদ্ধতি ছিলো এই : ছাত্রদের আমরা দুশ্চিন্তা দূর করার কতগুলো নিয়ম জানিয়ে সেগুলো তাদের জীবনে কাজে লাগিয়ে কি রকম ফল পাওয়া গেল পরে ক্লাসে জানাতে বলা হয়। অনেকে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার কথাও জানাতেন।

আমার ওই অভিজ্ঞতার ফলে আমার ধারণা পৃথিবীর যে কোন মানুষের চেয়েই 'দুশ্চিন্তা কি করে জয় করলাম' বিষয়ে কথা আমিই সবচেয়ে বেশি শুনেছি। এছাড়াও আমি শ'য়ে শ'য়ে ''আমি কি করে দুশ্চিন্তা জয় করি' বিষয়ে ডাকে পাঠানো লেখাও পড়েছি। এসবের মধ্যে বহু বক্তৃতাও ছিলো যে গুলো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডায় আমাদের ১০৭৭টি ক্লাসে আরও ৪৫টি অন্য রাষ্ট্রে পুরস্কার পায়। তাই এই বইটি আরামের সাহায্যে জন্মায়নি বা এটার কোন বাঁধা ধরা বুলিও নেই। এর বদলে আমি দ্রুত চলমান সংক্ষিপ্ত কোন বিবরণই লিপিবদ্ধ করেছি, যেটায় হাজার হাজার বয়স্ক মানুষ তাদের দুশ্চিন্তা কিভাবে জয় করেছেন সেকথাই বলা হয়। একটা ব্যাপার নিশ্চিত—বইটি ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা। এর লেখা আপনার নিশ্চয় বোধগম্য হবে।

আমি একথা জানাতে পেরে খুশি যে এ বইতে যে সব নাম দেওয়া আছে তা আদৌ মনগড়া নয়। এখানে সত্যিকার নাম ঠিকানাই দেওয়া আছে। এর সবই বিশ্বাসযোগ্য ও প্রামাণিক।

'বিজ্ঞান হলো কিছু সফল ধ্যানধারণার সমষ্টি,' কথাটা বলেছিলেন ফরাসী দার্শনিক ভ্যালেরি। এ বইও ঠিক তাই। এতেও রয়েছে কিছু সফল আর সময়ের কষ্টি পাথরে যাচাই করা পদ্ধতির সংগ্রহ যাতে দুশ্চিন্তা দূর করা যায়। তবে আপনাদের জানাতে চাই এতে নতুন কিছু পাবেন না, তবে যা পাবেন তা আগে কাজে লাগানো যায়নি। আনন্দময় জীবন কাটানোর পথ আমরা জেনেছি। আমাদের অসুবিধা অজ্ঞতা নয়, বরং নিষ্ক্রিয়তা। এবইয়ের উদ্দেশ্য হলো নতুন করে দুশ্চিন্তা হীন জীবন সম্পর্কে প্রাচীন আর আসল সত্য প্রকাশ করা এবং তাকে বাস্তবে কাজে লাগানোর জন্য আপনাকে উদ্বুদ্ধ করা।

এ বই কিভাবে লেখা হয় তা জানার জন্য বইটি আপনি হাতে নেননি। আমি জানি আপনি চান কাজ। অতএব আসুন, এগোনো যাক। দয়া করে এ-বইটার প্রথম চুয়াল্লিশ পাতা পড়ে ফেলুন—তারপর যদি দেখেন আপনার মধ্যে দুশ্চিন্তা দূর করে নতুন জীবন যাপনের জন্য কোন শক্তি বা প্রেরণার জন্ম হয়নি—তাহলে বইটা ছাইগাদায় ছুঁড়ে ফেলে দিন। এ বই তবে আপনার জন্য নয়।

ডেল কার্নেগী

দুশ্চিন্তা সম্পর্কে প্রাথমিক যা জানা দরকার

॥ এক ॥

আজকের জন্য বেঁচে থাকুন

১৮৭১ সালের বসন্তকালে এক তরুণ একখানা বইয়ের একুশটি কথা পড়ে গেলেন, কথাগুলো তার ভবিষ্যত জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। মন্ট্রিল জেনারেল হাসপাতালের এক ডাক্তারী ছাত্র ছিলেন তিনি। শেষ পরীক্ষায় পাশকরা, ভবিষ্যতে কোথায় যাবেন, কি করবেন, ডাক্তারী পসার কেমন হবে কিভাবে জীবিকা অর্জন করবেন এই সব নিয়ে তিনি খুবই চিন্তায় পড়েছিলেন।

১৮৭১ সালে যে কথাগুলো ঐ তরুণ ডাক্তার ছাত্রটি পড়েছিলেন তারই সাহায্যে তিনি হয়েছিলেন তার কালের সর্বশ্রেষ্ঠ একজন চিকিৎসক। তিনি বিশ্ববিখ্যাত 'জন হপকিন্স স্কুল অব মেডিসিন' পরিচালনা করেন। তিনি অক্সফোর্ডের রেজিয়াস অধ্যাপক নিযুক্ত হন—এটা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কোন চিকিৎসককে দেওয়া সর্বোচ্চ সম্মান। ইংলণ্ডের রাজা তাকে নাইট উপাধি দেন। মৃত্যুর পর তার জীবনী প্রকাশের জন্য দুটো বিরাট বইয়ে ১৪৬৬ খানা পাতা লেগেছিল।

ওই চিকিৎসক হলেন স্যার উইলিয়ম অসলার। ১৮৭১ সালের বসন্তকালে যে কথা গুলো তিনি পড়েছিলেন তা এই টমাস কার্লাইলের লেখা একুশটা কথা : 'অস্পষ্টতায় ভরা দূরের কিছুর চেয়ে কাছের স্পষ্ট কিছু দেখাই আমাদের দরক র।

বিয়াল্লিশ বছর পরে এক নরম বসন্তের রাতে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউলিপ ফুলে ভরা আঙিনায় স্যার উইলিয়াম অসলার ছাত্রদের সামনে একটা ভাষণ দেন। তিনি বলেন তার মত একজন মানুষ, যিনি চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর জনপ্রিয় কোন বই লিখেছেন, তার অবশ্যই বিশেষ ধরনের গুণ মস্তিষ্কে থাকবে। তিনি বলেন কথাটা একদম অসত্য, কারণ তার বন্ধুরা জানেন তাঁর 'মস্তিষ্ক অতি সাধারণ'।

তাহলে তার এই সাফল্যের গোপন রহস্য কি? তিনি বলেছিলেন, সেটা হল তার কথা অনুযায়ী 'দৈনিক জীবন যাপনের' ফল। কথাটার অর্থ কি? এই বক্তৃতা দেওয়ার কয়েক মাস আগে স্যার অসলার বিরাট এক যাত্রীবাহী জাহাজে আটলান্টিক পার হন। জাহাজের ক্যাপ্টেন সেখানে একটা বোতাম টিপতেই আশ্চর্য এক কাণ্ড ঘটে—কিছু যন্ত্রপাতির শব্দ জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের প্রতিটি অংশ একে অন্যের থেকে আলাদা হয়ে যায়। ডঃ অসলার ছাত্রদের এবার বললেন, 'তোমরা ওই চমৎকার জাহাজের চেয়েও অনেক বেশী আশ্চর্যজনক ভাবে তৈরী এবং

ভবিষ্যতে অনেক দূরে তোমাদের যেতে হবে। আমি যা বলতে চাই তা হলো তোমাদের সব যন্ত্রপাতি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করো যাতে দৈনিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হও—এতেই নিরাপদে যাত্রা পথে চলতে পারবে। পাটাতনে দাঁড়িয়ে দেখে নাও বেশীর ভাগ যন্ত্র সচল আছে কিনা। আর একটা বোতাম টেপো আর শুনে নাও তোমাদের জীবনের লোহার দরজাগুলো অতীতকে তোমাদের জীবনে রুদ্ধ করতে পারছে কিনা। আর একটা বোতাম টিপে বন্ধ করে দাও নবাগত ভবিষ্যতকে! তাহলেই তোমরা নিরাপদ—আজকের মত নিরাপদ! অতীতকে রুদ্ধ করো! অতীতকে সমাধিতে দাও…অতীতের কথা ভেবে অনেক মূর্খই মরেছে…ভবিষ্যতের ভারের সঙ্গে অতীতের বোঝা যুক্ত হয়ে আজকের বোঝা সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে। ভবিষ্যৎকে অতীতের মতই বন্ধ করে দাও…ভবিষ্যত হলো আজ…আগামীকাল বলে কিছুই নেই। মানুষের মুক্তির দিন হলো আজ। মানুষ ভবিষ্যতের কথা ভেবে শক্তিহীনতা, মানসিক দুশ্চিন্তা আর স্নায়ুর দুর্বলতায় ভোগে। অতএব অতীত আর ভবিষ্যৎকে অর্গলরুদ্ধ করে রোজকার জীবন নিয়েই বাঁচতে চেষ্টা করো।'

ডঃ অসলার কি তবে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি থাকতে বারণ করেছেন? না, কখনই না! তবে ঐ ভাষণে তিনি বলেছিলেন ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হওয়ার সব সেরা পথ হলো সমস্ত বুদ্ধি, ক্ষমতা আর আগ্রহ দিয়ে আজকের কাজ করে যাওয়া।

স্যার উইলিয়াম অসলার ইয়েলের ছাত্রদের খৃষ্টের এই প্রার্থনা দিয়ে দিন সুরু করতে বলেছিলেন: 'প্রভু, আজ আমাদের আজকের রুটি দাও।' মনে রাখবেন প্রার্থনায় কেবল আজকের রুটির কথাই প্রার্থনাকারী বলছে। গতকালের বাসি রুটি খাওয়ার জন্য কোন অভিযোগ জানায় নি সে। প্রার্থনায় সে বলেনি 'হে প্রভু, গম চাষের জমি খরা কবলিত—আর আবার খরা হতে পারে—আগামী শীতে তাহলে কিভাবে খাওয়া জুটবে—বা আমার যদি চাকরি না থাকে—ও ভগবান তা হলে কিভাবে রুটি জুটবে?'

না, ওই প্রার্থনায় খালি আজকের রুটির কথাই আছে। সম্ভবতঃ আজকের রুটিই শুধু আপনারা খেতে পারেন।

বহু বছর আগে এক কপর্দকহীন দার্শনিক এক কঙ্করময় দেশে ভ্রমণ করছিলেন, যে দেশের লোকেরা সকলেই দরিদ্র। একদিন এক পাহাড়ে, তার পাশে কিছু লোক জমায়েত হলে তিনি যা বললেন সেটাই আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি উধৃত বাণী। ছাব্বিশ শব্দের ওই বাণী শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে অনুরণিত: 'আগামীর চিন্তা ত্যাগ কর, কারণ আগামীকালই তার ভার নেবে। আজকের দিনেই করণীয় অনেক আছে।'

অনেকেই যীশুর সেই বাণী, 'কালকের কথা চিন্তা কোরোনা' মেনে নেয় নি। তাদের বক্তব্য হলো শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পক্ষে ওকালতি, যেটা প্রাচ্যের কিছু রহস্যময়তা। তাদের কথা হলো, 'আমায় কালকের কথা ভাবতেই হবে। আমার পরিবারের জন্য

বাঁনা করতেই হবে, বৃদ্ধ বয়সের জন্যও টাকা রাখা চাই। উন্নতির জন্য আমায় চেষ্টা করতেই হবে।'

ঠিক। এ সব তো করা চাইই। আসল কথাটা হলো খৃষ্টের ওই বাণী প্রায় তিনশ বছর আগে অনূদিত রাজা জেমসের রাজত্বের সময় তার যা মানে ছিল আজ আর তা নেই। তিনশ বছর আগে 'চিন্তা' কথাটার অর্থ ছিল দুশ্চিন্তা। বাইবেলের আধুনিক সংস্করণে যীশুর বাণী আরও প্রাঞ্জল করে বলা হয়েছে: 'আগামীকালের জন্য দুশ্চিন্তা কোর না।'

অবশ্যই কালকের চিন্তা করবেন, কালকের জন্য সাবধানে পরিকল্পনাও করবেন। তবে কোন দুশ্চিন্তা নয়।

যুদ্ধের সময় আমাদের সামরিক নেতারা ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করতেন। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল আর্নেস্ট জে. কিং বলেছিলেন: 'আমি আমাদের সেরা সৈন্যদের সব সেরা জিনিসপত্র দিয়েছি, সঙ্গে দিয়েছি সবচেয়ে ভালো কাজের দায়িত্ব। এর বেশি আর কিছু করতে পারি না।'

অ্যাডমিরাল কিং আরও বলেন, 'একটা জাহাজ ডুবে গেলে তাকে তুলে আনতে পারিনা। সেটা ডুবতে আরম্ভ করলে আমার শক্তি নেই তাকে ভাসিয়ে রাখি। তার চেয়ে গতকালের কথা না ভেবে আগামী কালের সমস্যা নিয়ে ভাবাই ভালো। তাছাড়া এই দুশ্চিন্তা আমায় পেয়ে বসলে আমি শেষ হয়ে যাব।'

যুদ্ধ বা শান্তির সময়, যাই হোক ভালো আর মন্দ চিন্তার তফাৎ হলো: ভালো চিন্তার ফলে সঠিক যুক্তিসহ পরিকল্পনা নেওয়া যায়। মন্দ চিন্তায় বেশির ভাগই শুধু উদ্বেগ আর স্নায়বিক দুর্বলতা জাগায়।

সম্প্রতি আমি বিশ্বের বিখ্যাত সংবাদ পত্র দি নিউইয়র্ক টাইমসের' প্রকাশক আর্থার হেস সালজবার্গারের সাক্ষাৎকার নিই। তিনি আমায় বলেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন যখন সারা ইউরোপকে গ্রাস করে তিনি ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় প্রায় ঘুমোতে পারেন নি। প্রায় মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে একটা রঙের টিউব ক্যানভাস নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি নিজের ছবি এঁকেছেন। অথচ ছবি আঁকার কিছুই তিনি জানতেন না, আসলে দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেতেই তিনি আঁকতেন। মিঃ সালজবার্গার বলেছিলেন দুশ্চিন্তা থেকে কিছুতেই তিনি রেহাই পাননি যতদিন না একটা চার্চের প্রার্থনা গীতের পাঁচটা শব্দ থেকে তার নীতি গ্রহণ করেন: 'একপা এগোলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

> পথ দেখাও, হে স্নেহময় আলোক…
> আমাকে স্থির রাখো: দূরের দৃশ্য আমার চাই না;
> এক পা চলাই আমার যথেষ্ট।

ঠিক ওই সময়েই একজন সৈন্য ইউরোপের কোথাও একই জিনিস শিখছিলেন। তার নামে টেড বেনজারমিনো। বাল্টিমোর. মেরিল্যান্ডের মানুষ সে। দুশ্চিন্তার ফলে তিনি হয়ে যান পয়লা নম্বর এক যুদ্ধ-শ্রান্ত মানুষ।

টেড বেনজারমিনো লিখেছেন ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে এতোই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই যে ডাক্তার আমাকে বলেন 'স্প্যাসমোডিক ট্রান্সভার্স কোলন' নামে জটিল রোগ হয়েছে। এতে অসহ্য যন্ত্রণা। যুদ্ধ যদি শেষ না হ'ত তাহলে নিশ্চয়ই আমার শরীর একদম ভেঙে পড়ত।

'আমার দম প্রায় ফুরিয়ে আসে। আমি ৯৪ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিসনের নন্ কমিশান্ড অফিসার ছিলাম। আমার কাজ ছিল যুদ্ধে যত লোক নিহত বা নিরুদ্দেশ হয়, তারা মিত্র বা শত্রুপক্ষের যার লোকই হোক, তাদের তালিকা তৈরি করা। আমার কাজ ছিল যে সব মৃতদেহ তাড়াহুড়োয় অগভীর মাটিতে কবর দেওয়া হয়েছিল সেগুলো উঠিয়ে তাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র তাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে পাঠিয়ে দিতে হ'ত। আমার সব সময় চিন্তা আর ভয় হ'ত বোধহয় মারাত্মক ভুল করছি। আমার দুশ্চিন্তা ছিল সব কাজ সম্পন্ন করতে পারবো কিনা। আমার ভাবনা হত আমার ষোল মাসের ছেলে—যাকে আমি এখনও দেখিনি তাকে কোলে নিতে পারবো কিনা। আমার এতই দুশ্চিন্তা আর ক্লান্তি আসে যে প্রায় চৌত্রিশ পাউণ্ড ওজন কমে যায়। আমি পাগলের মত হয়ে যাই, হাত-পা লক্ষ্য করে দেখলাম সেগুলো হাড় আর চামড়া সর্বস্ব। ভাঙা শরীরে বাড়ি ফেরার কথা ভাবলে আতঙ্ক হ'ত। ভেঙে পড়ে শিশুর মতই কাঁদতাম। বালজের যুদ্ধের পর এমন কাঁদলাম যে মনে হলো আর স্বাভাবিক হতে পারবো না।

শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পেলাম এক সামরিক ডিসপেনসারিতে। একজন সামরিক ডাক্তার আমায় যে উপদেশ দিলেন তাতেই আমার জীবনে দারুণ পরিবর্তন এলো। আমাকে যত্ন করে পরীক্ষার পর তিনি বললেন আমার সব রোগই মানসিক। তিনি এবার বললেন, 'টেড, আমি চাই জীবনটাকে বালিঘড়ি বলে মনে কর। তুমি জানো বালিঘড়িতে হাজার হাজার বালুকণা থাকে, তারা ধীরে ধীরে যন্ত্রটার ভিতরের ছোট্ট ফুটো দিয়ে পড়তে থাকে। যন্ত্রটা না ভেঙে আমরা একসঙ্গে বেশি বালি ঢোকাতে পারি না। তুমি বা আমি সকলেই ওই বালি ঘড়ির মত। সকালে আমরা কাজ সুরু করার সময় শত শত কাজ থাকে, সে সব একে একে না করে একসঙ্গে করতে গেলে বালি ঘড়ির মতই অবস্থা হবে, তাতে আমাদের শরীর মন ভেঙে পড়বে।'

'আমি তখন থেকেই সেই স্মরণীয় দিন থেকে, যেদিন একজন সামরিক ডাক্তার আমায় উপদেশ দেন আমি ওই কথা মেনে চলেছি—'এক সময় এক কণা বালি'...। যুদ্ধের সময় ওই পরামর্শ আমার শরীর আর মনকে রক্ষা করেছে, আর আজ আমি যে প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের ডাইরেক্টর সেখানেও সেই উপদেশ আমায় সাহায্য করে চলেছে। এখানেও সেই এক সমস্যা যা যুদ্ধে দেখেছি—অনেক কাজ একসঙ্গে করতে হবে—আর তা করার সময় কত কম। কত সমস্যা ছিল—স্টক কম, ঠিকানা বদল, অফিস খোলা আর বন্ধ করা, ইত্যাদি। 'এক সময়ে এক কণা বালি' ডাক্তার আমায় যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাই আমার কাজে লাগল। বারবার কথাটা স্মরণ করে আমি

মানসিক জটিলতা থেকে মুক্ত হয়েছিলাম।'

আমাদের বর্তমান জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল, আমাদের হাসপাতালের প্রায় অর্ধেক বেডই মানসিক আর স্নায়বিক রোগীতে পূর্ণ, যারা অতীত আর আগামীর চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে ভেঙে পড়ে। অথচ তাদের অনেকেই আজ আনন্দে জীবন কাটাতে পারতেন যদি শুধু তারা যীশুর সেই কথা: 'আগামীকালের জন্য দুশ্চিন্তা কোরনা' অথবা স্যার উইলিয়াম অসলারের সেই কথা: 'রোজকার জীবন যাপন কর' এই কথাগুলো যদি মনে রাখতেন।

আপনি বা আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি দুই অসীমের সন্ধিক্ষণে—যে বিশাল অতীত চিরকাল রয়ে গেছে আর যে আগামী ভবিষ্যৎ চিরকাল থাকবে। আমরা এ দুই কালের কোনটাতেই সম্ভবতঃ থাকতে পারি না—না, এক মুহূর্তও না। এ রকম ভাবে থাকতে গেলে আমাদের শরীর আর মন শেষ হয়ে যাবে! তাই যা থাকা সম্ভব তাই থাকি আসুন—এখন থেকে ঘুমোনোর সময় পর্যন্ত। রবার্ট লুই স্টিভেনসন বলেছেন, 'যত কঠিন ভারই হোক মানুষ রাত অবধি তার বোঝা বইতে পারে। যে কোন লোকই যত কঠিন হোক তার কাজ করতে পারে একদিনের জন্য। যে কোন মানুষ আনন্দে, ধৈর্য্য নিয়ে, সুন্দরভাবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। আর জীবনের অর্থই তাই।'

হ্যাঁ, জীবনে এর বেশি আর কিই বা প্রয়োজন। তবে মিচিগানের মিসেস ই. কে শীল্ডস হতাশায় প্রায় আত্মহত্যাই করে বসেছিলেন যতদিন না তিনিও ঘুমনো পর্যন্ত বেঁচে থাকার কৌশল আয়ত্ত করেন। মিসেস শীল্ডস আমায় বলেন, '১৯৩৭ সালে আমার স্বামী মারা যান। আমি হতাশায় ভেঙে পড়ি—একেবারে কপর্দক শূন্য ছিলাম আমি। আমি আমার পূর্বতন নিয়োগকর্তা মিঃ লিও রোচকে লিখে পুরনো কাজটা ফিরে পাই। আগে শহরে আর গ্রামের স্কুলে ওয়ার্ল্ড বুকস এর বই বিক্রি করতাম। স্বামীর অসুখের সময় দুবছর আগে আমার গাড়িটা বেচে দিই, সামান্য টাকা জমিয়ে একটা পুরনো গাড়ি কিনে বই বিক্রি স্বরু করলাম।

ভেবেছিলাম রাস্তায় বের হলে আমার হতাশা কাটবে। কিন্তু একাকী গাড়ি চালিয়ে আর একা একা খেতে গিয়ে আমার অসহ্য বোধ হল। কোথাও কিছুই বিক্রি হত না, গাড়ির কিস্তির টাকা কম হলেও তা শোধ দিতে পারিনি।

'১৯৩৮ সালের বসন্তকালে মিসৌরীর ভার্সাইতে আমি কাজ করছিলাম। স্কুল গুলো বড় গরীব ছিল, আমিও একাকী বোধ করতাম, রাস্তাও বড় খারাপ। হতাশায় প্রায় আত্মহত্যাই করতে চেয়েছিলাম। সাফল্য অসম্ভব মনে হচ্ছিল। সবেতেই আমার ভয় ছিল, ভাবছিলাম গাড়ির টাকা দিতে পারবো না, ঘরের ভাড়া দেওয়া হবে না, খাওয়া জুটবে না, ডাক্তারের পয়সাও ছিলোনা। আত্মহত্যায় প্রয়াসী হইনি আমার বোন কষ্ট পাবে বলে আর অন্ত্যেষ্টির জন্য এক কপর্দকও ছিলোনা বলে।

'তারপর একটা প্রবন্ধ পড়ার পরই আমি হতাশা ভুলে বাঁচার সাহস পেলাম। প্রবন্ধের একটা কথার জন্য আমি চিরঋণী হয়ে রইলাম। কথাটি এই:

বুদ্ধিমান মানুষের কাছে প্রতিটি দিনই নতুন জীবন'। কথাটা টাইপ করে আমার গাড়ির সামনের কাচে লাগিয়ে রাখলাম, গাড়ি চালানোর প্রতি মুহূর্তেই তা নজরে পড়তো। আমি দেখলাম প্রতি দিন বেঁচে থাকা কঠিন নয়। আমি গতকাল আর আগামীকালের কথা ভুলে গিয়ে তার কৌশল আরম্ভ করলাম। প্রতিদিন সকালে নিজেকে বলতাম, 'আজ এক নতুন জীবন'।

'আমি একাকীত্বের আর অভাবের ভয় কাটিয়ে উঠতে আরম্ভ করলাম। আজ আমি সুখী আর বেশ সফল, জীবন সম্পর্কে আমার নতুন আগ্রহ জেগেছে। আমি জানি আর কখনই আমি ভয় পাবোনা, জীবনে যে সমস্যাই আসুক না কেন। আমি জানি ভবিষ্যতকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই—আমি জানি আমি এখন প্রতিদিনের জন্য বাঁচতে পারি—আর প্রতিটি দিনই জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে এক নতুন জীবন।'

নিচের কবিতাটি কার লেখা বলতে পারেন ?

'সেই মানুষই সবার চেয়ে সুখী,
যিনি আজকের দিনকে নিজের বলতে পারেন :
তিনিই শ্রেষ্ঠ, যিনি বলেন :
'আগামীর বিপদকে ভয় করিনা কারণ আমি আজ বেঁচেছি।'

কবিতাটি আধুনিক মনে হচ্ছে ? তবুও বলি এই কবিতা যীশুর জন্মেরও ত্রিশ বছর আগে লিখেছিলেন রোমান কবি হোরেস।

মানব চরিত্র সম্পর্কে আমার সবচেয়ে দুঃখজনক যে কথা জানা আছে তা হলো আমরা সকলেই জীবনযুদ্ধ এড়িয়ে চলতে চাই। আমরা সবাই দিগন্তপারের কোন মায়া গোলাপের স্বপ্নে আচ্ছন্ন। কিন্তু জানালার পাশে যে অসংখ্য গোলাপ ফুটে রয়েছে তা আমরা দেখি না।

আমরা এরকম বোকামির কাজ করি কেন ?

স্টিফেন লীকক লিখেছিলেন, 'আমাদের জীবনের ছোট্ট শোভাযাত্রা কি অদ্ভুত ! শিশু ভাবে 'আমি যখন বড় হব।' কিন্তু বড় হবার পর সে বলে আমি যখন আরও বড় হব।' বড় হয়ে সে বলে', যখন আমি বিয়ে করব।' কিন্তু বিয়ে করার পর কি হল ? চিন্তাটা দাঁড়ালো : আমি যখন অবসর নেব।' কিন্তু অবসর নেবার পর সে পিছনে তাকালে দেখে অতীতের দৃশ্য—একটা শীতল পবন যেন বয়ে যায়—সবই সে উপভোগে বঞ্চিত হয়েছে। আমরা ভুলে যাই এ জীবন উপভোগের জন্যই প্রতিদিন, প্রত্যেক মুহূর্ত তাকে উপভোগ করতে হয়।'

ডেট্রয়টের প্রয়াত এডওয়ার্ড ই. ইভান্স দুশ্চিন্তায় প্রায় আত্মহত্যা করতে যান, কিন্তু যেদিন তিনি বুঝতে পারলেন 'বেঁচে থাকাতেই জীবনের আনন্দ প্রতিটি মুহূর্তে' তখনই তার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি মানুষ হন, অর্থ রোজগার করেন প্রথম সংবাদপত্র বিক্রি করে, এমনকি মুদীর দোকানেও কাজ করেন। সাতজনের পরিবারে রুটি জোগানোর দায়িত্ব নিয়ে সহকারী গ্রন্থাগারিকের কাজ নেন। সামান্য মাইনে ছিল তার তবু কাজটা ভয়ে ছাড়তে পারতেন না। আট বছর কাটার

পর তিনি সাহস সঞ্চয় করে নিজে কিছু করবার চেষ্টা করেন। তারপর ধার করে মাত্র পঞ্চান্ন ডলার ব্যবসায় লাগিয়ে তাকে করে তোলেন বিশাল—বছরে তার আয় হয় বিশ হাজার ডলার! কিন্তু তারপরেই কুয়াশায় সব আচ্ছন্ন হয়ে গেলো—ধ্বংসের কুয়াশা। এক বন্ধুকে অনেক টাকা ঋণ দিলেন সে দেউলিয়া হয়ে গেলো। একটার পর একটা বিপদ নেমে এলো এবার, তার সর্বস্ব নষ্ট হয়ে গেলো। ষোল হাজার ডলার দেনায় পড়ে গেলেন তিনি। তার স্নায়ু ভেঙে পড়ল। তিনি আমাকে বলেছিলেন ; আমি ঘুমোতে পারতাম না, খেতে পারতাম না। অদ্ভুত ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। দুশ্চিন্তা, শুধু দুশ্চিন্তাই আমায় অসুস্থ করে তোলে। একদিন পথে জ্ঞান হারালাম। হাঁটার ক্ষমতাও আমার ছিলো না। শয্যাশায়ী হয়ে সারা দেহ ফোঁড়ায় ভরে গেলো। ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়লাম। আমার ডাক্তার জানালো আর মাত্র দুসপ্তাহ বাঁচবো। দারুণ আঘাত পেলাম। নিজের উইল তৈরি করলাম, তারপর চুপচাপ শুয়ে শুয়ে শেষের অপেক্ষায় পড়ে রইলাম। আর লড়াই বা দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই। মন হালকা করে ঘুমোলাম। আগে সপ্তাহের পর সপ্তাহ টানা দুঘণ্টাও ঘুমোই নি, আর এখন শিশুর মত ঘুমোলাম। আমার সব ক্লান্তি কোথায় চলে গেলো। খিদে হলো, ওজনও বাড়তে লাগলো।

'ক সপ্তাহ পরে ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে পারলাম। ছ'সপ্তাহ পরে কাজে যোগ দিতে পারলাম। বছরে বিশ হাজার ডলার আয় করছিলাম, আর এখন যে সপ্তাহে ত্রিশ ডলার পেলাম তাতেই আমি খুশি। কাঠের টুকরো বিক্রি করাই আমার কাজ ছিলো। তবু আমি একটা শিক্ষা পেয়েছি—আর দুশ্চিন্তা নয়, অতীত নিয়ে ভাবনা নয়—যা গেছে তার জন্য দুঃখ একেবারে নয়। ভবিষ্যত নিয়েও কোন আতঙ্ক নয়। আমার সমস্ত শক্তি আর আগ্রহ দিয়ে কাঠের টুকরো বিক্রির কাজ করে চললাম।'

এবার এডওয়ার্ড ইভান্স দ্রুত উন্নতি করলেন। কয়েক বছরেই তিনি কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন—ইভান্স প্রোডাক্টস কোম্পানী। কোনদিন গ্রীনল্যাণ্ডে গেলে আপনি হয়তো ইভান্স ফিল্ডেই নামবেন—ঐ বিমান ক্ষেত্রটি তারই সম্মানে নামাঙ্কিত। এডওয়ার্ড ইভান্স এই সম্মান হয়তো পেতেন না যদি না তিনি 'রোজকার জীবন যাপন' করতেন।

হোয়াইট কুইন কি বলেছিলেন হয়তো জানেন আপনারা : 'গতকাল আর আগামী-কালের রুটিতে মিষ্টি মাখান, কখনই আজকের রুটিতে নয়।' আমরাও বেশির ভাগ এই রকম গতকাল আর আগামীকালের রুটিতে মিষ্টি মাখানোর কথা চিন্তা করি অথচ আজকের রুটিতে পুরু করে তা মাখাতে ভুলে যাই।

বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক মন্তেইনও এই ভুল করেন। তিনি বলেছিলেন : আমার জীবনে সাংঘাতিক সব দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে পূর্ণ, যার বেশির ভাগ দুর্ঘটনাই ঘটেনি।' ঠিক সেইরকম আপনার—আর আমারও তাই।

দান্তে বলেছিলেন, 'ভেবে দেখ, আজকের দিন আর আসবে না।' জীবন দ্রুত এগিয়ে চলেছে অসম্ভব গতিতে, প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় উনিশ মাইল। 'আজ' তাই

আমাদের অশেষ মূল্যবান সম্পত্তি, এটাই আমাদের একমাত্র নিশ্চিত সম্পদ ।

লাওয়েল টমাসের দর্শনও তাই। সম্প্রতি তার খামারে এক সপ্তাহ কাটিয়েছি। তার বেতার স্টুডিওতে বাইবেলের এই উদ্ধৃতিটি লেখা ছিলো, যেটা তার সব সময় নজরে পড়তো :

'আজকের এই দিনটি ঈশ্বরই তৈরি করেছেন,
আনন্দোৎসবের মধ্যে দিয়ে আমরা এতেই সন্তুষ্ট থাকবো।'

জন রাস্কিনের টেবিলে একখণ্ড পাথরে লেখা থাকতো : 'আজকের দিনটি।' যদিও আমার টেবিলে কোন পাথরের টুকরো নেই, তবে আয়নায় একটা কবিতা আঁটা আছে, যেটা দাড়ি কামাতে গিয়ে রোজই পড়ি—যে কবিতাটি স্যার উইলিয়াম অসলারও তার ডেস্কে রেখে দেন—বিখ্যাত ভারতীয় কবি ও নাট্যকার কালিদাসের লেখা কবিতা। কবিতাটির মর্মার্থ এই রকম :

'আজকের জীবনই সব কিছু, এতেই রয়েছে জীবনের পরিপূর্ণতা। কারণ গতকাল তো শুধু স্বপ্ন আর আগামীকাল সে তো কল্পনা, শুধু আজকের মধ্যেই রয়েছে বেঁচে থাকার আনন্দ। আজ ভালো করে বেঁচে থাকলেই গতকালই সুখস্বপ্ন হয়ে ওঠে আর আগামীকাল হয় আশায় ভরপুর। তাই আজকের দিনকেই সানন্দে গ্রহণ কর। এই হল প্রভাত বন্দনা।'

অতএব দুশ্চিন্তা সম্পর্কে যা জানবেন আর তাকে জীবন থেকে সরিয়ে রাখতে যা করবেন তাই হলো এই : অতীত আর ভবিষ্যতকে লোহার কপাটে আবদ্ধ করে রাখুন। শুধু রোজকার জীবন যাপন করুন।

নিচের প্রশ্নগুলো নিজেকে করে উত্তর দেবার চেষ্টা করবেন কি ?

১। বর্তমানকে ছেড়ে কি ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই ?

২। অতীতে যা হয়নি তা ভেবে কি অনুতাপ করি ?

৩। সকালে উঠে কি চব্বিশটা ঘণ্টা কাটানোর কথাই ভাবি ?

৪। আজকের জীবন কাটিয়ে কি আনন্দ আহরণ করি ?

৫। কাজটা কবে সুরু করবো ? আগামী সপ্তাহে ?…কাল ?…আজ ?

॥ দুই ॥

দুশ্চিন্তা কাটানোর ইন্দ্রজাল

আপনি কি দ্রুত কাজ দেয় এমন কোন দুশ্চিন্তা দূর করার উপায় জানতে চান যা কাজে লাগিয়ে এই বই পড়ার আগেই উপকার পেতে পারেন?

এটা চাইলে আসুন আপনাদের উইলিস এইচ. ক্যারিয়ারের কথা শোনাই। তিনি নিউ ইয়র্কের সিরাকিউসের পৃথিবী বিখ্যাত ক্যারিয়ার কর্পোরেশনের প্রধান। তিনি একজন দারুণ ইঞ্জিনিয়ার আর শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেন। দুশ্চিন্তা দূর করার যে গল্প তার কাছে আমি শুনেছিলাম আমার মতে সেটাই সকলের সেরা।

মিঃ ক্যারিয়ার বলেছিলেন, 'আমি যখন অল্প বয়সের তখন নিউ ইয়র্কের বাফেলো ফর্জ কোম্পানীতে কাজ করতাম। সে সময় লক্ষ লক্ষ ডলারের এক গ্যাস পরিষ্কার যন্ত্র বসানোর জন্য কৃস্টাল সিটির পিট্সবার্গ প্লেট গ্লাস প্রতিষ্ঠানের কাজ পাই। কাজটা হলো ইঞ্জিনের ক্ষতি না করে কিভাবে গ্যাসের অপ্রয়োজনীয় মিশ্রণ বের করে দেয়া যায়। গ্যাস পরিষ্কারের এ পদ্ধতি ছিল নতুন। আগে মাত্র একবারই অন্য পরিস্থিতিতে এর ব্যবহার হয়। আমার কাছে কৃস্টালসিটিতে নানা অজ্ঞাত অসুবিধা দেখা দেয়। বিশেষ এক ক্ষেত্রে এটায় কাজ হলো—তবে যে গ্যারান্টি দিয়েছিলাম সেভাবে হলো না।

'আমার ব্যর্থতায় হতবাক হয়ে গেলাম। মনে হলো কেউ যেন আমাকে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করেছে। আমার সারা শরীর গুলিয়ে উঠল। এতোই দুশ্চিন্তায় পড়লাম যে ঘুমোতে পারিনি।

'শেষ পর্যন্ত সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝলাম দুশ্চিন্তায় কোন লাভ হবেনা। তাই ভাবতে লাগলাম দুশ্চিন্তা ত্যাগ করে কিভাবে সমস্যার সমাধান করবো। তাতে দারুণ কাজ হলো। আমি আমার এই দুশ্চিন্তা-বিহীন কৌশল গত ত্রিশ বছর কাজে লাগিয়ে আসছি। খুবই সরল ব্যাপার। যে কেউ কাজে লাগাতে পারে। এতে তিনটে ধাপ আছে—

প্রথম ধাপ ঃ আমি সব ব্যাপারটি নির্ভয়ে ভালো করে ভেবে বের করলাম, আমার বিফলতার জন্য সবচেয়ে খারাপ কি হতে পারে। কেউ আমাকে জেলে দেবে না বা গুলি করবে না, এটা নিশ্চিত। তবে এমন হতে পারে যে আমার চাকরি যেতে পারে, আর তা ছাড়াও কোম্পানীকে হয়তো যে মেশিন বসিয়েছি তা সরিয়ে নিতে হবে আর তাতে ক্ষতি হবে বিশ হাজার ডলার।

দ্বিতীয় ধাপ ঃ সবচেয়ে খারাপ যা হতে পারে ভাববার পর ঠিক করলাম ওই অবস্থাই মেনে নিতে হবে। নিজেকে বললাম : এই ব্যর্থতা আমার সুনামে আঘাত করবে আর চাকরিও হয়তো হারাবো। তা যদি হয় অন্য কাজ পেয়ে যাবো। অবস্থা তো আরও খারাপ হতে পারতো, বিশেষ করে আমার নিয়োগ কর্তাদের—যাই হোক

তারা তো পরীক্ষামূলক ভাবে নতুন পদ্ধতি কাজে লাগাচ্ছিলেন, বিশ হাজার ডলার না হয় পরীক্ষার ব্যয়, এ ক্ষতি তারা সহ্য করতে পারবেন।

'সবচেয়ে খারাপ অবস্থাটা ভেবে নেওয়ার পর আমি বেশ হাল্কা বোধ করলাম আর মনের শান্তি ফিরে পেলাম, যা বেশ কটা দিনই ছিলোনা।

তৃতীয় ধাপ ঃ তখন থেকেই আমি শান্তভাবে আমার সময় ওই চরম যে খারাপ অবস্থাকে মেনে নিয়েছিলাম তা থেকে নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা চালালাম।

'এবার চেষ্টা করতে লাগলাম যে ক্ষতি আমাদের হলো সেই বিশ হাজার ডলারের চেয়ে ক্ষতিটা কতোটা কম করতে পারি। নানা রকম পরীক্ষা চালানোর পর দেখলাম আমার প্রতিষ্ঠান যদি আর পাঁচ হাজার ডলার বাড়তি যন্ত্রপাতির জন্য খরচ করে তা হলে সমস্যা মিটে যায়। আমরা তাই করলাম আর পনেরো হাজার ডলার বাঁচাতে সক্ষম হলাম।

'আমি সম্ভবতঃ এটা করতে পারতাম না যদি শুধু দুশ্চিন্তাই করে যেতাম, কারণ দুশ্চিন্তা আমাদের মনঃসংযোগ নষ্ট করে দেয়। আমরা যখন দুশ্চিন্তা করি তখন আমাদের মন এখানে ওখানে লাফ মেরে চলে আর আমরা মনস্থির করার শক্তি হারিয়ে ফেলি। আবার আমরা যখন খারাপ অবস্থাকে মনের দিক থেকে মেনে নিই আমরা তখন এলোমেলো চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাই।

'যে ঘটনার কথা বললাম সেটা বহু বছর আগে ঘটেছিল। সেটায় এমন চমৎকার ফল হয় যে আমি তখন থেকেই এটা কাজে লাগিয়ে চলেছি, আমার জীবনে আর দুশ্চিন্তা দেখা দেয়নি।'

এখন উইলিয়াম এইচ. ক্যারিয়ারের এই ঐন্দ্রজালিক পদ্ধতি এত মূল্যবান আর কার্যকর কেন মনস্তাত্বিক দিক থেকে? তার কারণ দুশ্চিন্তার ধূসর কালো মেঘ আমাদের গ্রাস করলে এ তা থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারে। এ আমাদের পায়ের তলায় শক্ত মাটি দিতে পারে, আমরা কোথায় তা জানতে পারি। আমাদের পায়ের তলায় মাটি না থাকলে সমস্যার সমাধান করব কি করে?

ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস্ বহুদিন মারা গেছেন। আজ তিনি বেঁচে থাকলে এবং এই নিয়মটির কথা শুনলে অবশ্যই সমর্থন করতেন।

একথা কিভাবে জানলাম? কারণ তিনি তার ছাত্রদের বলেছিলেন: 'যা ঘটে গেছে তাকে মেনে নাও···কারণ যা ঘটে গেছে তাকে মেনে নিলে তবেই দুর্ভাগ্য অতিক্রম করা যায়।'

এই মতই আবার প্রকাশ করেছিলেন লিন ইয়াটুং তার 'বেঁচে থাকার গুরুত্ব' নামক বইটিতে। এই চীনা দার্শনিক বলেন, 'সত্যিকার মানসিক শান্তি আসে সবচেয়ে খারাপকে মেনে নিলে। মনস্তত্বের দিক থেকে আমি মনে করি এর অর্থ শক্তির মুক্তি।'

সত্যিই তাই। কারণ সবচেয়ে খারাপকে মেনে নিলে আমাদের আর হারাবার

কিছুই থাকে না। আর সঙ্গে সঙ্গে অর্থটা দাঁড়ায়—আমাদের সবটাই লাভ। উইলিয়াম এইচ. ক্যারিয়ার বলেন, 'আমি এতেই মানসিক শান্তি পেয়েছি। আমি তখন থেকেই চিন্তাও করতে পেরেছি!'

কথাটা ঠিকই মনে হচ্ছে, তাই না? তা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জীবন এই খারাপ অবস্থা না মেনে নিতে পেরে দুর্বিসহ করে তোলেন। তারা ভগ্নস্তূপ থেকে যেটুকু পাওয়া যায় তা গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন। আপন ভাগ্যকে নতুন ভাবে যা তৈরি করে তারা অভিজ্ঞতার সঙ্গে তীব্র লড়াই করেছেন—আর পরিণতিতে অবসাদে আক্রান্ত হন।

আর একজন কিভাবে উইলিয়াম এইচ ক্যারিয়ারের যাদু পদ্ধতি নিজের সমস্যায় লাগান জানতে চান? তবে শুনুন আমার একজন ছাত্র, নিউ ইয়র্কের এক তেল ব্যবসায়ীর কথা।

ছাত্রটি বলেছিলো, 'আমাকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছিল। সিনেমার বাইরে এটা যে সম্ভবপর—তা ভাবতে পারিনি, আমায় সত্যই ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছিল। যা ঘটে তা এই: ওই সময় যে তেল কোম্পানীর আমি প্রধান ছিলাম, তার অনেকগুলো ডেলিভারি ট্রাক আর ড্রাইভার ছিলো। সে সময় তেলের বন্টন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ছিলো আর আমরা ক্রেতাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ তেলই দিতে পারতাম। এ ব্যাপারটা আমি জানতাম না, ড্রাইভাররা জানতো। তারা ক্রেতাদের এইভাবে কম তেল দিয়ে বাকি তেল নিজেদের লোককে বিক্রি করছিলো।'

'বেআইনী ব্যাপারের কথাটা প্রথম জানতে পারলাম যখন একজন লোক নিজেকে সরকারী পরিদর্শক হিসাবে পরিচয় দিয়ে এই কথা চাপা দেওয়ার জন্য টাকা চায়। লোকটার কাছে ড্রাইভারদের কীর্তির প্রমাণের কাগজপত্র ছিলো। সে আমায় ভয় দেখালো, যদি আমি টাকা দিতে রাজী না হই তাহলে ব্যাপারটা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নীর অফিসে জানিয়ে দেবে।

'আমি অবশ্যই জানতাম আমার দুশ্চিন্তার কিছু নেই—অন্ততঃ ব্যক্তিগতভাবে। তবে এও জানতাম কোন প্রতিষ্ঠান তার কর্মচারিদের কাজের জন্য দায়ী। তাছাড়া এও জানতাম ব্যাপারটা আদালতে গেলে খবরের কাগজে ছাপা হবে এবং তার ফলে আমার ব্যবসা নষ্ট করে দেবে। আমাদের ব্যবসা নিয়ে আমার গর্ব ছিলো—চব্বিশ বছর আগে আমার বাবা এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।'

'এতোই দুশ্চিন্তায় পড়লাম যে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তিন দিন তিন রাত খাওয়া বা ঘুমই হলো না। পাগলের মত ঘুরতে লাগলাম। টাকাটা কি দেওয়া উচিত—পাঁচ হাজার ডলার—না কি লোকটাকে বলে দেব যে চুলোয় যাক? দুটোর কোনটা ভেবেই কুল পেলাম না।

'তখনই এক রবিবার রাত্রিতে কার্নেগীর ক্লাশে 'দুশ্চিন্তা দূর করার উপায়' নামে যে বইটি পেয়েছিলাম তাই খুলে পড়ি। পড়তে পড়তে উইলিয়াম এইচ. ক্যারিয়ারের 'চরমের সম্মুখীন হও' লেখাটা চোখে পড়ল। তাই নিজেকে প্রশ্ন করলাম 'সবচেয়ে

খারাপ এতে কি হতে পারে যদি টাকা না দিই আর ব্ল্যাকমেলার সব কিছু ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নীকে জানিয়ে দেয় ?

'এর উত্তর হলো এই : আমার ব্যবসা শেষ হয়ে যাবে—সবচেয়ে খারাপ এটাই হতে পারে। তবে প্রচারের ফলে আমার ব্যবসার সর্বনাশ হতে পারে, কিন্তু জেলে যেতে হবে না। আমি তখন নিজেকে বললাম : ঠিক আছে, ব্যবসা উঠে যাবে। এটার জন্য মানসিক ভাবে আমি তৈরি। তারপর ?'

'বেশ, ব্যবসায় উঠে গেলে আমায় একটা চাকরী খুঁজতে হবে। সেটা এমন কিছু খারাপ নয়। তেলের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা আছে—অনেক প্রতিষ্ঠানই আমাকে পেতে চাইবে।···এবার নিজেকে ভালোবোধ করলাম। তিন দিন তিন রাত যে আতঙ্কে ছিলাম তা থেকে যেন মুক্তি পেলাম···আমার অনুভূতি প্রশমিত হল···আরও আশ্চর্য ব্যাপার, আমি ভাবতে পারলাম।

'এবার তৃতীয় ধাপ গ্রহণের ব্যাপারে ভাবতে পারলাম···সবচেয়ে খারাপ অবস্থা থেকে উন্নতি করার প্রয়াস। চিন্তা করতে গিয়ে নতুন এক দৃষ্টিকোণ জন্ম নিল। ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নীকে জানালে তিনি হয়তো নতুন কোন বাঁচার পথ বাতলাতে পারবেন। যা আমি ভাবিনি। হয়তো বোকার মতই মনে হবে যে এটা ভাবিনি। তবে চিন্তা তো করতে পারিনি, আমি কেবল দুশ্চিন্তাগ্রস্তই ছিলাম ! তাই ঠিক করলাম কাল সকালে প্রথমেই আমার অ্যাটর্নীর সঙ্গে কথা বলবো—এরপর সারারাত একটানা ঘুমোতে পারলাম।

'শেষ পর্যন্ত কি হল ? আমার অ্যাটর্নী বললেন সব কথা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নীকে জানাতে, আর আমি ঠিক তাই করলাম। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নী যা বললেন তাতে দারুণ অবাক হয়ে গেলাম। এই ব্ল্যাকমেলের চক্র নাকি অনেক দিন ধরে চলছে, আর সরকারী লোক বলে যে লোকটি পরিচয় দিয়েছে সে এক প্রবঞ্চক, পুলিশ তাকে খুঁজছে। উঃ এসব শুনে কি যে আরাম পেলাম ! গত তিন দিন ধরে আমি দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েছিলাম আর জোচ্চোর লোকটাকে পাঁচ হাজার ডলার দেবার কথাও ভাবছিলাম।

'এই অভিজ্ঞতা থেকে আমি বরাবরের জন্য একটা শিক্ষা পেলাম। যখনই কোন সমস্যা আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে চেয়েছে তখনই আমি এই পরামর্শ কাজে লাগাবার নাম দিয়েছি উইলিস এইচ. ক্যারিয়ারের পরামর্শ।'

আপনি যদি মনে করেন উইলিস এইচ. ক্যারিয়ারের সমস্যা ছিলো—তাহলে বলি সব শোনেন নি। আর্ল পি. হ্যানের গল্পটা একটু শুনুন, তার বাড়ি হলো ম্যাসাচুসেটসের, উইনচেস্টারে। ১৯৪৮ সালের ১৭ই নভেম্বর তিনি বোস্টনের একটা হোটেলে আমাকে কাহিনীটি শুনিয়েছিলেন।

তিনি শুনিয়েছিলেন, 'উনিশ শ কুড়ি সালের কাছাকাছি প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা আমায় কুরে কুরে খেয়ে চলেছিল কারণ আমার জঘন্য আলসার হয়। একরাতে প্রচণ্ড রক্তপাত ঘটায় আর আমায় শিকাগোর এক বিখ্যাত হাসপাতালে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে

যাওয়া হয়। আমার হাত তোলাও বারণ ছিলো। তিনজন ডাক্তার একজন আলসার বিশেষজ্ঞ সহ জানিয়ে দিলেন আমার রোগ সারার নয়। আমার খাদ্য হলো কিছু পাউডার আর এক চামচ দুধ এবং ক্রিম। একজন নার্স আমার পেটে নল ঢুকিয়ে সব পরিষ্কার করে দিত।

'মাসের পর মাস এরকম চললো···শেষ পর্যন্ত নিজেকে বললাম : শোন হে আর্ল হ্যানী, এইভাবে যন্ত্রণা নিয়ে যদি মরার কথাই শুধু ভাবতে হয় তাহলে যেটুকু সময় আছে তাকে ভালো ভাবে কাজে লাগাওনা কেন? তুমি চিরকাল দেশ বিদেশ ঘুরতে চেয়েছো এবার তাহলে সেটাই করে ফেলোনা।'

এবার ডাক্তারদের যখন বললাম আমি পৃথিবী ঘুরতে চলেছি আর দিনে দুবার নিজেই পেট পরিষ্কার করব, তারা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অসম্ভব! এরকম কথা তারা জীবনেও শোনেন নি। তারা সাবধান করে বললেন এটা করতে গেলে সমুদ্রেই আমার সমাধি হবে 'না তা হবেনা'! আমি বললাম, 'আমি আমার আত্মীয়দের কথা দিয়েছি পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রেই আমার সমাধি দেওয়া হবে; আর তাই একটা বাক্স সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

আমি একটা কফিনের ব্যবস্থা করে ফেললাম—সেটা জাহাজে নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবস্থাও করলাম—আমার পথে মৃত্যু হলে তারা আমার দেহটা কফিনে ভরে বরফঘরে রেখে দেশে ফিরিয়ে আনবেন। এবার তাই ওমরের সেই বিখ্যাত বাণী অবলম্বন করে ভেসে পড়লাম :

মিশবো ধুলোয়—তার আগেতে
সময়টুকুর সদ্‌-ব্যাভার
স্ফুর্তি করে নাই করি কোন—?
দিন কয়েকেই সব কাবার!

'যে মুহূর্তে লস এঞ্জেলেসে এস. এস. 'প্রেসিডেণ্ট অ্যাগমন' জাহাজে উঠে প্রাচ্যের দিকে যাত্রা করলাম দারুণ ভালো লাগলো। ক্রমে সেই পাউডার খাওয়া আর পেট পরিষ্কার করা ছেড়ে দিলাম। সবরকম খাবারও খেতে লাগলাম—যে সব ওদেশীয় খাবার খাওয়া মানেই আমার মৃত্যু তাও খেতে লাগলাম। কয়েক সপ্তাহ কাটার পর ধূমপানও ধরলাম, সুরাপানও বাদ দিলাম না। বহুবছর ধরে এমন আনন্দ পাইনি! সমুদ্রে টাইফুন উঠল। শুধু ভয়েই আমার কফিনে ঢোকার কথা—তা না হয়ে বরং ব্যাপারটায় দারুণ উত্তেজনা পেলাম।

'জাহাজে খেলাধুলোও করলাম, গান গাইলাম, নতুন বন্ধু জুটলো, রাতও জাগলাম। যখন চীন আর ভারতবর্ষে পৌঁছলাম, দেখতে পেলাম দেশে ব্যবসার চিন্তায় যা দেখেছি এদেশের দারিদ্রের তুলনায় তা স্বর্গ। আমার সব দুশ্চিন্তা কোথায় মিলিয়ে গেল। চমৎকার বোধ করতে লাগলাম। যখন আমেরিকায় ফিরলাম আমার ওজন নব্বই পাউণ্ড বেড়ে গেছে, আমার কোনকালে পাকস্থলীর আলসার ছিলো তা ভুলেই গেলাম। জীবনে এতভালো কখনও লাগেনি। ব্যবসায় যোগ দিলাম, তারপর

থেকে একদিনের জন্যও অসুস্থ হইনি।'

আর্ল পি হ্যানী আমায় বলেছেন অবচেতন মনেই তিনি উইলিন এইচ্‌- ক্যারিয়ারের দুশ্চিন্তা দূর করার উপায় কাজে লাগান।

'প্রথমতঃ নিজেকে যে প্রশ্ন করি তা হলো: 'সবচেয়ে খারাপ কি হতে পারে?' উত্তর হলো মৃত্যু।

'দ্বিতীয়তঃ, আমি মৃত্যুকে বরণ করতে প্রস্তুত হলাম। কারণ এ ছাড়া কোন পথ ছিলোনা। ডাক্তারদের মত হলো আমার কোন আশাই নেই'

'তৃতীয়তঃ, যেটুকু সময় আমার বাকি ছিল তাই যতোটা ভালো ভাবে সম্ভব কাজে লাগাতে চাইলাম· ·এছাড়া যদি খালি দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়তাম তাহলে ফিরে আসতে হত ওই কফিনে আশ্রয় নিয়েই! কিন্তু আমি মনের দিক থেকে সব চিন্তা ভাবনা ছেড়ে আরাম করে চলেছিলাম। ওই মানসিক প্রশান্তিই আমাকে নতুন প্রেরণা দিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা করেছে।'

অতএব দ্বিতীয় নিয়মটি হলো: আপনার যদি কোন দুশ্চিন্তা আর সমস্যা থাকে তাহলে উইলিন এইচ ক্যারিয়ারের পরামর্শ কাজে লাগান। এই তিনটি কাজ করা চাই—

১। নিজেকে প্রশ্ন করুন, 'সবচেয়ে খারাপ কি ঘটতে পারে?

২। অবশ্যম্ভাবী যা তা, গ্রহণ করতে তৈরি হোন।

৩। তারপর শান্ত ভাবে চেষ্টা করুন খারাপ অবস্থা থেকে কি ভাবে উন্নতি করা যায়।

॥ তিন ॥

দুশ্চিন্তা আপনার কতখানি ক্ষতি করতে পারে

'যে ব্যবসায়ীরা জানে না দুশ্চিন্তা কি করে জয় করতে হয় তাদের অল্পবয়সেই মৃত্যু হয়—'

ডঃ অ্যালেক্সিস ক্যারেল

কিছুদিন আগে এক প্রতিবেশী আমাদের বাড়ি এসে বলেন আমাদের সকলের বসন্ত রোগের জন্য টিকা নেওয়া উচিত। তার মত এমন হাজার হাজার লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিউ ইয়র্কের বাড়ি বাড়ি ঘুরে আবেদন জানাচ্ছিলেন। ভীত মানুষরা ঘন্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকা নিচ্ছিলো। এজন্য হাসপাতাল ছাড়াও দমকলের অফিস, পুলিশ থানা, বড় বড় কারখানা, সর্বত্র টিকা দেবার অফিস খোলা হয়। দুহাজার ডাক্তার আর নার্স পাগলের মতই সারাদিন পরিশ্রম করছিলেন। এরকম উত্তেজনার কারণ কি? নিউ ইয়র্কে আটজনের বসন্ত হয় আর তাদের দুজন মারা যায়। ভাবুন, আশি লক্ষ মানুষের মধ্যে মাত্র দুজন।

আমি নিউইয়র্ক শহরে প্রায় সাতচল্লিশ বছরেরও বেশি কাটিয়েছি, অথচ আজ পর্যন্ত কেউ আমার বাড়ির কড়া নেড়ে আবেগজনিত দুশ্চিন্তার বিষয়ে সতর্ক করেনি —এই রোগে গত সাঁইত্রিশ বছরে বসন্তের চেয়ে অন্ততঃ দশহাজারগুণ বেশি ক্ষতি করেছে:

কেউ আমায় সতর্ক করে বলেনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দশজনের মধ্যে একজনের স্নায়বিক রোগে ভেঙে পড়ার ভয় আছে—এর মূল হল আবেগজনিত দুশ্চিন্তা। এজন্যই আমি এই পরিচ্ছেদ লিখে আপনাদের কড়া নেড়ে সাবধান করতে চাইছি।

চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিখ্যাত ডঃ আলেক্সিস ক্যারেল বলেছেন, ব্যবসায়ীরা দুশ্চিন্তা কি ভাবে জয় করতে হয় জানেনা তাদের অল্পবয়সেই মৃত্যু।' কেবল ব্যবসায়ীরা নয়, গৃহিণী, ঘোড়ার ডাক্তার, রাজমিস্ত্রিদের বেলাতেও একই কথা।

কবছর আগে আমি টেক্সাস আর নিউ মেক্সিকোতে মোটরে চড়ে বড় সান্টাফে রেল-ডাক্তার ডঃ ও. এফ. গোবারের সঙ্গে ছুটি কাটাই। আমরা আলোচনা করতে দুশ্চিন্তার কথা উঠতেই তিনি বললেন: 'ডাক্তারের কাছে আসা রোগীদের শতকরা সত্তর ভাগই তাদের রোগ নিরাময় করতে পারতো যদি তারা ভয় আর দুশ্চিন্তা দূর করাতে পারতো। তবে মনে করবেন না তাদের রোগটা কাল্পনিক বলছি। দাঁত ব্যথা এবং আর ও শতগুণ বিপজ্জনক রোগ তাদের হয় কথাটা ঠিক। যেমন পাকস্থলীর আলসার, নিদ্রাহীনতা, হৃদরোগ, কোন ধরনের পক্ষাঘাত ইত্যাদি।

'রোগগুলো ঠিকই,' ডঃ গোবার বলেছিলেন, কারণ আমি নিজেই বারো বছর ধরে আলসারে ভুগেছি, তাই কি বলছি আমি জানি।'

'ভয় থেকেই আসে দুশ্চিন্তা। দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগে স্নায়ুর বিকৃতি দেখা দেয় আর সেটা পাকস্থলীর স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত করে, ফলে পাচক রসে বিকৃতি ঘটে আর শেষ অবধি আলসারে দাঁড়ায়।'

আর একজন চিকিৎসক, 'স্নায়বিক পেটের রোগ' বইয়ের লেখক ডঃ যোশেফ এফ. মন্টেগু একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন: 'আপনি যা খান তাতে আলসার হয় না। আপনাকে যা কুরে কুরে খায় তাতেই আলসার হয়।' মেয়ো ক্লিনিকের ডাক্তার ডঃ ডব্লিউ সি. আলভারেজ বলেন, 'আলসার কমে বা বাড়ে মানসিক অবস্থার উত্থান পতনে।' এই কথা বলা হয় মেয়ো ক্লিনিকে ১৫,০০০ হাজার রোগীর পাকস্থলীর চিকিৎসার অভিজ্ঞতায়। ভয়, উদ্বেগ, ঘৃণা, অতিমাত্রার স্বার্থপরতা আর বাস্তবের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর অক্ষমতাই এই আলসারের জন্য দায়ী।…পাকস্থলীর আলসারে মৃত্যু ঘটতে পারে। লাইফ পত্রিকায় বলা হয়েছে যে মারাত্মক রোগের তালিকায় এর স্থান দশম।

কিছুকাল আগে মেয়ো ক্লিনিকের জনৈক ডাক্তারের সঙ্গে আমার পত্রালাপ হয় তিনি কিছুদিন আগে এক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। তাতে তিনি বলেন তিনি ১৭৬ জন ব্যবসা জগতের উপরতলার কর্মীকে পরীক্ষা করেন। তাদের বয়সের গড় ৪৪'৩ বছর। তাদের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশের কিছু বেশি হৃদ-রোগ, পাকস্থলীর আলসার আর উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন। ভাবুন তো—এই সব মানুষ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের আগেই ওই সব রোগে আক্রান্ত! হৃদরোগ বা আলসারে ভুগছেন এমন কেউ কি ব্যবসায় সফল হতে পারবেন? সাফল্য পেতে কি ভয়ানক দামই দিতে হচ্ছে। আর তাতে সাফল্য আসছে? যদি ব্যবসা সফল করতে আলসার বা হৃদরোগ বানাতে হয় তাকে কি সাফল্য বলা যায়? তিনি যদি সারা পৃথিবীর অধীশ্বর হন তাহলেও তো একটা বিছানাতেই শুতে হবে আর দিনে তিনবারের বেশি খেতেও পারবেন না। যে লোক মাটি কুপিয়ে খাল বানায় সেও তাই করে অনেক আনন্দে দিন কাটায় এবং ব্যবসা সংক্রান্ত যে কোন অফিসারের চেয়ে ভালোই ঘুমোয়। সত্যি বললে চাষ করে স্বাস্থ্য ঠিক রাখা যায়। আমি রেলপথ বা সিগারেট কোম্পানীর অধিকারী হতে গিয়ে পঁয়তাল্লিশ বছরে নিজেকে শেষ করতে চাই না।'

সিগারেটের কথায় মনে পড়ছে সম্প্রতি পৃথিবীর সবচেয়ে পরিচিত সিগারেট কোম্পানীর প্রস্তুতকারক কানাডিয় জঙ্গলে ছুটি কাটাতে গিয়ে হৃদরোগে মারা যান তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করেন আর একষট্টি বছর বয়সে মারা গেলেন। ব্যবসায়ে সাফল্য আনতে গিয়ে তিনি বোধহয় জীবনের সেরা অংশই ব্যয় করেছিলেন।

আমার মতে সিগারেট কোম্পানীর ওই মালিক আমার বাবার তুলনায় অর্ধেক জীবনে সফল হননি। মিসৌরীর চাষী, আমার বাবা বেঁচেছিলেন ৮৯ বছর আর এক কপর্দকও মৃত্যুর সময় রেখে যাননি।

বিখ্যাত মেয়ো ভাইয়েরা বলেছেন আমাদের হাসপাতালের অর্ধেকেরও বেশি রোগী হলেন স্নায়ুর রোগী। তবুও এইসব স্নায়ু রোগীরা মারা যাওয়ার পর অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষার পর দেখা যায় তাদের স্নায়ু ম্যাক ডেম্পসীর চেয়েও সবল ছিল। তাদের স্নায়ুর গোলযোগ ঘটে শারীরিক কারণে নয় বরং ব্যর্থতা, পরাজিতের মনোভাব, উদ্বেগ, ভয়, দুশ্চিন্তা এবং হতাশা থেকে। প্লেটো বলেছিলেন, 'চিকিৎসকরা যে ভুল করেন তা হলো তারা মনের চিকিৎসা না করে শরীর সারাতে চান, যদিও মন আর শরীর অবিচ্ছেদ্য তাই আলাদা করে চিকিৎসা উচিত নয়।'

এই মহাসত্য বুঝতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের লেগেছিল তেইশশো বছর। আমরা এখন এক নতুন ধরনের ওষুধ তৈরির চেষ্টা করছি যার নাম সাইকোসোমাটিক ওষুধ —যে ওষুধ মন ও শরীরের একসঙ্গে চিকিৎসা করবে। আমাদের এটা করার উপযুক্ত সময় কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞান ইতিমধ্যেই সাংঘাতিক সব রোগ—যেমন বসন্ত, কলেরা, ইয়েলোফিভারের মত রোগ নির্মূল করতে পেরেছে, যে রোগে কোটি কোটি মানুষের অকালমৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান উদ্বেগ, ভয়, ঘৃণা, হতাশা ইত্যাদিতে যে মন ও শরীর ভেঙে যায় তা রোধ করতে পারেনি। এই জাতীয় রোগ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

ডাক্তারদের মত হলো প্রতি বিশজনে একজন আমেরিকান তার জীবনের একাংশ কোন না কোন সময় মানসিক হাসপাতালে কাটাতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেনাদলে যোগ দিতে যেসব যুবক আসে তাদের প্রতি ছ'জনের মধ্যে একজন মানসিক বিকারগ্রস্ত বলে ভর্তি নেওয়া হয়নি।

লোকে উন্মাদ হয় কেন? এর সব উত্তর কেউ জানেন না। তবে এটা খুবই সম্ভব যে অনেক ক্ষেত্রেই ভয় আর উদ্বেগ এজন্য দায়ী। দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগে যে হতাশাগ্রস্ত হয়, নিজেরাই এক স্বপ্নের জগৎ গড়ে নেয় আর সেইভাবেই তারা দুশ্চিন্তা কাটায়।

লেখার অবসরে দেখছি আমার সামনে একখানা বই রয়েছে। বইখানা ডঃ এডওয়ার্ড পেভোলস্কির লেখা, নাম 'দুশ্চিন্তা কাটিয়ে নিরাময় হোন।' বইয়ের কিছু পরিচ্ছেদের নাম এই :

দুশ্চিন্তা হৃদয়ের কি করে?
দুশ্চিন্তায় রক্ত চাপ বাড়ে।
দুশ্চিন্তায় বাত হতে পারে।
পাকস্থলীর জন্যই দুশ্চিন্তা কম করুন।
দুশ্চিন্তায় কিভাবে সর্দিকাশি হয়?
দুশ্চিন্তা ও থাইরয়েড গ্রন্থি।
দুশ্চিন্তা গ্রস্থ বহুমূত্ররোগী।

দুশ্চিন্তা সম্পর্কে আর একখানা চমৎকার বই হলো ডঃ কার্ল মেনিনজারের 'নিজের বিরুদ্ধে মানুষ।' তার বইতে দুশ্চিন্তা দূর করার কোন পরামর্শ নেই তবে এতে

পাবেন আমরা কিভাবে আমাদের স্বাস্থ্য আর মন, উদ্বেগ, হতাশা, ঘৃণা, তিক্ততা, ভয় ইত্যাদিতে সমস্ত নষ্ট করে ফেলি তারই অভাবিত সব দৃষ্টান্ত।

দুশ্চিন্তা কঠিন ধাতের মানুষকেও অসুস্থ করে তুলতে পারে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের শেষ দিকে জেনারেল গ্র্যান্ট সেটা বুঝেছিলেন। কাহিনীটি এই রকম : গ্র্যান্ট ন' মাস যাবৎ রিচমন অবরোধ করেছিলেন। জেনারেল লী'র সেনাদল ক্ষুধা-তৃষ্ণায় চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পরাজিত। সমস্ত রেজিমেন্ট পালাতে ব্যস্ত। বাকিরা তাঁবুতে বসে আর্তনাদ করছিল আর কাঁদছিল কেউবা প্রার্থনায় রত। শেষের আর দেরি ছিলোনা। লী'র সেনারা রিচমন্ডের অস্ত্রের গুদাম, তুলো আর তামাকের গুদামে আগুন লাগানোয় সারা রিচমন্ড যেন জ্বলছিল। তারা রাতের অন্ধকারে পালায়। গ্র্যান্ট চারদিক থেকে তাড়া করে চলেছিলেন তেজের সঙ্গে কনফেডারেট সেনাদের। সেই সময় শেরিডানের অশ্বারোহী বাহিনী সামনে রেললাইন উপড়ে ফেলে সরবরাহের গাড়ি অধিকার করেছিলেন।

গ্র্যান্ট প্রচন্ড মাথার যন্ত্রনায় প্রায় অন্ধ হয়ে পিছিয়ে পড়ে একটা খামারবাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তিনি তার 'স্মৃতিকথায়' বলেছেন, 'আমি সারা রাত গরম জলে পা ডুবিয়ে ঘাড়ে আর হাতের কব্জিতে সরষের তেল মেখে সকালে সুস্থ হব ভেবে কাটালাম।'

পরদিন সকালে তিনি চট করেই সেরে উঠলেন। আর তাকে যা সারিয়ে তুললে তা কিন্তু সরষের তেলের পুলটিস নয়, একজন অশ্বারোহী লী' আত্মসমর্পণ করতে চান লেখা একটা চিঠি আনার ফলে।

'অফিসারটি চিঠি সহ আমার কাছে আনার সময়েও,' গ্র্যান্ট লিখেছেন, 'আমার অসহ্য মাথার যন্ত্রনা হচ্ছিলো। কিন্তু যে মুহূর্তে চিঠির বক্তব্য দেখলাম আমি ভালো হয়ে গেলাম।

বোঝা যাচ্ছে গ্র্যান্টের দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ আর আবেগই তাকে অসুস্থ করে তুলেছিল কিন্তু যে মুহূর্তে তার সব আবেগ আত্মবিশ্বাস, সমাধা এবং জয় এনে দিলো তখনই তিনি সেরে উঠলেন।

এর ঠিক সত্তর বছর পরে ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের ক্যাবিনেটের ট্রেজারী সেক্রেটারী হেনরি মর্গেনথাউ, জুনিয়র আবিষ্কার করেন যে, দুশ্চিন্তা তাকে এতোই অসুস্থ করেছে যে তার মাথা ঘুরতে থাকে। তিনি তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন যে তার অসম্ভব দুশ্চিন্তা হয় প্রেসিডেন্ট যখন গমের দাম বাড়ানোর জন্য একদিনে চুয়াল্লিশ লক্ষ বুশেল গম কেনেন। তিনি ডায়েরীতে লেখেন : 'ব্যাপারটা যখন চলছিল তখন সত্যিই আমার মাথা ঘুরছিল। বাড়ি ফিরে আমি দুঘন্টা ঘুমোই।'

দুশ্চিন্তা মানুষের কি ক্ষতি করতে পারে জানার জন্য আমাকে লাইব্রেরীতে বা ডাক্তারের কাছে যেতে হয়না। এই বই লেখার সময় জানালা দিয়ে তাকালে দেখতে পাই একটা বাড়িতে একজন স্নায়বিক অবসাদে ভেঙে পড়েছেন—আর অন্য একটা বাড়িতে অপর জনের ডায়াবেটিস হয়েছে। শেয়ার বাজার পড়ে যাওয়াতেই তার র

আর প্রস্রাবে সুগার বেড়ে যায়।

বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক মন্টেইনকে তার নিজের শহর বোর্দোর মেয়র নির্বাচিত করা হলে তিনি নাগরিকদের বলেন: 'আপনাদের সব কাজের দায়িত্ব আমার হাতে নিতে পারি তবে আমার লিভার আর পাকস্থলীতে নয়।'

আমার ওই প্রতিবেশী শেয়ার মার্কেটের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করেই প্রায় মরতে বসেছিলেন।

দুশ্চিন্তার কুফল নিয়ে ভাবতে গিয়ে আমাকে অবশ্য প্রতিবেশীর দিকে তাকানোরও দরকার হয় না কারণ আমার এই ঘরেই তার প্রমাণ আছে। এবাড়ির পূর্বতন মালিকও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে অকালে মারা যান।

বিশ্বের অন্যতম গেঁটে বাত বিশেষজ্ঞ ডঃ রাসেল ডি. সিসিল বলেছেন দুশ্চিন্তা মানুষকে বাতে পঙ্গু করে হুইল চেয়ারে বসাতে পারে। তাঁর মতে গেঁটে বাত হওয়ার প্রধান চারটি কারণ এই:

১। বিবাহ ভঙ্গের জন্য।

২। অর্থনৈতিক বিপর্যয় আর দুঃখ।

৩। নিঃসঙ্গতা আর দুশ্চিন্তা।

৪। বহুকাল পুষে রাখা অসন্তোষ।

এই কারণগুলো অবশ্যই আবেগ জনিত আরও ঢের কারণে গেঁটে বাত হতে পারে। তবে সাধারণ কারণ বলতে ওই দুশ্চিন্তাই আছে। উদাহরণ হিসেবে বলছি, আমার এক বন্ধুর আর্থিক দুরবস্থার সময় গ্যাস কোম্পানী গ্যাস বন্ধ করে দেয়। ব্যাঙ্ক ও বাড়ির মর্টগেজ রদ করে দেয়। এই সময় তার স্ত্রীর গেঁটে বাত জন্মায়—আর যতদিন না তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো হয় ততদিন রোগ সারেনি।

দুশ্চিন্তায় দাঁতেরও ক্ষয় হয়। ডঃ উইলিয়াম আই. এল. ম্যাকগনিগল বলেন, 'অসুখী মনোভাব যদি দুশ্চিন্তা, ভয় ঘ্যানঘ্যানানি থেকে জন্মায় তা শরীরের ক্যালসিয়াম নষ্ট করে দিতে পারে আর তাতেই দাঁতে ক্ষয় হয়। তিনি এক রোগীর কথা বলেছেন যার চমৎকার দাঁত ছিলো কিন্তু তার স্ত্রীর অসুস্থতার চিন্তায় প্রায় নটি দাঁতে গর্ত হয়ে যায়। সবটাই ওই দুশ্চিন্তার জন্য।

এমন কাউকে দেখেছেন যার থাইরয়েড গ্রন্থি অতি চঞ্চল? আমি দেখেছি, তারা থর থর করে কাঁপে—তারা যেন মৃত্যুভয়ে সবসময়েই ভীত। থাইরয়েড গ্ল্যান্ড যা শরীর নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের এমন অবস্থায় এনে ফেলে যে, হার্টের গতি বৃদ্ধি হয়—সারা দেহ যেন চুল্লির আগুনে হাওয়া পেয়ে জোরে চলতে থাকে। আর এটা বন্ধ না করতে পারলে, অস্ত্রোপচার বা চিকিৎসা না করলে এঁরা মৃত্যুবরণ করতে পারে।'

কিছুদিন আগে এক বন্ধুর সঙ্গে ফিলাডেলফিয়ায় গিয়েছিলাম, তার এই রোগ ছিল। তাকে এক বিখ্যাত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই, তিনি আটত্রিশ বছর এই রোগের চিকিৎসা করছেন। তার বৈঠকখানার দেয়ালে ফ্রেমে আঁটা একটা উপদেশ ছিলো। আমি সেটা টুকে নিই। সেটা এই রকম:

সবচেয়ে আরামপ্রদ অবসর বিনোদনের শক্তি হলো সুস্থধর্ম, ঘুম, সঙ্গীত আর হাসি। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখুন—ভালোভাবে ঘুমোতে শিখুন—সঙ্গীতকে ভালোবাসুন আর জীবনের মজার দিকটি দেখার চেষ্টা করুন। তাহলেই সুস্বাস্থ্য আর সুখ আপনার আয়ত্ত হবে।

* * *

আমার ঐ বন্ধুকে ডাক্তার প্রথমেই এই প্রশ্ন করেন : 'আপনার কি কোন মানসিক আবেগের ফলে এমন অবস্থা হয়েছে?' তিনি আমার বন্ধুকে সাবধান করে বলেন তিনি যদি দুশ্চিন্তা দূর না করেন তাহলে অন্য উপসর্গ যেমন—হৃদরোগ, আলসার বা বহুমূত্র ইত্যাদি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ডাক্তার জানান, 'এই সব রোগ খুড়তুতো, জ্যেঠতুতো ভাইয়ের মতই—এর সবই দুশ্চিন্তার রোগ!'

আমি যখন প্রথম মার্লে ওবেরনের সাক্ষাৎকার নিই তিনি আমাকে জানান তিনি কিছুতেই দুশ্চিন্তা করেন না। কারণ তার জানা ছিলো দুশ্চিন্তা সিনেমার পর্দায় তার প্রধান আকর্ষণই নষ্ট করে দেবে।

তিনি আমায় বলছিলেন : প্রথম যখন সিনেমায় নামতে যাই দুশ্চিন্তা আর ভয়ে কাঠ হয়েছিলাম। আমি সবে ভারতবর্ষ থেকে এসেছি আর লণ্ডনে কাউকে চিনতাম না সেখানে একটা কাজ চাইছিলাম। যখন প্রযোজকের সঙ্গে দেখা করি, কিন্তু কেউ আমায় নিলেন না, আমার সামান্য পুঁজি ফুরিয়ে আসছিল। দু'সপ্তাহ ধরে আমি শুধু বিস্কুট আর জল খেয়ে কাটাই। তখন দুশ্চিন্তা ছাড়াও আমার খিদের জ্বালাও জুটলো। নিজেকে তাই বললাম, 'হয়তো তুমি একটি বোকা—হয়তো কোনদিনই ছবির জগতে ঢুকতে পারবে না। তোমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। জীবনে কখনো অভিনয় করোনি—তোমার সুন্দর মুখখানা ছাড়া আর কি দেখার আছে?'

'আমি আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। যখন আয়নায় তাকালাম দেখলাম দুশ্চিন্তা আমার মুখের কি দশা করেছে, কালো রেখা পড়েছে সেখানে। উদ্বেগের চিহ্নও চোখে পড়ল। তাই নিজেকে বললাম : 'এটা এখনই বন্ধ করা চাই। তোমার দুশ্চিন্তা করা একেবারে চলবে না। দেবার মত তোমার ওই সৌন্দর্যই আছে, তাকে নষ্ট করা চলবে না।'

মেয়েদের চেহারা সবচেয়ে খারাপ হয়ে যায় দুশ্চিন্তায়। দুশ্চিন্তা নিজেকে প্রকাশে বাধা দেয়। চুলে পাক ধরতে পারে, তা উঠেও যেতে পারে, চামড়ার রোগ হতে পারে।

আমেরিকায় হৃদরোগেই আজকাল সবচেয়ে বেশি লোক মারা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় সাড়ে সাতলক্ষ লোক মারা যায়। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে বিশ লক্ষ লোক মারা যায় হৃদরোগে—এর অর্ধেক আবার এমন হৃদরোগে, যার উৎপত্তি হয় দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগে জীবন যাপনের জন্য। হ্যাঁ, এই কারণেই ডঃ অ্যালেক্সিস বলেছিলেন : 'যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা জানেন না দুশ্চিন্তা কিভাবে দূর করতে হয় তাদের অল্পবয়সে মৃত্যু হয়।'

নিগ্রো আর চীনাদের কদাচিৎ এই ধরনের দুশ্চিন্তার কারণে হৃদরোগ হয়। কারণ তারা সবকিছুই শান্তভাবে মেনে নিতে অভ্যস্ত। খামারের কৃষকদের চেয়ে ডাক্তারদের মধ্যে হৃদরোগে মৃত্যুর সংখ্যা বিশগুণ বেশি। ডাক্তারদের জীবন দুশ্চিতায় কাটে বলে তারা উচিত মূল্য পেয়ে থাকেন।

উইলিয়াম জেমস বলেছেন, 'ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করেন', কিন্তু আমাদের স্নায়ু তা করেনা।'

একটা আশ্চর্যজনক আর প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার শুনুন: আমেরিকায় সবচেয়ে ছোঁয়াচে রোগে যত লোক মারা যায় তার চেয়ে ঢের বেশি মারা যায় আত্মহত্যা করে।

কেন এরকম হয়? এর প্রধান কারণই হলো: 'দুশ্চিন্তা।'

চীনের নিষ্ঠুর সেনাধ্যক্ষরা তাদের বন্দীদের উপর অত্যাচার চালাতে তাদের খুঁটির সঙ্গে হাত-পা বেঁধে উপরে ঝোলানো চামড়ার ব্যাগ ভর্তি জলের নিচে রাখতেন—ওই ব্যাগ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়তো মাথায়।···অনবরত··· সারা দিন রাত ধরে। ওই জলের ফোঁটাকে শেষ অবধি মনে হত যেন হাতুড়ির আঘাত —মানুষ তাতে পাগল হয়ে যেত। হিটলারের আদেশে এই একই পদ্ধতি কাজে লাগানো হয় স্পেনের বন্দীনিবাস আর জার্মানীর কনসেনট্রেশান শিবিরে।

দুশ্চিন্তাও অনেকটা এই অনবরত ঝরে পড়া জলের ফোঁটার মত, আর ক্রমাগত এই দুশ্চিন্তায় মানুষ উন্মাদ হয়ে যায় আর আত্মহত্যা করতে চায়।

মিসোরীতে আমি যখন অল্পবয়সের ছেলে তখন বিলি সানডের কাছে পরজন্মের নরকাগ্নির কথায় দারুণ ভয় পেতাম। কিন্তু এই জীবনে শরীরে যে নরকাগ্নি জ্বলছে এবং তার যন্ত্রণা অনুভূত হচ্ছে কেউ তার কথা কখনও বলেন নি। যেমন, আপনি যদি ক্রমাগত দুশ্চিন্তা করেন তাহলে একদিন হয়তো এমন বেদনায় আক্রান্ত হতে পারেন যার নাম এঞ্জাইনা পেক্টোরিস অর্থাৎ হৃদযন্ত্রের ব্যথা।

এ রোগের আক্রমণে যে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করবেন তাতে দান্তের 'ইনফারনো'কেও মনে হবে ছেলেমানুষী। তখন আপনি নিজেই বলতে চাইবেন, 'হে ভগবান, এথেকে মুক্তি পেলে আর কখনই দুশ্চিন্তা করবো না। বাড়িয়ে বলছি কিনা পারিবারিক চিকিৎসককে প্রশ্ন করুন একবার।

আপনি কি জীবনকে ভলোবাসেন? দীর্ঘদিন সুস্থ শরীরে বাঁচতে চান? তাহলে একটা কথা শুনে নিন। আমি আবার ডঃ অ্যালেক্সি ক্যারেলের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি বলেন, 'যাঁরা এই আধুনিক শহর কোলাহলের মধ্যেও অন্তরের শান্তি বজায় রাখতে পারেন তাঁদের স্নায়ুর রোগ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।'

আপনি আভ্যন্তরীণ সত্তাকে এভাবে শান্তিতে রাখতে পারেন কি?' আপনি একজন স্বাভাবিক মানুষ হলে এর উত্তর হলো: 'হ্যাঁ'। বা 'অবশ্যই'। আমরা বেশির ভাগই অনেকাংশে শক্তিশালী, যদিও আমরা তা সব সময় বুঝে উঠতে পারি না। আমাদের মধ্যে যে ক্ষমতা আছে তাকে আমরা হয়তো কখনই খুঁজে বার করে কাজে লাগাইনি। থোরো তার অমর রচনা 'ওয়ালডেন' নামক বইটিতে

লিখেছেন : 'আপন জীবনকে সচেষ্টভাবে উন্নত করার শক্তির উৎসাহব্যঞ্জক কথা আমার কাছে খুবই বড় বলে মনে হয়…দৃঢ়তা নিয়ে কেউ যদি তার স্বপ্নের দিকে এগুতে চেষ্টা করে, আর সেরকম জীবন যাপন যদি করতে পারে তাহলে সে সাফল্য হবে অসামান্য।'

ওলগা কে. জার্ভির মত মনের জোর আর শক্তি এই বইয়ের পাঠকের অনেকেরই অবশ্যই আছে। তিনি বুঝেছিলেন অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার মধ্যেও তিনি দুশ্চিন্তা সরিয়ে রাখতে পারেন। আপনি বা আমিও তা পারবো, এই বইয়ে যা আলোচিত হয়েছে সেই পুরনো সত্যগুলো যদি কাজে লাগাই। ওলগা কে. জার্ভি আমাকে যা লেখেন তা এই : 'সাড়ে আট বছর আগে আমি দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে মরতে বসেছিলাম। দেশের বিখ্যাত ডাক্তাররাও আমার জীবনের আশা নেই বলেন। আমার সামনে আসে বিরাট এক শূন্যতা। তখন আমার বয়স অল্পই ছিল। আমি মরতে চাইনি। হতাশায় আমার ডাক্তারকে ফোন করে সব জানিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ি। অধৈর্যের সঙ্গে তিনি বললেন, 'কি ব্যাপার ওলগা, লড়াই করার মত মনের জোর তোমার নেই ? কাঁদলে নিশ্চিত মরবে। হ্যাঁ, সবচেয়ে খারাপই তোমার হয়েছে। ঠিক আছে—সত্যের মুখোমুখি হও। দুশ্চিন্তা ত্যাগ করো ; আর কিছু একটা করো !' সেই মুহূর্তেই শপথ করলাম, 'আর দুশ্চিন্তা করব না। আমি আর কাঁদবোও না। বস্তুর চেয়ে মনের জোর যদি বেশি হয় তাহলে আমি জয়ী হবই। আমি বেঁচে থাকবো !'

'রেডিয়াম আর দেওয়া যাচ্ছিল না তাই রঞ্জন রশ্মি দেওয়া হতে লাগল ৪৯ দিন ধরে রোজ সাড়ে চোদ্দ মিনিট। আমার শরীরের হাড় দেখা যাচ্ছিল, আমার পা সীসের মত ভারি হয়ে গিয়েছিল। তবুও আমি দুশ্চিন্তা করিনি। হ্যাঁ, এমনকি জোর করে হাসতেও চাইছিলাম।

'আমি এমন মূর্খ নই যে ভাববো, হাসিতে ক্যান্সার নিরাময় হয়। তবে এটা জানি আর বিশ্বাস করি মানসিক অশান্তি থাকলে রোগ নিরাময়ে সুবিধা হয়না। যাই হোক দেবের সাহায্যে যে ক্যান্সার সারে তা উপলব্ধি করলাম। গত কবছরে যে স্বাস্থ্য আমার আছে তেমন সুস্থ আগে কখনও থাকিনি। সেই কথাগুলোকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না : দুশ্চিন্তা ত্যাগ করো ⋯ কিছু একটা করো !'

এই পরিচ্ছেদে ইতি টানবো আবার সেই ডঃ অ্যালেক্সি ক্যারেলের কথা দিয়ে : 'যে ক্যারেল কি আপনার কথা ভাবছিলেন ?

হতেও পারে।

মহম্মদের ক্ষ্যাপা শিষ্যদের মধ্যে অনেকে কোরাণের বাণী উল্কি করে বুকের উপর লিখে রাখত। তাই আমারও ইচ্ছে এই কয়টি কথা মনের একান্ত গভীরে প্রবেশ করুক : "যে সমস্ত ব্যক্তিরা দুশ্চিন্তা প্রতিরোধ করতে পারেন না তাঁদের আয়ু অল্প।"

॥ চার ॥

দুশ্চিন্তা সমাধানের পথ

আমার ছ'জন সৎ কর্মচারী আছে
(আমি যা জানি সব তারাই শিখিয়েছে)
—তাদের নাম হল, কি, কেন, কখন,
কে, কেমন করে আর কোথায়।

—রাডিয়ার্ড কিপলিং

প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উইলিস এইচ. ক্যারিয়ারের যে যাদুময় কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে তাতে কি সব দুশ্চিন্তার সমাধান হয়ে যাবে? না, তা কখনই হবে না।

তাহলে এর উত্তর কি কি? উত্তর হলো আমাদের দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য প্রধান তিনটি ধাপ মেনে নিতে হবে। সেই ধাপ তিনটে হলো এই:

১। সমস্ত ব্যাপার বুঝে নেওয়া চাই।

২। তারপর ঘটনার বিশ্লেষণ করতে হবে।

৩। এরপর সিদ্ধান্তে পেঁছে যাওয়া—আর সেই মত কাজ করা।

এ তো জানা কথা, নয় কি? হ্যাঁ, অ্যারিস্টটল একথা বলে—সেইমত কাজও করেছেন: আপনাকে আর আমাকেও তাই করে যেসব সমস্যা আমাদের নরক যন্ত্রণা ভোগ করায় তা সমাধান করতে হবে।

প্রথম ধাপটাই ধরা যাক: সমস্ত ব্যাপার বুঝে নেওয়া চাই; ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া জরুরী কেন? কারণ সেটা না জানলে আমরা হয়তো বুদ্ধিমানের মত তা সমাধান করতে পারবো না। ব্যাপারটা না জানলে আমাদের হয়তো শুধু ঘুরপাক খেয়ে যেতে হবে। কথাটা কি আমার? মোটেই না। একথা হলো প্রয়াত হার্বার্ট ই. হকসের। তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন। বাইশ বছর ধরে লক্ষ লক্ষ ছাত্রদের দুশ্চিন্তা সমাধানে তিনি সাহায্য করে যান। তিনিই আমাকে বলেছিলেন: 'দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ হলো এলোমেলো ভাবনা।' তিনি বলেন; 'পৃথিবীতে অর্ধেক দুশ্চিন্তার কারণ তাদেরই হয় যারা জানেনা আসল ব্যাপারটা কি ভাবে সমাধান করতে হবে। যেমন, আমায় যদি আগামী মঙ্গলবার বেলা তিনটেয় কোন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে মঙ্গলবার বেলা তিনটের আগে সমাধানের কথা আমি ভাবতেও রাজি নই! ইতিমধ্যে ওই সমস্যা সম্বন্ধে সব খবর জোগাড় করাই হবে আমার কাজ। এ নিয়ে আমি একেবারে দুশ্চিন্তা করব না। রাত্রে ঘুম নষ্ট করব না। ইতিমধ্যে সব খবরাখবর জোগাড় হলে মঙ্গলবার আসার পর সব সমস্যার ঠিক সমাধান হয়ে যায়!'

আমি ডীন হক্সকে প্রশ্ন করেছিলাম তিনি কি সব দুশ্চিন্তা দূর করতে পেরেছেন। তাঁর জবাব ছিলো : 'হ্যাঁ, সত্যিকথা বললে আমার জীবনে কণামাত্র দুশ্চিন্তা নেই। একজন মানুষ যদি—আন্তরিকতা নিয়ে সব ব্যাপারের সন্ধান রাখে তাহলে জ্ঞানের আলোকে তার দুশ্চিন্তা আপনা আপনিই দূরীভূত হয়ে যায়।

কিন্তু আমরা বেশির ভাগ কি করি? টমাস এডিসন বলেছেন, 'চিন্তা না করার জন্য মানুষ হাজারো ফিকির খোঁজে—মানুষ প্রায় সব করতে পারে শুধু চিন্তা করা ছাড়া। ঘটনাগুলো যদি সংগ্রহ করতেই হয় তাহলে আমরা শুধু সুবিধাজনক ঘটনাই খুঁজে পেতে চাই। আমরা যা ভাবছি তা আমাদের কাজে প্রমাণ করার জন্যই কিছু খবর খুঁজি। আন্দ্রে মারোয়া বলেছেন : 'যা কিছু আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার সঙ্গে মিল খায় তাই আমরা বিশ্বাস করি। যা মেলেনা তার জন্য আমাদের রাগ হয়!'

তাই আমাদের সমস্যার উত্তর পাওয়া এতো কঠিন, এতে অবাক হওয়ার কিছু আছে? একটা অঙ্কের সমাধান কি সম্ভব যদি আগেই ভেবে নিই দুয়ে আর দুয়ে পাঁচ হয়? তবুও এমন ঢের লোক আছে দুয়ে দুয়ে পাঁচ বা পাঁচশো হয় ভেবে নিজের আর অন্যের জীবন অতিষ্ঠ করে দেয়।

তাহলে কি করতে পারি আমরা? আবেগকে আমাদের চিন্তার বাইরে রাখা চাই। তাই ডীন হক্সের কথা মত সব খবর নিরপেক্ষ ভাবে দেখতে হবে।

চিন্তিত থাকলে কাজটা আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে আমাদের আবেগ থাকে খুবই বেশি। আমি সব কিছু পরিষ্কার এবং নিখুঁত ভাবে দেখার কাজে দুটো ধারণা চমৎকার কাজ দেয় দেখেছি। যেমন—

১। কোন ব্যাপারে খবর সংগ্রহ করতে গেলে আমি এই ভাব করি যেন খবরটা আমার জন্য সংগ্রহ করছি না বরং পরের জন্যই। এর ফলে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিতে পারি। আর তাতে আবেগকে সরিয়ে রাখতে পারি।

২। যে সমস্যায় আমার দুশ্চিন্তা তার বিবরণ সংগ্রহের সময় এমন ভাবতে থাকি যে, আমি যেন একজন আইনবিদ আর তাই নিজের বিরুদ্ধে বিতর্ক করতে চাই। অন্যভাবে বললে সব ব্যাপারটাই যেন আমার বিরুদ্ধে ভাবতে চাই। যে সব ব্যাপার আমার ইচ্ছার ক্ষতি করতে চাইছে, সে সব ঘটনার আমি মুখোমুখি হতে চাইনা।

এরপর আমি দুপক্ষের কথাই কাগজে লিখে রাখি—আমার পক্ষের আর আমার বিপক্ষের। প্রায়ই দেখি এই দুটোর মাঝামাঝিই এর উত্তর থাকে।

আমি যা বলতে চাইছি তা হল এই—আপনি, আমি বা আইনস্টাইন বা সুপ্রীম কোর্টও তথ্য আহরণ না করে সমস্যা সমাধান করতে উদ্যোগী হয় না। টমাস এডিসনও তা জানতেন। তার মৃত্যুকালে তার নানা সমস্যায় আকীর্ণ প্রায় আড়াই হাজার নোট বই ছিল।

অতএব আমাদের সমস্যা সমাধানের প্রথম নীতি হলো : তথ্য সংগ্রহ করুন। তাই আসুন ডীন হক্স যা করেছেন তাই করা যাক—কোন ভাবেই তথ্য সংগ্রহ না

না করে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব না।

অবশ্য, দুনিয়ার সব তথ্য পেয়ে সেগুলো বিশ্লেষণ আর ব্যাখ্যা না করতে পারলে কোনই কাজে আসবে না।

আমি বেশ মূল্য দিয়ে অভিজ্ঞতালাভ করে দেখেছি তথ্যগুলো লিখে ফেললে বিশ্লেষণে সুবিধা হয়। অনেক সময় দেখা যায় কাগজে লিখে ফেললেই সমস্যার অনেকক্ষেত্রেই সমাধান হয়ে যায়। চার্লস্ কেটারিং যেমন বলেছেন: 'সমস্যা ভালো ভাবে ব্যক্ত করলেই অর্ধেক সমাধান হয়ে যায়।'

বাস্তবে কি ঘটে আপনাদের বলছি। চীনারা যেহেতু বলে একটা ছবি দশ হাজার শব্দের সমান। ধরুন আপনাদের একটা ছবি দেখিয়ে বলছি আমরা যা বলছি তা সে কিভাবে ছবিতে প্রস্ফুটিত করে।

গ্যালেন লিচফিল্ডের কথাই ধরা যাক। ভদ্রলোককে বহুবছর ধরে চিনি—প্রাচ্যদেশে সবচেয়ে সফল আমেরিকান ব্যবসায়ী তিনি। মিঃ লিচফিল্ড ১৯৪২ সালে চীনে ছিলেন, সে সময় জাপানীরা সাংহাই আক্রমণ করে। আমার বাড়ির অতিথি হয়ে উনি যা বলেন তা এই:

'জাপানীরা পার্ল হারবার আক্রমণ করার কিছু পরে, তারা সাংহাইতে তরতর করে ঢুকে পড়ে। আমি সাংহাইতে এশিয়া জীবন বীমা কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলাম। তারা ব্যবসা গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য একজনকে পাঠালো—লোকটা একজন অ্যাডমিরাল। এ ব্যাপারে আমার করণীয় কিছুই ছিলনা। আমি সহযোগিতা করতে পারলে ভালো, না হলে নিশ্চিত মৃত্যু।

'আমাকে যাই বলা হলো তাই করে গেলাম, কারণ অন্য পথ ছিলোনা। তবে কিছু দলিল ছিলো যার মূল্য সাড়ে সাতলক্ষ ডলার। অ্যাডমিরালকে সেটা না দিয়ে চেপে গেলাম। কারণ সেটা ছিলো আমাদের হংকং ব্যাঙ্কের হিসেব, সাংহাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন। তাহলেও ভয় হলো জাপানীরা টের পেলে ভয়ানক বিপদ হবে। তারা টের পেয়েও গেল।

'যখন ওরা জানতে পারলো আমি তখন অফিসে ছিলাম না। তখন আমার হেড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট ছিলেন। তিনি জানালেন জাপানী অ্যাডমিরাল ক্ষেপে আগুন, আমাকে তিনি চোর, বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি বলে গালাগাল দেন। আমি জাপানী সেনাদের আগ্রাহ্য করেছি—এর ফল কি হতে পারে তা আমার জানা ছিলো। আমাকে ব্রিজ হাউসে পাঠানো হবে।

'ব্রিজহাউস হলো জাপানী গুপ্ত পুলিশের অত্যাচার কক্ষ। আমার কিছু বন্ধু ওখানে পাঠানোর আগেই আত্মহত্যা করে। আমার অন্য বন্ধু প্রশ্ন আর অত্যাচারের দশদিন পর ওখানে মারা যায়। এবার আমাকেই পাঠানো হবে।

'আমি কি করলাম? আমি রবিবার বিকেলে খবরটা শুনি। ভয়ে আমার নীল হয়ে ওঠা উচিত ছিল। হতাম ও তাই, যদি না আমার সমস্যা সমাধানের নিজস্ব কায়দা থাকতো। বহু বছর ধরে সমস্যা এলেই টাইপ রাইটারে দুটো প্রশ্ন লিখে ফেলতাম:

১। কি নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি ?

আমার ভয় হচ্ছে আমাকে কাল সকালে ব্রিজহাউসে পাঠানো হবে।

২। এটা নিয়ে কি করতে পারি ?

অনেকক্ষণ ভেবে চারটি পথ গ্রহণ করার কথা ভাবলাম—আর তার সম্ভাব্য পথ।

১। আমি জাপানী অ্যাডমিরালকে বোঝানোর চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু তিনি ইংরাজী জানেন না। দোভাষীর সাহায্যে চেষ্টা করলে তিনি ক্ষেপে যেতে পারেন। লোকটি নিষ্ঠুর হলে এতে মৃত্যু ঘটতে পারে। তিনি আমাকে হয়তো ব্রিজহাউসেই পাঠাবেন।

২। আমি পালানোর চেষ্টা করতে পারি। সেটা অসম্ভব। তারা সবসময় আমার উপর নজর রাখছে। পালাতে গেলেই ধরা পড়ে গুলি করা হবে।

৩। আমার ঘরেই বসে থেকে অফিসে না যেতে পারি। এটা করলে ওই জাপ অ্যাডমিরালের সন্দেহ হবে আর ধরে এনে আমায় ব্রিজহাউসে পাঠানো হবে।

৪। সোমবার সকালে যথারীতি অফিস যেতে পারি। এটা করলে এ্যাডমিরাল এত ব্যস্ত থাকতে পারেন যে আমি কি করেছি তার মনে থাকবে না। মনে থাকলেও ঠাণ্ডা হওয়ায় হয়তো কিছু বলবেন না। এটা হলে আমার ভয় নেই। কিছু বললে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতে পারি। অতএব সোমবার সকালে যথারীতি অফিসে গেলে ব্রিজহাউসে যাওয়া থেকে বাঁচার দুটো সুযোগ আছে।

'যখনই ঠিক করলাম সোমবার অফিসে যাব, অনেকখানি দুশ্চিন্তাই আমার কেটে গেল।

পরদিন সকালে অফিসে ঢুকতেই জাপানী অ্যাডমিরালকে ঠোঁটে সিগারেট লাগিয়ে বসে থাকতে দেখলাম। তিনি বরাবরের মত চড়া চোখে তাকালেন, কিছু বললেন না। ছ'সপ্তাহ পরে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—তিনি টোকিও ফিরে গেলেন আর আমারও দুশ্চিন্তার অবসান হলো।

যা বলেছি, রবিবার বিকেলে বসে কি কি পথ নেওয়া উচিত লিখে ফেলার ফলেই সম্ভবতঃ আমার জীবন রক্ষা হয়। এটা যদি না করতাম হয়তো ইতস্ততঃ করতাম আর আচমকা ভুল কাজ করতাম—সারা রাত ঘুমোতে পারতাম না। পরদিন অফিসে কান্তভঙ্গীতে গেলেই লোকটার সন্দেহ জাগতো।

অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই কোন সিদ্ধান্তে পেঁছবার মূল্য কি আমি জানি। এটা যাঁরা পারেন না তাদেরই বিপদ হয়, তারাই স্নায়বিক বিকারে ভুগে জীবিত অবস্থায় নরকবাস করেন। আমি দেখেছি কোন সিদ্ধান্তে এলেই আমার শতকরা পঞ্চাশভাগ দুশ্চিন্তা কেটে যায়, আর বাকি চল্লিশভাগও দূর হয় সিদ্ধান্ত কাজে লাগালে।

অতএব আমি শতকরা নব্বই ভাগ দুশ্চিন্তাই নিচের চারটি উপায় কাজে লাগিয়ে দূর করতে পারি :

১। পরিস্কার লিখে ফেলা কিজন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

২। কি করতে পারি তা লিখে ফেলা।
৩। কি করবো ঠিক করে ফেলা।
৪। সিদ্ধান্তটি সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগানো।

গ্যালেন লিচফিল্ড বর্তমানে স্টার, পার্ক ও ফ্রিম্যান কোম্পানীর প্রাচ্যের ডিরেক্টর। তিনি এশিয়াতে একজন বিশিষ্ট আমেরিকান ব্যবসায়ী। তিনি আমার কাছে স্বীকার করেছেন তার সব সাফল্যের মূল হল দুশ্চিন্তা বিশ্লেষণ করে সোজাসুজি তার মুখোমুখি হওয়া।

এই পদ্ধতি এত কাজের কেন? কারণ এটি চমৎকার আর সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে। এর উপর এটি সেই চরম আর তৃতীয় নিয়ম কাজে লাগায়: কিছু একটা করুন। কিছু না করার অর্থ তথ্য সংগ্রহের সব পরিশ্রমই যে ব্যর্থ হয়।

উইলিয়াম জেমস বলেছিলেন: কোন সিদ্ধান্তে পেঁছিলে তাকে কাজে লাগানোর পর এর ফলের জন্য সব দায়িত্ব আর চিন্তা ত্যাগ করবেন (চিন্তা কথাটি তিনি 'দুশ্চিন্তা' অর্থেই ব্যবহার করেন।) তার কথা হলো—তথ্যে নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্তে এলে কাজে নেমে পড়ুন। কখনই পুনর্বিবেচনা করবেন না, ইতস্ততঃ করবেন না। আত্ম-সন্দেহে দোদুল্যমান হবেন না তাতে অন্য সন্দেহ জাগে। পিছনে তাকাবেন না।

তাহলে গ্যালেন লিচফিল্ডের কৌশল, দুশ্চিন্তা দূর করতে কাজে লাগান না কেন? এবার প্রশ্ন গুলো দেখে নিন—পেন্সিল দিয়ে নিচের ফাঁকে তা লিখে ফেলুন:

১নং প্রশ্ন : কি জন্য দুশ্চিন্তা করছি?

২নং প্রশ্ন : এ ব্যপারে আমি কি করতে পারি?

৩নং প্রশ্ন ঃ আমি এব্যাপারে যা করতে যাচ্ছি তা এই।

৪নং প্রশ্ন ঃ কাজটা কখন শুরু করব ?

। পাঁচ ।

ব্যবসায়ে অর্ধেক দুশ্চিন্তা এড়ানোর উপায়

আপনি যদি ব্যবসায়ী হন তাহলে হয়তো বলবেন, 'এই পরিচ্ছেদের নামটা হাস্যকর। আমি উনিশ বছর ব্যবসা চালাচ্ছি, আর এর উত্তর আমি ভালোই জানি। কেউ আমায় অর্ধেক দুশ্চিন্তা দূর করার পথ বাতলে দেবে ভাবাই অসম্ভব!'

কথাটায় যুক্তি আছে—কবছর আগে এই রকম একটা অধ্যায় দেখলে আমিও তাই ভাবতাম। এতে প্রচুর বড় বড় কথা আছে—বড় বড় কথা মানেই সস্তা ব্যাপার, কাজের কিছুই হয়না।

খোলাখুলিই বলি তাহলে: হয়তো আমি আপনার ব্যবসার পঞ্চাশভাগ দুশ্চিন্তা দূর করতে সাহায্য করতে পারব না। শেষ পর্যন্ত নিজে ছাড়া আর কেউ তা পারে না। কিন্তু আমি যা করতে পারি তা হলো অন্য মানুষেরা যা করেছে তা আপনাদের দেখাতে পারি—বাকিটা আপনার করণীয়।

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে আগে পৃথিবী বিখ্যাত ডাক্তার অ্যালেক্সি ক্যারেলের একটা কথা বলেছি যা হলো: 'যে ব্যবসায়ীরা দুশ্চিন্তা কিভাবে জয় করতে হয় জানেন না, তারা অল্পবয়সে মারা যান।'

দুশ্চিন্তা যেহেতু এতোটাই মারাত্মক, তাই অন্ততঃ শতকরা দশভাগ যদি তা দূর করার পথ বাতলাতে পারি তাহলে কি খুশি হবেন না?···হ্যাঁ, হবেন?···চমৎকার! বেশ, এবার এক ব্যবসায় কর্তাব্যক্তির কথা বলছি যিনি তার দুশ্চিন্তা পঞ্চাশভাগ কমান নি। বরং দুশ্চিন্তা দূর করতে যে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ সভায় কাটাতেন তা কমিয়ে ছিলেন।

আমি 'অমুক' বা 'অমুকের' কথা বলতে চাইনা। যাদের নাম যাচাই করা যায় না। আমি সত্যিকার একজনের বিষয় বলছি—তার নাম লিও সিমকিন। বহুদিন যাবৎ তিনি ছিলেন সাইমন অ্যাণ্ড সুষ্টার কোম্পানী নামে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক আর এখন হলেন নিউ ইয়র্কে পকেট বুকের প্রেসিডেন্ট।

তার অভিজ্ঞতার বিষয় তারই কথায় শুনুন:

'পনেরো বছর ধরে আমি প্রতিদিনের অর্ধেক সময় কাটাতাম ব্যবসা সংক্রান্ত সভায়, আলোচনা হত সমস্যা নিয়ে। কোনটা করা উচিত নয় কোনটা উচিত ইত্যাদি নিয়ে; না কি কিছুই করব না? আমরা উত্তেজিত হতাম, চেয়ারে ছটফট করতাম, মেঝেতে পাক খেতাম। রাত নেমে এলে সাংঘাতিক ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। ভেবেছিলাম এধরনের কিছুই হয়তো সারা জীবনই এমন করে কাটবে। পনেরো বছর ধরে এটা করে চলেছিলাম, আমার ধারনাই ছিলোনা এর চেয়ে কোন ভালো পথ আছে। কেউ যদি আমায় বলতো আমি আমার উদ্বেগের চারভাগের তিনভাগ দূর করতে পারি, তার পথও আছে,

তাহলে মনে করতাম অতি আশাবাদী কথাবার্তাই সে বলছে। তা সত্ত্বেও এমন উপায় বের করলাম তাতে ওই কাজই হলো। কৌশলটা আট বছর কাজে লাগাচ্ছি আর তা আমার দক্ষতা, স্বাস্থ্য এবং সুখের ব্যাপারে অলৌকিক কান্ড ঘটিয়েছে।

এটাকে যাদুবিদ্যা বলে মনে হচ্ছে—সব যাদুর খেলার মতই কৌশলটা জানলে দেখবেন কেমন সহজ।

গোপন কথাটা হলো এই : 'প্রথমেই গত পনেরো বছর যে সব সভা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কাজ করছিলাম তা বাতিল করলাম—সভায় গিয়ে বিব্রত সহকর্মীদের জিজ্ঞেস করা কি ভুল হয়েছে। এবার কি কর্তব্য?' দ্বিতীয়তঃ, একটা নতুন নিয়ম করলাম—যে কেউ আমার কাছে কোন সমস্যা হাজির করতে চাইবে তাকে প্রথমেই নিচের চারটি প্রশ্নের জবাব তৈরি করে দিতে হবে :

প্রথম প্রশ্ন : সমস্যাটি কি ?

(আগে আসল সমস্যাটি কি জানার চেষ্টাতেই **কয়েক** ঘন্টা সময় কেটে যেত। আমরা আমাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতাম কিন্তু আসল সমস্যা কি দেখার কোন চেষ্টাই করতাম না।)

দ্বিতীয় প্রশ্ন : সমস্যার কারণ কি ?

(পুরনো দিনের কথা ভাবলে আমার আতঙ্ক হয়, কিভাবে কত সময় নষ্ট করেছি সমস্যার গোড়ার কারণ খুঁজে পেতে না চেয়ে।)

তৃতীয় প্রশ্ন : সমস্যাটি সমাধানের সম্ভাব্য পথ কি ?

(আগে সভায় একজন হয়তো কোন সূত্র দিয়েছে, অন্যজন তাতে আপত্তি করলে সভা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কেউই কিন্তু তাদের সম্ভাব্য সমাধান লিখে ফেলার চেষ্টা করেনি।)

চতুর্থ প্রশ্ন : আপনি কিভাবে সমাধান করতে চান ?

(আমি সভায় যেতাম তারই সঙ্গে যিনি কোন সমস্যার সমাধান সম্পর্কে প্রচুর ভেবেছেন। কিন্তু একবারের জনাও সেই সমাধান লিখে ফেলেন নি।

'আমার সহযোগীরা ক্বচিৎ সমস্যা নিয়ে আসেন। কেন ? কারণ তারা জানেন ওই চারটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ভাবতে হয়েছে এটা করার পর তারা দেখেছেন চারভাগের তিনভাগ ব্যাপারেই তাদের আর আমার কাছে আসার দরকার নেই। বৈদ্যুতিক টেস্টার থেকে যেমন টেস্ট বেরিয়ে আসে তাদের সমাধান তেমনি সহজ হয়। সমাধানে পৌছতে আগের চেয়ে এক তৃতীয়াংশ সময় লাগে কারণ চিন্তাধারা একটা সুশৃঙ্খল, যুক্তিগ্রাহ্য পথ ধরে চলে।

'পকেট বুক প্রকাশভবনে এখন দুশ্চিন্তা আর বিতর্ক অনেকটাই কম। এখন ভুলগুলো সংশোধন করতে অনেক সময় পাওয়া যাচ্ছে।'

আমার বন্ধু ফ্রাংক বেটগার, যিনি আমেরিকার বীমার ব্যবসায়ে উচ্চ স্থানাধিকারী আমায় বলেছেন একই পদ্ধতিতে তিনি দুশ্চিন্তা অনেকটাই কমিয়ে আনেন আর আয়ও করেন দ্বিগুণ।

তাঁর বক্তব্য ছিলো, 'বহুবছর আগে যখন প্রথম বীমা করানোর কাজ নিই, তখন কাজে
র উৎসাহ আর আনন্দ পেতাম। তারপরেই কি যেন ঘটলো। আমার এমনই
শা এলো যে কাজকে ঘৃণা করতে সুরু করে ছেড়ে দেব ভাবলাম। হয়তো ছেড়েই
াম যদিনা এক শনিবার সকালে আমার দুশ্চিন্তার মূলে পেঁাছতে চাইতাম।

১। প্রথমেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম: 'সমস্যাটা ঠিক কি?' সমস্যা ছিলো
মি প্রচুর ঘুরেও আশানুযায়ী আয় হচ্ছিলো না। কোন লোককে বীমা করানোর
গ পর্যন্ত ভালোই চলতো, কিন্তু কাজ শেষ হতোনা। মক্কেল হয়তো বলতো,
নয়ে ভেবে দেখবো মিঃ বেটগার। পরে দেখা করবেন।' আমার হতাশার কারণ
া এই পরের ঘোরাঘুরির কাজ।

২। নিজেকে প্রশ্ন করলাম: 'এর সম্ভাব্য সমাধান কি?' তবে এর উত্তরের
া আমায় তথ্যগুলো দেখতে হবে, তাই গত বারো মাসের হিসেব দেখলাম।

আমি এক আশ্চর্য আবিষ্কার করলাম। দেখলাম পরিষ্কার কালি দিয়ে লেখা
করা সত্তর ভাগ বিক্রির কাজ প্রথম সাক্ষাতেই হয়ে গেছে! তেইশভাগ হয়েছে
ীয় সাক্ষাতে। আর মাত্র সাতভাগ তৃতীয়, চতুর্থ পঞ্চম ইত্যাদি সাক্ষাতে হয়েছে।
ই আমার প্রচুর সময় নষ্ট হচ্ছিল, আমি মাত্র শতকরা সাতভাগের জন্য আমার
র্ক সময় নষ্ট করছিলাম!

৩। এর জন্য কি করা দরকার? উত্তর একটাই। আমি দ্বিতীয় বারের পর
াতকার বন্ধ করে দিলাম, বাকি সময় নতুন কাজে লাগালাম। এর ফল
া অবিশ্বাস্য। অল্প সময়েই আমি প্রতি সাক্ষাতের মূল্য প্রায় দ্বিগুণ করে
লাম!

আগেই বলেছি ভদ্রলোক বীমা ব্যবসার নামী ব্যক্তি, তিনি বছরে প্রায় দশ লক্ষ
ারের মত কাজ করেন। তিনি প্রায় কাজ ছাড়তে বসেছিলেন কিন্তু নিজেকে বিশ্লেষণ
র সাফল্যের পথেই এগোলেন।

আপনিও কি আপনার ব্যবসার সমস্যা সমাধানে এই প্রশ্নগুলো কাজে লাগতে
রন? সেই বাজি রাখার কথাই বলছি আবার—এগুলো আপনার দুশ্চিন্তা পঞ্চাশ
গ কমিয়ে দিতে পারে। প্রশ্নগুলো আর একবার শুনুন:

১। সমস্যাটা কি?

২। সমস্যার কারণ কি?

৩। সমস্যাটি সমাধানের সম্ভাব্য উপায় কি কি?

৪। কোন্ সমাধান আপনার পছন্দ?

এ বই থেকে সেরা উপকার পেতে হলে, ন'টি পরামর্শ মেনে চলুন:

১। এ বই থেকে বেশি উপকার পেতে হলে একটা প্রয়োজনীয় জিনিসই আছে—
। যদি আপনার না থাকে তাহলে হাজার হাজার নিয়ম পড়েও কিছুই লাভ হবে
। সেই জিনিসটা কি? ঠিক এই জিনিসটাই: কিছুই না—শুধু শেখার
ম্য বাসনা এবং দুশ্চিন্তা এড়ানোর আর বেঁচে থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

এধরণের আকাঙ্ক্ষার জন্ম কেমন করে দেওয়া যাবে? বারবার নিজেকে জান এর প্রয়োজন কতখানি। নিজের কাছে সর্বদা একটা চিত্র হাজির করতে হবে যে করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার ফলে আরও সুন্দর ও সুখী জীবন কাটানো যায়। নিজে বারবার বলতে হবে: 'আমার মানসিক শান্তি, আমার সুখ, স্বাস্থ্য এবং সম্ভ আমার আয়, এই বইয়ের পুরনো আর সহজ চিরসত্যের শিক্ষার উপর নির্ভরশীল।'

২। প্রথমেই প্রতিটি পরিচ্ছেদে একবার চোখ বুলিয়ে নিন। পরের পরি তাড়াতাড়ি পড়ার ইচ্ছে জাগতেও পারে। একমাত্র আনন্দ পাওয়ার জন্য না পড় সেটা করবেন না। কিন্তু যদি দুশ্চিন্তা দূরে করে সুখী জীবন যাপনে অভিলা তাহলে গোড়া থেকে প্রতিটি পরিচ্ছেদ মন দিয়ে পড়ুন। শেষ পর্যন্ত তাতে সম সাশ্রয় আর ভালো ফল লাভ হবে।

৩। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে পড়ার বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকুন। নিজেকে প্রশ্ন ক জেনে নিন প্রতিটি পরামর্শ কিভাবে কাজে লাগাতে পারেন। খরগোশের পিছ কুকুরের দ্রুতধাবণের মত পড়া উচিত নয়, এতে ভাল ফল পাওয়ার সম্ভবনা খুব ক

৪। হাতে লালকালির কলম বা পেন্সিল রাখবেন, যখনই দেখবেন কোন পদ্ধতি আপনি কাজে লাগাতে পারেন, তার নিচে দাগ দিন। কোন উপদেশ খুব ভা লাগলে চারটে তারকা চিহ্ন দিন। দাগ দিয়ে পড়লে পড়ার আগ্রহ ঢের বেড়ে যায়।

৫। একজনকে জানতাম যিনি পনেরো বছর বিরাট এক বীমা প্রতিষ্ঠা ম্যানেজার ছিলেন। তিনি তার অফিসে যত বীমা করা হয় তার শর্তগুলো বার পড়তে চাইতেন। কেন? কেননা এতে সব শর্ত মনে রাখা সহজ হয়।

আমি সভায় বক্তৃতা করার বিষয়ে একটা বই লেখার সময় দুবছর খেটেছিলাম, তা দেখেছিলাম, বারবার আমায় আগের পাতাগুলো পড়তে হয়েছে যাতে নিজের বইতে লিখেছি মনে থাকে। আমরা যে কত দ্রুত ভুলে যাই ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়।

অতএব, এবই থেকে যদি চিরস্থায়ী কোন উপকার পেতে চান তাহলে ভাববেন একবার পড়লেই যথেষ্ট। ভালো করে পড়ে ফেলার পর আপনাকে প্রতিমাসে কয়েক ঘ ঝালিয়ে নেওয়া দরকার, তাই এটা ডেস্কের সামনে রেখে দেবেন। সব সময় ভাব আপনি ভালো করতে পারবেন। মনে রাখবেন ক্রমাগত পড়ে এটা কাজে লাগানো মধ্য দিয়েই উন্নতি করা সম্ভব। আর কোন উপায় নেই।

৬। বার্নার্ডশ একবার মন্তব্য করেন: 'কোন লোককে কিছু শেখাতে চাইলে কখনই শিখবে না। শ ঠিকই বলেছিলেন। শিক্ষা হলো একটা সজীব পদ্ধতি আমরা কাজ করার মধ্য দিয়েই শিখি। অতএব এ বই পড়ে নীতিগুলি যদি আ করতে চান তাহলে কিছু করতে হবে। সুযোগ পেলেই নীতিগুলো কাজে লাগান তা না করলে অচিরেই ভুলে যাবেন। যে জ্ঞান কাজে লাগানো যায় তাই মনে গেঁ যায়।

আপনি হয়তো এই সব নীতি একেবারে কাজে লাগাতে অসুবিধা বোধ কর পারেন। ব্যাপারটা আমি ভালোই জানি যেহেতু বইটা আমারই লেখা। আ

রক্তেও তাই অসুবিধা বোধ করি। তাই বইটা যখনই পড়বেন তখনই মনে রাখবেন শুধু খবর সংগ্রহ করার জন্যই বইটা পড়ছেন না। আপনি নতুন অভ্যাস গড়ে তুলতে চাইছেন। হ্যাঁ, আপনি নতুন জীবন যাপনের উপায় খুঁজছেন। এজন্য দরকার কার্য আর প্রাত্যহিক কাজে ব্যবহার।

স্নুতরাং পাতাগুলোয় মাঝে মাঝেই চোখ বোলান। বইটিকে দুশ্চিন্তা জয় করার কাজে লাগানোর বই ভাবুন—আর কোন উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে চঞ্চল হবেন না। তার বদলে বইটার পাতা উল্টে অধ্যায়গুলো পড়ুন। এটা করলে দেখবেন ইন্দ্রজালের মতই কাজ হবে।

৭। আপনার স্ত্রীকে কিছু টাকা দিন যাতে তিনি বইটির নিয়মের বাইরে কোন কাজ করলে আপনাকে যেন ধরে ফেলেন। দেখবেন তিনি এটা করলে আপনার উচিত শাস্তি হবে।

৮। এ বইয়ে যেখানে ওয়ালস্ট্রীটের ব্যাঙ্কার এইচ. পি. হাওয়েল আর বুড়ো ফ্র্যাঙ্কলিনের কথা আছে সে জায়গাটা পড়ে দেখুন তারা কিভাবে ভ্রম সংশোধন করেছিলেন। আপনিও তাদের মত ব্যাপারটা কাজে লাগান না কেন? এটা করলে দুটো ব্যাপার দেখতে পাবেন:

প্রথমতঃ দেখবেন এইভাবে শেখার সময় খুব চিন্তায় কাটবে আর অমূল্য বলেই মনে হবে।

দ্বিতীয়তঃ আপনি দেখবেন দুশ্চিন্তা কাটিয়ে জীবন যাপনের ক্ষমতা আপনার অদ্ভুত গতিতেই বেড়ে উঠেছে।

৯। একটা ডায়েরী রাখুন—সেই ডায়েরীতে আপনার সমস্ত সাফল্যের বিবরণ লিখে রাখবেন। পরিষ্কার ভাবে লিখবেন। নাম, তারিখ আর ফলাফল লিপিবদ্ধ করবেন। এভাবে লিখে রাখলে আপনি আরও বেশি সফল হওয়ার প্রেরণা পাবেন। দু বছর পরে যখন ডায়েরীটা দেখবেন কি ভালোই না তখন লাগবে।

॥ ছয় ॥

দুশ্চিন্তা দূর করার উপায়

একটা রাতের কথা আমি ভুলবো না, কবছর আগে ম্যারিয়ন জে. ডগলাস আমার ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। (নামটা তিনি প্রকাশ করতে বারণ করেছিলেন ছদ্মনাম দিচ্ছি)। গল্পটা কিন্তু সত্যি। আমার বয়স্ক শিক্ষার ক্লাসে তিনি বলেন। তিনি জানান বারবার দুবার তার বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে অ প্রথমে তিনি তার পাঁচ বছরের মেয়েকে হারান। এই মেয়েটিকে তিনি প্রাণের ব ভালবাসতেন। তিনি আর তাঁর স্ত্রী ভেবেছিলেন এ শোক তারা সহ্য করতে পা না। দশমাস পরে ভগবান তাদের আর একটি কন্যাসন্তান উপহার দিলেন। সেও পাঁচদিনের মাথায় মারা যায়।

'এই দুটো পরপর শোক আমাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো,' ভদ্রলোক আ বলেছিলেন। 'কিছুতেই তা সহ্য করতে পারিনি। ঘুমোতে, বিশ্রাম নিতে বা পারছিলাম না। আমার সমস্ত স্নায়ু অবশ হয়ে যায়, সব আত্মবিশ্বাস নষ্ট যায়।' শেষ পর্যন্ত তিনি ডাক্তারের কাছে গেলে একজন ডাক্তার ঘুমের ঔষধ বলেন অন্যজন কোথাও ঘুরে আসতে বলেন। দুটোই তিনি করলেন কিন্তু কোন লাভ হলোনা। তিনি বলেছিলেন, 'মনে হতে লাগলো আমার শরীর কেউ দিয়ে চেপে ধরেছে—শোকের অসহায়তা যারা টের পেয়েছেন তারাই শুধু বুঝবেন।'

'তবুও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ একটি সন্তান আমাদের ছিলো—চারবছরের একটা সেই আমার সমস্যার সমাধান করে দিলো। এক সন্ধ্যায় শোকাহত হয়ে বসেছিলাম সে বললো: 'বাবা, আমায় একটা নৌকা বানিয়ে দেবে?' বানাবার মত মনের অবস্থা আমার ছিলোনা—আসলে কিছু করার মতই আমার ছিলোনা। কিন্তু ছেলে ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকায় মত দিতেই হলো।

'নৌকো তৈরি করতে আমার তিনঘণ্টা লেগে গেল। যখন কাজ শেষ ব টের পেলাম ওই তিনঘণ্টাই আমি দুশ্চিন্তা ত্যাগ করে প্রথম মানসিক প্রশ কাটিয়েছি!

'ওই আবিষ্কারের ফলেই অবসাদ কাটিয়ে আমি কয়েক মাসের মধ্যে প্রথম করতে পারলাম। বুঝলাম কাজে ব্যস্ত থাকলে দুশ্চিন্তা করার আর কোন বা অবকাশ থাকেনা। আমার ক্ষেত্রে ওই নৌকো বানানোই আমায় রক্ষা ক তাই ঠিক করলাম কাজে ব্যস্ত থাকবো।'

'পরদিন সব ঘর ঘরে কি কি কাজ করতে হবে স্থির করলাম। বহু কাজ বাকি ছিল—বইয়ের আলমারী, সিঁড়ির ধাপ, জানালা, দরজার হাতল, তালা,

নানা জিনিস। আশ্চর্য লাগলেও দু'সপ্তাহের মধ্যে ২৪২টা জিনিসের তালিকা তৈরী করে ফেললাম।

'গত দু'বছরে প্রায় সবই শেষ করেছি। আমার জীবন নানা উত্তেজনায় নিয়োজিত রেখেছি। প্রতি সপ্তাহে নিউ ইয়র্কে বয়স্ক শিক্ষা ক্লাসে যোগ দিই। নানা সামাজিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছি, আমি এখন স্কুলবোর্ডের চেয়ারম্যান। রেড ক্রশের জন্য আমি টাকাও তুলি, তাই দুশ্চিন্তার সময় নেই।' ঠিক এই কথাই উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন যুদ্ধের বিবর্ণবিধ্বস্ত দিনগুলোয় যখন তিনি দৈনিক আঠারো ঘন্টারও বেশি কাজ করতেন। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে প্রচন্ড দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁর দুশ্চিন্তা হয় কিনা, তিনি জবাব দেন ; 'আমি দারুণ ব্যস্ত। দুশ্চিন্তা করার মত সময় নেই।'

মোটর গাড়ির সেলফ্ স্টার্টার আবিষ্কারের সময় চার্লস্ কেটারিংয়েরও এই বিপদ আসে। অবসর নেওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি বিখ্যাত জেনারেল মোটরস্-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তবুও তিনি তখন এতই গরীব ছিলেন যে প্রথমে খড় রাখা বাড়িতেই তাকে গবেষণাগার বসাতে হয়। মুদির দোকানের দেনা মেটাতে তাকে তাঁর স্ত্রীর পিয়ানো শিখিয়ে আয় করা পনেরো শ' ডলার ব্যয় করতে হয়, তাছাড়া বীমা কোম্পানী থেকেও পাঁচশ ডলার ধার করতে হয়। আমি তার স্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলাম তার দুশ্চিন্তা হয় কি না। তিনি উত্তর দেন, 'হ্যাঁ, এতোই দুশ্চিন্তা হয় যে ঘুমোতে পারিনি! তবে আমার স্বামীর কোন দুশ্চিন্তাই ছিলোনা। নিজের কাজে ব্যস্ত থাকায় তার দুশ্চিন্তার সময় ছিলোনা।'

বিখ্যাত বিজ্ঞানী পাস্তুর বলেন 'গবেষণাগার আর পাঠাগারেই শান্তি থাকে'। এরকম শান্তি সেখানে কেন থাকে ? কারণ মানুষ সেখানে নিজের কাজে এমনই ব্যস্ত থাকে যে দুশ্চিন্তার সময় থাকেনা। গবেষণাকারীদের কচিৎ স্নায়বিক অবসাদ ঘটে, কারণ এ বিলাসিতার তাদের সময় থাকে না।

ব্যস্ত থাকার মত সহজ ব্যাপারে দুশ্চিন্তা দূর হয় কেন ? এর কারণ মনস্তত্বের একটা সরল নিয়ম। সেটা হলো : কোন মানুষ তিনি যতই বুদ্ধিমান হোন কিছুতেই একই সময়ে একাধিক বিষয়ে ভাবতে পারেন না। বিশ্বাস করতে পারছেন না ? তাহলে আসুন একটা পরীক্ষা করা যাক।

আপনি চেয়ারে হেলান দিয়ে ভাবুন তো স্ট্যাচু অব লিবার্টির কথা আর তার সঙ্গে কাল সকালে কি কি করবেন।

আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে একটার পর একটা ভাবতে পারছেন কিন্তু কিছুতেই একসঙ্গে নয়। আবেগের ক্ষেত্রেও তাই। কোন উৎসাহের কাজে জড়িত থেকে একই সঙ্গে উদ্বেগে আমরা কাহিল হইনা। একটা আবেগ অন্যটাকে দূর করে দেয়। আর এই সহজ ব্যাপার আবিষ্কারের ফলেই সামরিক মনস্তত্ত্ববিদেরা যুদ্ধে অলৌকিক ঘটনা করতে পারে।

যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে সৈন্যরা বাড়ি ফিরলে তাদের প্রায়ই তাদের 'সাইকো

নিউরোটিক' নামক এক প্রকার রোগ হত। তাদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তাররা ব্যস্ত রাখতে বলতেন। এইসব লোকদের যা অবস্থা, প্রতিটি মুহূর্ত কাজে ব্যস্ত রাখা হত—বিশেষ করে মাছধরা, শিকার, বল খেলা, গলফ খেলা, ছবি তোলা, বাগান তৈরি, নাচ ইত্যাদিতে। তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভাবতেই সময় দেওয়া হতোনা।

কাজকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করার মনস্তাত্ত্বিক নাম হলো 'অকুপেশনাল থেরাপি' (ব্যস্তরাখার ওষুধ)। এটা নতুন নয়। প্রাচীন গ্রীক ডাক্তাররা খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচশ বছর আগেও এই বিধান দিতেন।

বেন ফ্রাঙ্কলিনের সময়েও কোয়েকার সমিতি এটা ফিলাডেলফিয়ায় ব্যবহার করতেন। কোয়েকার স্যানাটোরিয়ামে ১৭৭৪ সালে একজন গিয়ে অবাক হয়ে দেখেন মানসিক রোগীরা শনের তন্তু বুনছে। তিনি ভেবেছিলেন লোকগুলোকে বেআইনীভাবে শোষণ করা হচ্ছে। পরে কোয়েকার সমিতি তাকে বুঝিয়ে দেন আসলে কাজে ব্যস্ত থাকায় রোগীদের মানসিক উন্নতি হয়। এতে স্নায়ু শান্ত থাকে।

যেকোন মনস্তাত্ত্বিকই বলবেন কাজে ব্যস্ত থাকাই স্নায়ুর পক্ষে সেরা দাওয়াই। হেনরি ডব্লিউ লঙফেলো সেটা বুঝেছিলেন তিনি যখন তার তরুণী বধূকে হারান। আগুনে পুড়ে তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। কিছুদিন পর্যন্ত লঙফেলো এমন শোকে কাটালেন যে প্রায় পাগল হওয়ার মতই হন। তবুও তার তিনটি ছোট ছেলেমেয়েকে দেখতে হতো—একেবারে তাদের বাবামার মতই তাকে হতে হয়। তিনি তাদের বেড়াতে নিয়ে যান, গল্প শোনান, খেলা করেন। 'ছেলেদের ঘণ্টা' নামের বইতে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গের মুহূর্তগুলো অমর করে গেছেন। তিনি দান্তের অনুবাদও করেন। ওইসব করতে গিয়ে তিনি এতই ব্যস্ত থাকতেন যে নিজেকে একেবারে ভুলে মানসিক শান্তি ফিরে পান। টেনিসন লিখেছিলেন তার প্রিয় বন্ধু আর্থার হ্যালামকে হারিয়ে বলেছিলেন, 'আমায় কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে, না হলে আমি হতাশায় পাগল হয়ে যাব।'

আমাদের অনেককেই নিজেদের কাজের মধ্যে হারিয়ে ফেলতে বেগ পেতে হয় না। কিন্তু কাজের পরবর্তী সময়টাই হল মারাত্মক। কাজের পর যখন আমাদের অবসর কাটানোর কথা তখনই দুশ্চিন্তার কালো মেঘ আমাদের ঘিরে ধরে। তখনই মনে হয় যেন জীবনে কিছু হলোনা।

আমরা যখন ব্যস্ত থাকিনা আমাদের মন তখন শূন্য হয়ে যায়। পদার্থবিদ্যার প্রতিটি ছাত্রই জানে প্রকৃতি শূণ্যতাকে ঘৃণা করে। জ্বলন্ত বাল্বের মধ্যে যে শূন্যতা বাল্বটা ভাঙলেই সেটা থাকে না—প্রকৃতি তখন সেখানে বাতাস পূর্ণ করে দেয়।

প্রকৃতি শূন্যমন ভরাট করতে চায়। কিন্তু কি দিয়ে? স্বভাবতই আবেগ দিয়ে। কেন? কারণ আবেগ হলো—দুশ্চিন্তা, ভয়, ঘৃণা, ঈর্ষা এইসব থেকেই আসা—এগুলোর জঙ্গলের শক্তি থাকে। এই সব আবেগের এতই ক্ষমতা যে শান্তি আর সুখের চিন্তাকে ঘরছাড়া করে দেয়।

কলম্বিয়ার শিক্ষাবিভাগের অধ্যাপক জেমস্ এল মুর্শেল চমৎকারভাবে বলেছেন : 'দুশ্চিন্তা আপনার কাজে থাকার সময় ভর করেনা বরং দিনের কাজের শেষেই করে। সেসময় আপনার কল্পনাগুলো উদ্ভট হতে চায়—সমস্ত রকম অসম্ভব কথা মনে হতে চায়, ছোটখাটো ভুলকে বিরাট মনে হয়। এই সময় আপনার মনটা মোটর চালিত হয়ে চলে, কোন রকম বোঝা তখন এই মোটর টানে না। মোটর এত জোরে চলে যেন মনে হয় মনকে পুড়িয়ে, ভেঙে নিঃশেষ করে দেবে। দুশ্চিন্তা তাড়ানোর একমাত্র পন্থা হলো তাই গঠনমূলক কিছু করা।'

এটা বুঝতে হলে আর বাস্তবে কাজে লাগাতে আপনাকে কলেজের অধ্যাপক হতে হবে না। যুদ্ধের সময় একজন শিকাগোর গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তিনি আমায় বলেন তিনি দেখেছেন দুশ্চিন্তা তাড়াবার একমাত্র উপায় হলো গঠনমূলক কোন কাজে ব্যাপৃত থাকা।'

ভদ্রমহিলা আর তার স্বামীর সঙ্গে আমার আলাপ হওয়ার পর তিনি আমায় বলেন যে তাদের ছেলে পার্ল হারবার আক্রমণের পরদিন যুদ্ধে যোগ দেয়। ক্রমাগত তার ছেলের কথা মনে হত। সে কোথায় আছে? সে নিরাপদ তো? নাকি যুদ্ধ করছে? সে কি আহত হবে? মারা যাবে না তো?

আমি যখন তার কাছে কিভাবে দুশ্চিন্তা দূর করলেন জানতে চাই তিনি জবাব দিয়েছিলেন : 'আমি কাজে ব্যস্ত থাকতে চাইলাম।' প্রথমে তাদের ঝিকে ছাড়িয়ে দিয়ে তিনি নিজেই সব ঘরের কাজ করতে লাগলেন, কিন্তু তাতে খুব সুবিধে হলোনা। তিনি বলেছিলেন : মুশকিল হল ঘরের কাজ যান্ত্রিক ভাবেই করা যেত, মনের ব্যবহার দরকার হতোনা। তাই ঘরের কাজ করতে গিয়ে বুঝলাম আমার অন্য কিছু কাজ চাই যাতে সারাদিন শারীরিক আর মানসিকভাবে ব্যস্ত থাকি। তাই একটা বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে কাজ নিলাম।

'তাতে কাজ হলো। অচিরেই দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়লাম দলে দলে ক্রেতারা আসায় তাদের চাহিদা মেটাতে হল। কেবলমাত্র তখনকার কাজ ছাড়া আর কিছুই মনে রইল না। রাত্রি এলে পায়ের ব্যথা ছাড়া আর কিছুই মনে থাকতো না। খাওয়ার পরেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। দুশ্চিন্তা করার মত আর শক্তি বা সময় আমার থাকেনি।'

জন কাউপার পাউইস তার 'অপ্রীতিকর চিন্তা তাড়ানোর উপায়' বইয়ে যা বলেছেন মহিলাটি তাই আবিষ্কার করেন। সেটা এই : কিছু নিশ্চিন্ত নিশ্চয়তা, কিছুটা প্রগাঢ় মানসিক শান্তি কিছুটা সুখকর বোধশক্তি হীনতা—এইসব মানুষ নামক প্রাণীকে তার কাজে আনন্দ জোগায়।'

আর এটায় কত আশীর্বাদই না থাকে! পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত মহিলা অভিযানকারী ওসা জনসন সম্প্রতি আমায় বলেছেন কি ভাবে তিনি দুশ্চিন্তা আর দুঃখ ভুলেছিলেন। তার জীবনী 'আমার সঙ্গী-অ্যাডভেঞ্চার' বইটি আপনি পড়ে থাকতে পারেন। কোন মহিলা অ্যাডভেঞ্চারকে যদি সঙ্গী করে থাকেন তিনিই সেই

মহিলা। তাকে ষোল বছর বয়সে বিয়ে করেন মার্টিন জনসন আর প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যান কানসাসের ক্যানিউট শহর থেকে বোর্নিওর জঙ্গলে। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে এই দম্পতি সারা দুনিয়ার সর্বত্র ঘোরেন এবং এশিয়া ও আফ্রিকার বিলীয়মান প্রাণীদের ছবি তোলেন। ন'বছর আগে আমেরিকায় ফিরে তারা বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন আর সেইসঙ্গে তাদের বিখ্যাত চলচ্চিত্রগুলো দেখাচ্ছিলেন। এরপর ডেনভার থেকে প্লেনে উপকূলের দিকে যাচ্ছিলেন। প্লেনটা এক পাহাড়ে ধাক্কা খায়। মার্টিন জনসন সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান। ডাক্তাররা বলেছিলেন ওসা আর কোনদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবেন না। তিন মাস পরে তিনি হুইল চেয়ারে বসলেন কারণ তারা ওসা জনসনকে চিনতেন না। ওই ভাবেই তিনি বক্তৃতা দিয়ে চললেন। আসলে একবছর তিনি প্রায় একলা সভায় বক্তৃতা দিলেন। আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম তিনি ওই কাজ কেন করলেন। তাতে তিনি জবাব দেন : 'এটা করি যাতে শোক আর দুশ্চিন্তার কোন অবকাশ আমার না থাকে।'

ওসা জনসন টেনিসনের মতই সেই একশ বছর আগের সত্য আবিষ্কার করেছিলেন : 'আমায় কাজে জড়িয়ে থাকতে হবে না হলে আমি হতাশার পাগল হয়ে যাবো।'

একই সত্য আবিষ্কার করেন অ্যাডমিরাল বার্ড, তিনি যখন পাঁচ মাস একটা বাজে কাঠের ঘরে দক্ষিণ মেরুর তুষারাবৃত অঞ্চলে নির্জনে বাস করেন। ওই কুমেরুর তুষার অঞ্চলের পরিধি যুক্তরাষ্ট্র আর ইউরোপের মিলিত এলাকার চেয়েও বড়। সেখানে ছিল প্রকৃতির অপার রহস্য। কোন দিকেই একশ মাইলের মধ্যে কোন প্রাণী ছিল না। ঠাণ্ডা এমনই প্রচণ্ড যে নিঃশ্বাস ফেললেও সেটা জমাট বেঁধে উঠত। সেখানে সম্পূর্ণ একাকী কাটান বার্ড। তার লেখা বই 'একাকী'তে বার্ড বর্ণনা করেছেন আশ্চর্য আত্ম ধ্বংসকারী অন্ধকারের কথা। দিনও সেখানে রাতের মতই আঁধার ঘেরা ছিল। উন্মাদ হওয়া থেকে রক্ষা পেতেই নিজেকে তার ব্যস্ত রাখতে হ'ত।

তিনি লেখেন : 'রাত্রিবেলা লণ্ঠন নেভানোর আগে আমি পরের দিনের কাজের তালিকা তৈরী করে রাখতাম। নিজেই নিজেকে কাজ দিতাম—পালানোর সুড়ঙ্গের কাজে একঘণ্টা, আধঘণ্টা বরফ সমান করার কাজ, একঘণ্টা খাবার টানেলে বইয়ের তাক কাটার কাজ ইত্যাদি···।

তিনি লিখেছেন 'এইভাবে কাজ করাটা চমৎকার লাগতো'। 'এটা আমার নিজের উপর দারুণ নিয়ন্ত্রণ আনতে সাহায্য করে···ওটা না থাকলে সারাটা দিনই আমার কাছে উদ্দেশ্য বিহীন হয়ে পড়তো। আর তাহলে দিনও শেষ হ'ত অসম্পূর্ণ ভাবেই।'

আপনি বা আমি যদি দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হই তাহলে মনে রাখবেন আমরা প্রাচীন সেই কাজ করাকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। হার্ভার্ডে-র ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের ভুতপূর্ব অধ্যাপক ডাক্তার রিচার্ড সি. ক্যাবটের মত লোকই সেটা বলেছেন। তিনি তাঁর বই 'মানুষ কিসে বাঁচে' বইতে বলেছেন, 'ডাক্তার হিসেবে আমি আনন্দের সঙ্গে

লক্ষ্য করেছি কাজ করার ফলে লোকে সন্দেহ, ইতস্ততঃ ভাব, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি থেকে জন্মানো পক্ষাঘাত, যাতে লোকে কাঁপতে থাকে এই রোগ সেরে গেছে···যে কাজ থেকে সাহসের জন্ম তাকে চিরস্থায়ীরূপে গৌরবান্বিত করেছেন এমার্সন।

আপনি বা আমি যদি ব্যস্ত না থাকি—শুধু বসে চিন্তা করি—তাহলে তা থেকে জন্ম নেবে চার্লস্ ডারউইন যা বলেছেন দুষ্ট প্রকৃতির ভূত। এই ভূত আমাদের কাজের আর ইচ্ছা শক্তিকে ধ্বংস করে ফেলে।

আমি নিউইয়র্কের একজন ব্যবসায়ীকে জানি যিনি ওই ভূতকে নানা ধরণের কাজের মধ্য দিয়ে দূর করেন। তার নাম হলো ট্রেম্পার লংম্যান। দুশ্চিন্তা করার কোন সময় তার থাকেনি। তিনি আমার বয়স্ক শিক্ষার ক্লাসে এসে এই কাহিনী শুনিয়েছিলেন: 'আঠারো বছর আগে দুশ্চিন্তায় আমার নিদ্রাহীনতা ধরেছিল। আমি শক্ত, বিরক্ত আর খিটখিটে হয়ে পড়ি। আমার ভয় হচ্ছিলো হয়তো স্নায়বিক অবসাদে ভেঙে পড়ব।

'আমার দুশ্চিন্তার কারণও ছিলো। আমি নিউইয়র্কের ক্রাউন ফ্রুট কোম্পানীর কোষাধ্যক্ষ ছিলাম। এক গ্যালন টিনের পাত্রে স্ট্রবেরি ভরার জন্য আমাদের পাঁচ লক্ষ ডলার নিয়োগ করা হয়। বিশ বছর ধরেই আমরা এইসব আইসক্রিম কোম্পানীদের বিক্রি করে আসছিলাম। আচমকা আমাদের বিক্রি পড়ে গেল কারণ আইসক্রিম প্রস্তুতকারীরা তাদের উৎপাদন বাড়াতে চেয়ে তারা গ্যালন টিনের পরিবর্তে বড় বড় ব্যারেলের স্ট্রবেরি কিনছিলো।

'এর ফলে ব্যবসায় আমাদের যে শুধু পাঁচ লক্ষ ডলারই আটকে গেল তাই নয়, এছাড়াও আমরা বারোমাসের জন্য আরও দশ লক্ষ ডলারের স্ট্রবেরি কেনায় চুক্তিবদ্ধ ছিলাম। ব্যাঙ্ক থেকেও আমরা সাড়ে তিন লক্ষ ডলার ঋণও করেছিলাম। আমরা নতুন ঋণ করা বা আগের ঋণ শোধও করতে পারছিলাম না। অবাক হবার মত দুশ্চিন্তায় ডুবে গেলাম।

'আমি ক্যালিফোর্ণিয়ার ওয়াৎসনভিলে আমাদের কারখানায় ছুটে গেলাম। সেখানে আমি আমাদের প্রেসিডেন্টকে বোঝাতে চাইলাম অবস্থা বদল হয়ে আমাদের বিপদ ঘটতে চলেছে। তিনি সেটা বিশ্বাসই করতে চাইলেন না। তিনি উল্টে সব দোষ চাপালেন আমাদের নিউ ইয়র্ক অফিসের উপর। বললেন তারা বিক্রির কায়দাই জানেনা।

'বেশ কদিন ধরে ওকালতি করার পর তাকে বাকি সব স্ট্রবেরি টিনে না ভরে খোলাবাজারে বিক্রিতে রাজি করাতে পারলাম। তাতে আমাদের সব সমস্যার প্রায় সমাধান হলো। আমার দুশ্চিন্তা আর না হওয়াই উচিত ছিলো—কিন্তু তা হলোনা কারণ দুশ্চিন্তা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। আমার তাই হলো।

'যখন নিউ ইয়র্কে ফিরলাম, সব কিছু নিয়েই দুশ্চিন্তা হতে লাগলো। ইতালী থেকে যে চেরী কিনেছিলাম আর হাওয়াই থেকে যে আনারস কিনেছিলাম, সেসব নিয়ে দুশ্চিন্তা সুরু হলো। দুশ্চিন্তায় আমার স্নায়ু ভেঙে পড়ার মত হলো।

অবশেষে হতাশায় এমন এক জীবন যাত্রা বেছে নিলাম, যাতে আমার নিদ্রাহীনতা আর দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেলো। সব সমস্যা নিয়ে এমন ভাবে জড়িয়ে থাকতে চাইলাম যে দুশ্চিন্তার আর অবকাশই রইলো না। রোজ সাতঘণ্টা কাজ করে চললাম। রোজ সকাল আটটায় অফিসে এসে প্রায় মাঝ রাত অবধি রইলাম। নতুন কাজ আর দায়িত্ব নিতে লাগলাম। মাঝরাতে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন এতোই পরিশ্রান্ত থাকতাম যে বিছানায় শোবার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমার সাড়া থাকতো না।

'এইভাবে তিনমাস চালালাম। ইতিমধ্যে আমার দুশ্চিন্তার অভ্যাস দূর হয়ে গিয়েছিলো—তাই আবার দৈনিক সাত, আটঘণ্টা কাজ করতে লাগলাম। এ ঘটনা ঘটে আঠারো বছর আগে। এরপর আর কখনই নিদ্রাহীনতা বা দুশ্চিন্তায় ভুগিনি।'

জর্জ বার্নার্ড শ ঠিক বলেছিলেন: 'দুঃখী হয়ে ওঠার রহস্য হলো আপনি সুখী না দুখী ভাবতে পারার মত সময় থাকা।' অতএব এটা নিয়ে আর ভাববেন না। বরং কাজে লেগে পড়ুন। তাতে রক্ত চলাচল হবে। আপনার মন চনমন করতে থাকবে—অচিরেই আপনার শরীরে এই নিশ্চিত শক্তি আপনার মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর করে দেবে। তাই ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করুন। এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো আর সস্তা ওষুধ।

অতএব দুশ্চিন্তার অভ্যাস দূর করার একনম্বর নিয়ম হলো: কাজে ব্যস্ত থাকুন।'

॥ সাত ॥

দুশ্চিন্তার ভার বইবেন না

এই নাটকীয় কাহিনীটি আমৃত্যু আমার মনে থাকবে। নিউ জার্সির রবার্ট মুর এটা আমায় বলেছিলেন।

তিনি যা বলেছিলেন সেটা এই রকম : '১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা পাই। ইন্দোচীনের উপকূলের কিছু দূরে জলের ২৭৬ ফিট নিচে আমার এটা শিক্ষালাভ হয়। এম. এস. বায়া—৩১৮ নামে একটা ডুবোজাহাজের অষ্টাশি জনের মধ্যে আমি ছিলাম একজন। আমরা রাডারে আবিষ্কার করি ছোট্ট একটা জাপানী জাহাজ আমাদের দিকে আসছে। সকাল হওয়ার মুখে আমরা সেটা আক্রমণের জন্য ডুব মেরে তৈরি হলাম। পেরিস্কোপের মধ্য দিয়ে দেখলাম একটা জাপানি ডেস্ট্রয়ার, একটা ট্যাঙ্কার আর মাইনফেলা জাহাজও আছে। আমরা তিনটে টর্পেডো ছুঁড়লাম—কিন্তু কোনোটাই লাগলো না। প্রত্যেকটা টর্পেডোর মধ্যে কিছু গোলযোগ ঘটে যায়। ডেস্ট্রয়ারটা যে আক্রান্ত হয়েছে না বুঝেই এগিয়ে চললো। আমরা শেষের মাইন পাতা জাহাজটা আক্রমণ করবো ভেবে তৈরি হতেই সে আচমকা ঘুরে আমাদের দিকে চলে এলো (একটা জাপানী প্লেন আমাদের ষাট ফুট জলের নিচে দেখতে পেয়ে মাইন পাতা জাহাজটাকে জানিয়ে দেয়।) আমরা ১৫০ ফিট নেমে গেলাম যাতে আমাদের আর দেখা না যায় আর ডেপথচার্জ আক্রমণের জন্য তৈরি হলাম। আমরা নিঃশব্দে থাকার জন্য ফ্যান বন্ধ করলাম, ঠান্ডা করার যন্ত্র আর বিদ্যুৎ ব্যবস্থাও বন্ধ করে দিলাম।

'তিন মিনিট পরে যেন নরক ভেঙে পড়লো। আমাদের চারপাশে ছ'টা ডেপথচার্জ ফেটে আমাদের ঠেলে প্রায় সমুদ্রের ডাঙ্গায় পৌঁছে দিলো—প্রায় ২৭৬ ফিট তলায়। আমরা প্রচণ্ড ভয় পেলাম। একহাজার ফিট গভীরতায় আক্রমণই বিপজ্জনক—পাঁচশো ফিটের কম হলে তো মারাত্মক। আর আমাদের প্রায় তার অর্ধেক জলের গভীরতায় আক্রমণ করা হয়েছে—মাত্র হাঁটু জলে। পনেরো ঘণ্টা ধরে জাপানী মাইন পাতা জাহাজটা ডেপথচার্জ ফাটিয়ে গেলো। ডুবোজাহাজের সতেরো ফিটের মধ্যে ডেফথচার্জ ফাটলে সেই ধাক্কায় এতে গর্ত হতে পারে। আমাদের পঞ্চাশ ফিটের মধ্যে গাদা গাদা ডেফথচার্জ ফাটলো। আমাদের আদেশ দেওয়া হয় চুপচাপ নিজেদের বাঙ্কে শুয়ে থাকতে। আমি এমনই ভয় পেয়ে যাই যে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। বারবার নিজেকে বলতে থাকি 'মৃত্যুর আর দেরি নেই!' মৃত্যুর আর দেরি নেই!··· পাখা আর ঠাণ্ডার যন্ত্র বন্ধ থাকায় ভিতরে তাপ প্রায় একশ ডিগ্রী দাঁড়ায়—তা সত্ত্বেও আমার এমনই শীত লাগতে থাকে যে একটা সোয়েটার আর জ্যাকেট পরেও শীতে থরথর করে কেঁপে চলি। আমার দাঁতে দাঁত লেগে যায়। আক্রমণ প্রায় পনেরো

ঘণ্টা চললো তারপরে আচমকা বন্ধ হয়ে যায়। আপাতদৃষ্টিতে বোঝা গেল জাপানীদের ডেপথচার্জ নিঃশেষ হওয়াতেই তারা চলে গেছে। ওই পনেরো ঘণ্টা আমার কাছে পনেরো কোটি বছর বলেই মনে হয়েছিল। আমার সারা জীবনের ঘটনাগুলো চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল। সারা জীবনে যত খারাপ কাজ করেছি আর সামান্য ব্যাপারে যে দুশ্চিন্তা করেছি তাই ভাবতে লাগলাম। নৌবাহিনীতে যোগদানের আগে আমি একটা ব্যাঙ্কের কেরানী ছিলাম। কম মাইনে, দীর্ঘ সময়, ভবিষ্যতে ক্ষীণ উন্নতির আশা সম্পর্কে দুশ্চিন্তা করতাম। নিজস্ব একটা বাড়ি ছিলোনা বলেও ভাবতাম, নতুন গাড়ি আর স্ত্রীকে ভালো পোশাক কিনে দিতে পারতাম না বলেও ভাবলাম। আমার বসের সম্বন্ধে কত কথা ভাবতাম, কি রকম তাকে ঘৃণাও করতাম! ভাবলাম রাতে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে কি সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া করতাম। আমার কপালে গাড়ি দুর্ঘটনায় ঘটা একটা কাটা দাগ নিয়েও কত ভাবতাম সেটাও মনে পড়ে।

'বহু বছর আগে এসব দুশ্চিন্তা কত বিরাটই না মনে হত! কিন্তু আমার চারদিকে যখন ডেপথচার্জ পড়ছে আর আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত হচ্ছে তখন সেগুলো কতই না তুচ্ছ মনে হলো। আমি শপথ নিলাম এবার যদি বেঁচে উঠে আবার সূর্যের আলো দেখতে পাই তাহলে আর কখনও দুশ্চিন্তা করবো না। কখনও না। সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চারবছর অধ্যয়ন করে যা শিখিনি ওই পনেরো ঘন্টায় তার চাইতে ঢের বেশি শিখেছি।

আমরা অনেকক্ষেত্রে বড় বড় বিপদগুলি বেশ সাহসের সঙ্গেই প্রতিরোধ করতে পারি। কিন্তু সামান্য জিনিস নিয়ে আমরা ভেঙ্গে পড়ি। এ প্রসঙ্গে স্যামুয়েল পিপস তাঁর 'ডায়েরীতে' বর্ণনা করেছেন কি ভাবে তিনি লণ্ডনে স্যার হ্যারীভেনের মাথা কেটে ফেলতে দেখেন। তিনি তখন তাঁর জীবন ভিক্ষা করেন নি। তিনি ঘাতককে শুধু বলছিলেন তাঁর ঘাড়ের উপর একটা খুব যন্ত্রনাদায়ক ফোঁড়া আছে সেটার উপর যেন খাঁড়ার ঘা না পড়ে!

ঠিক এমনই প্রমাণ পান এ্যাডমিরাল বার্ড মেরু প্রদেশের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়-- তিনি বলেন মানুষ বড় বড় বিপদের চেয়ে ছোট খাট বিপদ নিয়েই বেশি চিন্তা করে। তারা প্রায়ই শূন্য ডিগ্রীর চাইতে আশি ডিগ্রীর বেশি ঠাণ্ডায় অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারতো। অ্যাডমিরাল বার্ড বলেছেন, 'কিন্তু আমার কিছু সঙ্গীর কথা জানি যারা একে অন্যের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেয় কারণ তারা ভেবেছিলো তাদের নির্ধারিত জায়গায় অন্যেরা তাদের যন্ত্রপাতি রেখেছে। আমি একজনকে জানতাম যে কিছুতেই ফ্লেচেরিস্টের সামনে খেতে পারতো না, সে দূরে এক জায়গায় গিয়ে খেত। কারণ ফ্লেচেরিস্টের অভ্যাস ছিলো পেটে যাওয়ার আগে খাদ্যগুলোকে আঠাশবার চিবিয়ে খাওয়া।

'কোন মেরুশিবিরে', অ্যাডমিরাল বার্ড বলেন, এধরণের ছোট ব্যাপার ও শিক্ষিত মানুষকেও উম্মাদ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট।'

অ্যাডমিরাল বার্ডের মত আপনি আর একটা বিষয়ও জানতে পারেন, তাহলো বিয়ের ব্যাপারেও এইরকম ছোটখাটো ব্যাপার মানুষকে উম্মাদ করে দিতে পারে।

এটাই বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন। উদাহরণ হিসাবে শিকাগোর যোশেফ স্যাবাথের কথাই ধরুন। তিনি অন্ততঃ চল্লিশ হাজার অসুখী বিবাহ বিচ্ছেদের শুনানী গ্রহণ করেন। তিনি বলেছেন, 'বিয়ের অসুখী হওয়ার মূল অতি তুচ্ছ কিছু ঘটনা। নিউ-ইয়র্কের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নী ফ্রাঙ্ক এস· বোগানও বলেছেন, 'আমাদের ফৌজদারী আদালতের অর্ধেক মামলাই অতি তুচ্ছ কারণে ঘটে। বাররুমের মারপিট, গার্হস্থ্য কলহ, অপমানকর কোন মন্তব্য ইত্যাদি। কোন খারাপ কাজ—এই সব তুচ্ছ ব্যাপার থেকেই মারামারি আর খুনজখম ঘটে যায়। আমাদের মধ্যে সামান্য কেউই বড় কোন কারণে আঘাত পাই, তুচ্ছ কোন কারণেই আমাদের অহমিকায় আঘাত লাগে।'

এলিনর রুজভেল্টের যখন সবে বিয়ে হয় তিনি অনেকদিন চিন্তায় ছিলেন কারণ তার রাঁধুনি অতি বাজে রান্না করতো। মিসেস রুজভেল্ট বলেছেন, 'ব্যাপারটা আজ ঘটলে আমি গ্রাহ্যই করতাম না। এটাই সবচেয়ে ভালো। এমনকি ক্যাথরিন দি গ্রেটও চরম কতৃত্বপরায়না হয়েও পাচক রান্না খারাপ করলে হেসে উড়িয়ে দিতেন।

ডিসেরেলি বলেছিলেন : 'জীবন ছোট বলেই এত মহান।' একটি পত্রিকায় আন্দ্রেমারোয়া বলেন, 'এই কথা কটি আমাকে বহু কণ্টকর অবস্থা থেকে মুক্ত করেছে। যেসব ব্যাপার ভুলে যাওয়া দরকার এমন ছোটোখাটো ব্যাপারই আমাদের পীড়ন করে। আমরা যে এই পৃথিবীতে আছি, কবছরই বা আমরা বেঁচে থাকবো ; এরই মধ্যে আমরা কত তুচ্ছ বিষয়ে দুশ্চিন্তা করি এবং একবছরের মধ্যেই আমরা তা ভুলে যাবো। না, আসুন আমরা আমাদের জীবন ভালো কাজের মধ্যে দিয়ে সার্থক করে তুলি কারণ জীবন ছোট বলেই তো এতো মহান।'

রাডিয়ার্ড কিপলিংয়ের মত বিখ্যাত মানুষও কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন। ফল কি হলো? তিনি আর তাঁর শ্যালক ভারমন্ট ইতিহাসে বিখ্যাত মামলায় জড়িয়ে পড়েন। এ ব্যাপারটা এতোই বিখ্যাত হয়ে ওঠে যে একটা বইও লেখা হয়, যার নাম 'রাডিয়ার্ড কিপলিংয়ের ভারমন্ট বিবাদ।'

ব্যাপারটা ছিলো এই রকম : কিপলিং ভারমন্টের একটি মেয়ে ক্যারোলিন ব্যালেস্টিয়ারকে বিয়ে করেন। তিনি ব্র্যাটলবোরোতে চমৎকার একটা বাড়ি বানান সেখানেই বরাবর থাকবেন বলে। তার শালা বিটি ব্যালেসটিয়ারের সঙ্গে কিপলিংয়ের দারুণ বন্ধুত্ব হয়। তারা একসঙ্গে কাজকর্ম আর খেলাধুলো করতেন।

কিপলিং শালার কাছ থেকে কিছু জমি কেনেন, তাতে ব্যবস্থা থাকে ব্যালেস্টিয়ার প্রতিবছর সেখান থেকে খড় কেটে নেবেন। একদিন ব্যালেস্টিয়ার দেখলেন কিপলিং এই মাঠে ফুলের বাগান তৈরি করছেন। তার রক্ত গরম হয়ে গেলো আর তাই তিনি চোটপাট করতে লাগলেন। কিপলিংও জবাব দিলেন। সারা ভারমন্ট গরম হয়ে গেলো!

এরপর একদিন কিপলিং যখন সাইকেল চড়ছিলেন তখন তার শালা একটা গাড়ি এবং কিছু ঘোড়া নিয়ে এমন আচমকা হাজির হলেন যে কিপলিং প্রায় পড়ে গেলেন।

আর সেই কিপলিংই, যিনি লিখেছিলেন 'তোমার চারপাশের লোক যখন মাথা খারাপ করে, তার জন্য তোমায় দোষ দেয়, তখন তোমার মাথা ঠিক রাখার ক্ষমতা থাকা চাই :' তিনি স্বয়ং মাথা খারাপ করে বসলেন। তিনি শালাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশকে জানালেন। একটা দারুণ মামলা চলল—নানা শহর থেকে বহু সংবাদিক এলেন—সারা পৃথিবীতে তা রাস্ট্র হলো। কিন্তু সমাধান হলো না। এর ফলে কিপলিং এবং তার স্ত্রীর আর আমেরিকায় থাকা সম্ভব না হওয়ায় তারা সেখান থেকে চিরকালের জন্য দেশত্যাগ করলেন। ব্যাপারটা কিন্তু নেহাতই সামান্য—এক বোঝা খড় !

চব্বিশ শো বছর আগে পেরিক্লিস বলেন : 'থামুন ভদ্রমহোদয়েরা, আমরা সামান্য বিষয় নিয়ে বড় সময় নষ্ট করছি।' সত্যিই আমরা তাই করি।

কলোরাডোর লঙ পাহাড়ের গায়ে এক বিশাল গাছের ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা বলেন গাছটা চারশো বছর বেঁচেছিল। কলম্বাস যখন যান সালভাডরে নামেন এই গাছটি তখন শিশু, আর প্লীমাউথে যখন ঔপনিবেশিকরা আসে তখন সেটা অর্ধেক বড় হয়। ওই গাছটির উপর চোদ্দবার বাজ পড়ে এবং কত যে তুষার ঝড় হয়ে গেছে তাও তার কিছু হয়নি। অবশেষে একঝাঁক মৌমাছি গাছটিকে একেবারে শুইয়ে দেয়। এই সব পোকারা গাছটির ভিতরের সব শক্তি কুরে কুরে খেয়ে নেয়। এই বিশাল অরণ্যের দৈত্য যে বয়সের ভারে ভেঙে পড়েনি ; বজ্র যাকে শেষ করতে পারেনি, সে কিনা সামান্য পোকার আক্রমণে শেষ হয়ে গেল ! যে পোকাকে মানুষ আঙুলে টিপে মারতে পারে।

আমরাও ওই অরণ্যের দৈত্যের মত যুদ্ধ করছি না কি ? আমরা জীবনযুদ্ধের ঝড় ঝাপটা আর হিমবাহের ধাক্কা অনেকটা সহ্য করতে পারি কিন্তু ছোট ছোট দুশ্চিন্তা যা আমরা দুআঙুলে মারতে পারি, তারই কাছে হেরে যাই।

কয়েক বছর আগে আমি উইওমিঙের টেটন ন্যাশানাল পার্কের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করছিলাম, সঙ্গে ছিলেন উইওমিঙের চার্লস্ সিফ্রেড, আর তার কিছু বন্ধু। সিফ্রেড ছিলেন সেখানকার বড় রাস্তার কর্তা। আমরা সবাই চলেছিলাম জন ডি রকফেলারের জমিদারী দেখতে। কিন্তু ব্যাপার হলো আমি যে গাড়িতে ছিলাম সেটা ভুল পথে গিয়ে প্রায় একঘণ্টা পরেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছল। মিঃ সিফ্রেডের কাছেই ছিল গেটের চাবি, তাই তিনি ওই একঘন্টা মশার উৎপাতের মধ্যে বাগানে অপেক্ষায় ছিলেন। ওগুলো যে সে মশা নয়, যে কোন সাধুকেও ক্ষেপিয়ে তুলতে পারতো। কিন্তু সেইসব মশারা চার্লস সিফ্রেডকে কিছুই করতে পারেনি। তিনি গাছের একটা ডাল কেটে বাঁশি বানিয়ে দিব্যি তা বাজিয়ে সময় কাটাচ্ছিলেন। আমি বাঁশিটা সযত্নে রেখে দিয়েছি স্মৃতি হিসেবে—যাতে একজন মানুষ সামান্য ব্যাপার কি করে কাটান সেটা আমার যাতে মনে পড়ে।

দুশ্চিন্তার অভ্যাস কাটাতে হলে দু নম্বর নিয়ম হল :

ছোটখাটো সব ব্যাপারে দুশ্চিন্তা না করে তা ভুলে যাওয়াই উচিত। মনে রাখবেন 'জীবন ছোট বলেই এত মহান।'

আট ॥

যে নীতিতে অনেক দুশ্চিন্তা দূর হয়

ছোট বেলায় আমি মানুষ হই মিসৌরীর এক খামারে। একদিন মা'কে চেরিফল তুলতে সাহায্য করতে গিয়ে আমি কাঁদছিলাম। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কাঁদছো কেন ডেল?' আমি কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিলাম, 'আমার মনে হচ্ছে আমার জ্যান্ত অবস্থায় কবর হবে!'

সে সময় আমার নানা দুশ্চিন্তা ছিল। ঝড় বৃষ্টি হলে ভয় লাগতো বজ্রপাতে মারা যাবো। অভাব এলে মনে হত না খেয়েই মরতে হবে। ভয় লাগতো মরে বোধ হয় নরকেই যাবো। দারুণ ভয় পেতাম আমার চেয়ে বয়সে বড় স্যাম হোয়াইট যখন বলতো আমার বড় বড় কান দুটো সে কেটে নেবে। টুপি তুললে মেয়েরা আমায় দেখে হাসবে তাই ভেবেও ভয় পেতাম। কোন মেয়ে আমাকে বিয়ে করবে না ভেবেও ভীত হতাম। আরও ভয় লাগতো ঠিক বিয়ের পর বউকে কি কথা বলবো ভেবেও। এই সব নানা আতঙ্কজনক দুশ্চিন্তা আর ভয় আমায় পেয়ে বসলো। কিন্তু অনেক বছর পরে দেখলাম, যে সব ভয় আমি করতাম তার শতকরা নিরানব্বই ভাগই অর্থহীন।

যেমন বজ্রপাত সম্পর্কে ভয় পেতাম। কিন্তু এখন জানি বাজপড়ে মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা আমার সাড়ে তিন লক্ষ ভাগে মাত্র এক। আমার জ্যান্ত অবস্থায় কবর হওয়া আরও হাস্যকর—এককোটিতে একজনই মাত্র। অথচ এই নিয়ে আমার ভাবনা ছিল।

প্রতি আটজনে একজন ক্যান্সারে মারা যায়—তাই যদি ভয় পেতে হত তাহলে ক্যান্সারে ভয় পাওয়াই সঙ্গত ছিলো। বাজ পড়ে বা জ্যান্ত কবর হওয়ার জন্য নয়।

আমি শিশু আর বাল্যকালের দুশ্চিন্তার কথাই বলছি। তবে বয়স্কদেরও অনেক ক্ষেত্রে হাস্যকর রকম ভয় জাগে: আপনি বা আমি এখনই গড়পড়তার নিয়মের মধ্য দিয়ে দেখে নিতে পারি আমাদের দুশ্চিন্তার সত্যিই কারণ আছে কিনা।

বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত বীমা কোম্পানী লণ্ডনের লয়েডস বিনা কারণে মানুষের দুশ্চিন্তায় নির্ভর করেই কোটি কোটি টাকা আয় করেছে। লয়েডস বাজী ধরে মানুষকে বলে তারা যে বিপদের ভয় করে তা আদৌ ঘটবে না। অবশ্য ব্যাপারটাকে তারা বাজী ধরা বলেন না, বলেন বীমা করা। আসলে ব্যাপারটা গড়পড়তার নীতিতে কার্যকর। এই প্রতিষ্ঠান দুশো বছর ধরে চলেছে, আর মানুষের প্রকৃতির যদি বদল না ঘটে তবে আরও পঞ্চাশ শতাব্দীই চলতে থাকবে। এই ভাবেই মানুষ জুতো থেকে আরম্ভ করে জাহাজ পর্যন্ত বীমা করে যাবে।

আমরা যদি গড়পড়তার নিয়মটা ভালো মত পরীক্ষা করি তাহলে যা দেখবো তাতে হতবাক হয়ে যাবো। ধরা যাক, আমি যদি জানি আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আমাকে গেটিসবার্গের যুদ্ধের মত রক্তাক্ত লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে হবে তাহলে আমি ঘাবড়ে যাব। তাহলে যতোটা পারি বীমা করিয়ে উইলও করে ফেলবো। আমি বলতে চাইবো, 'এ যুদ্ধ থেকে আমার বেঁচে ফেরার সম্ভাবনা বেশ কম—অতএব যতদিন সময় আছে সব গুছিয়ে ফেলি।' অথচ ব্যাপারটা হল গড়পড়তার নিয়মে শান্তির সময়ে পঞ্চান্ন বছর বাঁচা যতটা বিপদজনক গেটিসবার্গ যুদ্ধের সময়েও তাই ছিল। যা বলতে চাই তা হল, শান্তির সময়েও পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন বছরে যত মানুষ মারা যায় গেটিসবার্গ যুদ্ধের ১,৬৩,০০০ সৈন্যের মধ্যে প্রতি পাঁচ হাজারে সেই সংখ্যাই মারা পড়ে।

কানাডার রকি অঞ্চলে বো হ্রদের কাছে জেমস সিমসনের লজে বসে এ বইয়ের কয়েকটা পরিচ্ছেদ আমি লিখি। সেখানে আমার সঙ্গে দেখা হয় মিঃ আর মিসেস হার্বার্ট এইচ. স্যালিঙ্গারেরা। মিসেস স্যালিঙ্গারের শান্ত, সমাহিত ভঙ্গী দেখে ভেবেছিলাম জীবনে তিনি দুশ্চিন্তা করেননি। তিনি কখনও দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেন: 'দুশ্চিন্তা করেছি কিনা? এজন্য আমার জীবনই নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। দুশ্চিন্তা যতদিন জয় করতে পারিনি সেই এগারো বছর নিজের তৈরি নরকবাস করেছি। আমি খিটখিটে আর বদমেজাজী হয়ে উঠি। সব সময় সন্ত্রস্ত থাকতাম। প্রতিদিন বাসে চড়ে স্যানফ্রান্সিসকোয় বাজার করতে আসতাম, তখনও আমার উদ্বেগের শেষ থাকতো না। যদি ইস্ত্রিটার প্লাগ খুলে না এসে থাকি? যদি বাড়িতে আগুন লেগে যায়? কিংবা ঝি হয়তো ছেলে মেয়েদের ফেলে চলে গেছে কেনাকাটার মধ্যেও আমি দুশ্চিন্তায় ঘামতে থাকতাম। আমার প্রথম বিয়ে ব্যর্থ হয় এতে অবাক হবার কিছু নেই।

'আমার দ্বিতীয় স্বামী একজন আইনজীবি অত্যন্ত শান্ত বিশ্লেষক মনের মানুষ যিনি কিছুতেই দুশ্চিন্তা করেন না। আমি যখনই চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন হই, তিনি বলেন, 'শান্ত থাকো' ব্যাপারটা ভাবা যাক···কি নিয়ে দুশ্চিন্তা করছো? গড়পড়তা নিয়মটা দেখা যাক, এসো। তাতেই বোঝা যাবে এটা হতে পারে কি না।'

'একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমার মনে আছে একবার নিউ মেক্সিকোর আলবুকার্ক থেকে কার্লসব্যাড ক্যাভার্নে ধুলোয় ভরা রাস্তায় গাড়িতে চলেছিলাম। আচমকা জোর বৃষ্টি সুরু হল।

'গাড়িটা পিছলে যেতে লাগলো—সেটাকে কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছিল না আমি নিশ্চিত হলাম গাড়িটা পাশের খাদে পড়ে যাবে, কিন্তু আমার স্বামী শান্তভঙ্গীতে বলতে লাগলেন: 'আমি অত্যন্ত আস্তে গাড়ি চালাচ্ছি, ভয়ের কিছু নেই। গাড়িটা খাদে পড়লেও গড়পড়তা নিয়ম অনুযায়ী আমাদের আঘাত লাগবে না। তার শান্ত ভঙ্গীতে আমি শান্ত হলাম।'

'এক গ্রীষ্মে আমরা কানাডিয়ান রকি পাহাড়ের টুকিন উপত্যকায় তাঁবুতে কাটাই

সমুদ্র থেকে সাত হাজার ফিট উঁচুতে একরাতে আমরা ছিলাম—হঠাৎ ঝড় উঠে তাঁবুগুলো প্রায় উড়িয়ে নিচ্ছিল টুকরো টুকরো করে। আমার স্বামী আমার প্রচন্ড ভয় লক্ষ্য করে বললেন : দেখ, ভয় পেয়োনা, আমাদের পথ প্রদর্শকরা জানে এ সময় কি করতে হয়। ওরা বহু বছর ধরে তাঁবু ফেলে আসছে, ঝড়ে কখনও সেগুলো ওড়েনি আর গড়পড়তার নিয়মে আজও তা হবে না। আর তা যদি হয়ও তাহলে অন্য তাঁবুতে কাটানো যাবে, অতএব শান্ত হও।' আমি তাই করলাম, আর বাকি রাত শান্তিতে কাটালাম।

'কয়েক বছর আগে ক্যালিফোর্ণিয়ায় শিশু পক্ষাঘাত মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছিল। আমি ভয়ে পাগল হয়ে যাই। আমার স্বামী আমাকে শান্ত থাকতে বলেন। আমরা ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে যথাসাধ্য সাবধানতা নিই। বোর্ড অব হেলথের সঙ্গে কথা বলার পর বুঝি, গড়পড়তা নিয়মে এ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। সাধারণ সময়েও এমন হয়।

'গড়পড়তা নিয়মে এটা ঘটবে না।' এই কথাটাই আমার দুশ্চিন্তার শতকরা নব্বই ভাগই দূর করেছে আর আমার গত বিশ বছরের জীবনে আশাতীত আনন্দ এনে দিয়েছে।'

জেনারেল জর্জ ক্রুক—যিনি আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত রেড ইণ্ডিয়ান যোদ্ধা, তিনি তার আত্মজীবনীর ৭৭ পাতায় বলেছেন : ইণ্ডিয়ানদের সমস্ত দুশ্চিন্তা আর অসুখীভাবের কারণ তাদের কল্পনা প্রসূত, বাস্তব নয়।'

'অতীতের দিকে তাকালে বুঝতে পারি আমার দুশ্চিন্তারও কারণ তাই, কথাটা বলেছিলেন নিউইয়র্কের জেমস এ গ্র্যান্ট ডিস্ট্রিবিউটিং কোম্পানীর মালিক জিম গ্র্যান্ট। তিনি একবার প্রায় পনেরোটি ট্রাক বোঝাই কমলালেবু আর আঙুর আমদানী করেন। তিনি বলেছিলেন প্রায়ই তিনি নানা দুশ্চিন্তা করতেন। যেমন : 'যদি ট্রেন দুর্ঘটনা হয় ? যদি সব রোগ সারাগ্রামে ছড়িয়ে পড়ে ? সময় মত না এলে যদি বাজার না চলে ?' তার দুশ্চিন্তা এমনই পর্যায়ে পৌঁছল যে তিনি পাকস্থলীতে আলসার হয়েছে ভেবে ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার তাঁকে জানালেন তাঁর কিছুই হয়নি শুধু নার্ভের গোলমাল ছাড়া। 'আমি তখনই আলো দেখলাম', জেমস গ্র্যান্ট জানিয়েছিলেন। 'তখনই নিজেকে প্রশ্ন করলাম', 'দেখ জিম, আজ অবধি কত গাড়ি ফল আমদানী করেছো ?' উত্তর এলো : 'প্রায় পঁচিশ হাজার।' আমার প্রশ্ন : 'কতগুলো গাড়ি আজ পর্যন্ত ভেঙেছে ?' উত্তর হল : 'প্রায় পাঁচটা হবে।' তখন ভাবলাম, পঁচিশ হাজারে মাত্র পাঁচ।'

'তখনই বুঝলাম আমি বোকার মতই চিন্তা করছি। তখনই ঠিক করলাম গড়পড়তা নিয়মই মেনে চলবো।'

অল স্মিথ যখন নিউইয়র্কের গভর্ণর ছিলেন আমি তাকে বলতে শুনেছি তিনি তাঁর রাজনৈতিক শত্রুদের কথার কি জবাব দিতেন। তিনি শুধু বলতেন : 'আসুন প্রকৃত ঘটনা পরীক্ষা করি…।' তারপর তিনি প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করতেন। আমি

বা আপনি অল স্মিথের উপদেশটা মেনে চলতে পারি কিনা দেখি আসুন। ঠিক এইভাবেই ফ্রেডারিক জে. ম্যালস্টেড ট্রেঞ্চে শুয়ে এইরকম ভয় পান।

তিনি বলেছিলেন: ১৯৪৪ সালের জুন মাসের গোড়ায় আমি, ওমাহা সাগর তীরে একটা ট্রেঞ্চে শুয়েছিলাম। নরম্যাণ্ডির তীরে ওই ট্রেঞ্চ কাটা হয়। ছোট ওই গর্তে শুয়ে থাকতে গিয়ে ভাবলাম; এটা একদম কবরের মত।' ওতে শুয়ে থাকতে গিয়ে মনে হলো 'এটাই বোধ হয় আমার কবর'। রাত এগারোটায় যখন জার্মান বোমারু এসে বোমাবর্ষণ সুরু করল আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। প্রথম দু-তিন রাত একেবারেই ঘুমোতে পারলাম না। পাঁচদিনের মাথায় একেবারেই ভেঙে পড়লাম। বুঝলাম কিছু একটা না করলে পাগল হয়ে যাব। তাই পাঁচটা রাত কাটার পর নিজেকে বললাম, পাঁচটা রাত কেটে গেলেও আমি বেঁচে আছি, বাকিরাও তাই, মাত্র দুজন সামান্য আহত। তাই ঠিক করলাম আর দুশ্চিন্তা করব না। বুঝলাম একমাত্র মারা যেতে পারি সোজা বোমা পড়লে। আর সে রকম ঘটার আশঙ্কা দশ হাজারে মাত্র এক। এরপরেই বোমাবর্ষণের মধ্যেও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারলাম।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী, নৌসেনাদের মনোবল বাড়ানোর জন্য তাদের গড়পড়তা নিয়ম কাজে লাগাতো। একজন প্রাক্তন সেনা আমাকে বলে ছিলেন তাদের দাহ্য তৈলবাহী জাহাজে কাজ দেওয়া হত। সবাই ভয়ে কাঠ হয়ে থাকতো কারণ তারা ভাবতো টর্পেডোর আঘাতে জাহাজ পুড়ে যাবে।

নৌবাহিনী জানতো তা ঠিক নয়—তাই তারা আসল তথ্য প্রকাশ করল। দেখা গেল একশটা জাহাজে টর্পেডোর আঘাত লাগলে চল্লিশটা ডোবে আর ষাটটা ভেসে থাকে। পাঁচটা জাহাজ দশ মিনিটের কম সময় ধরে ডোবে তাতে পালাবার সময় থাকে অর্থাৎ হতাহতের সংখ্যা কম হয়। গড়পড়তা নিয়মের এই তথ্যের ফলে আমার ভয় কেটে যায়। সব সৈনিকই এরপর নিশ্চিন্ত হয়।'

দুশ্চিন্তা দূর করার তিন নম্বর নিয়ম হল: আসুন দেখে নিই গড়পড়তার নিয়মে যা ভয় করছি তা আদৌ ঘটতে পারে কি না।'

॥ নয় ॥

অবশ্যম্ভাবীকে মেনে চলুন

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন একদিন মিসৌরীর উত্তর পশ্চিম দিকে এক পরিত্যক্ত বাড়ির চিলে কোঠায় বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করছিলাম। যখন চিলে কোঠায় জানালায় পা রেখে নামতে গেলাম আমার হাতের আঙটিটা পেরেকে লেগে যাওয়ার একটা আঙুল প্রায় ছিঁড়ে গেল।

ভয়ে আতঙ্কে আমি চিৎকার করে উঠি। আমার মনে হয়েছিল আমি মারা যাব। তারপর হাতটা সেরে গেলে এনিয়ে কোন সময়েই দুশ্চিন্তা করিনি। আমার ওই হাতে যে মাত্র চারটে আঙুল আছে একটা মাসে একবারও তা নিয়ে ভাবিনা। ভেবে লাভ কি? অবশ্যম্ভাবীকে অর্থাৎ যা ঘটবেই তাই আমি মেনে নিয়েছি।

কবছর আগে একজন লিফট চালককে কাঁধ পর্যন্ত কাটা হাত নিয়ে কাজ করতে দেখে তাকে প্রশ্ন করেছিলাম কাটা হাত নিয়ে সে ভাবে কিনা। সে জানিয়েছে আদৌ না, একমাত্র সূঁচে সুতো পরানোর সময়েই একটু ভাবনা হয়।

এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় আমরা যে কোন অবস্থাতেই অবশ্যম্ভাবীকে যেমন মানিয়ে নিতে পারি—আর সব ভুলেও যাই।

প্রায়ই আমার হল্যাণ্ডের আমস্টারডামের একটা প্রাচীন গির্জার ধ্বংসাবশেষে লেখা একটা বাণীর কথা মনে হয়। বাণীটি ফ্লেমিশ ভাষায় লেখা আর এই রকম: এটা এই রকম। কারণ অন্যরকম হতে পারেনা।'

আমি বা আপনি যখন যুগ যুগ ধরে এগিয়ে চলি তখন কিছু না কিছু অপ্রীতিকর অবস্থার সামনে পড়ি যা অন্যরকম হতে পারে না। আমাদের দুটো পথই থাকে—হয় অবস্থাটা মেনে নেওয়া অথবা বিদ্রোহ করে নিজেদের স্নায়ুকে ভেঙে ফেলতে পারি।

উইলিয়ম জেমস-ই এবিষয়ে আমার প্রিয় দার্শনিক। তিনি বলেছেন: 'যা ঘটেছে তাকে মেনে নিতে তৈরি হও। দুর্দশা এড়ানোর জন্য যা ঘটেছে তাকে মেনে নেয়াই শ্রেয়।' অরিগনের এলিজাবেথ কনলেকে অনেক দাম দিয়েই এটা শিখতে হয়েছিল। সম্প্রতি তিনি আমাকে এই চিঠিটা লিখেছেন: 'যেদিন আমেরিকা উত্তর আফ্রিকায় বিজয় দিবস পালন করছিল তখন আমি সমরদপ্তর থেকে একটা চিঠি পেলাম তাতে জানানো হয়েছিল আমার ভাইপো, যাকে দুনিয়ায় সবচেয়ে ভালোবাসি—তাকে পাওয়া যাচ্ছেনা। কিছুদিন পরেই খবর এল সে মারা গেছে।

'আমি দুঃখে ভেঙে পড়লাম। এর আগে পর্যন্ত ভাবতাম আমার জীবন কত সুখের। আমার পছন্দসই একটা চাকরি ছিল। ভাইপোকে আমিই মানুষ করেছি। আমার কাছে সে ছিল সব আশা আকাঙ্খার প্রতীক।...আর প্রয়োজন নেই। কাজে

অবহেলা সুরু করলাম। বন্ধুদেরও তাই। সবই ত্যাগ করলাম। সারা জীব আমার তিক্ত হয়ে উঠল। কেন আমার ভাইপোকে কেড়ে নিল? এত সুন্দর একা ছেলেকে কেন যুদ্ধে মারা যেতে হল? সারা জীবন যে ওর সামনে পড়ে ছিল আমি কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারলাম না। আমার শোক এতই ভয়ঙ্কর হল (ভাবলাম সব ছেড়ে পালিয়ে যাব।

'চলে যাওয়ার জন্য আমার ডেস্কটা সাফ করছিলাম—তখনই একটা চিঠি আমা হাতে পড়ল। এই চিঠি আমার ভাইপো-ই আমায় লিখেছিল ক' বছর আগে আমা মার মৃত্যু হলে। চিঠিটায় ছিল, নিশ্চয়ই আমরা তাকে আর পাবনা,' 'বিশেষ ক তুমি। তবু জানি তুমি শোক সামলে নিতে পারবে। তোমার নিজের ব্যক্তিগ জীবন দর্শনেই তা মেনে নিতে পারবে। যে সুন্দর সত্য তুমি আমায় শিখিয়েছ তা কখন ভুলব না। আমি যেখানে যতদূরেই থাকি সবসময় মনে রাখব তুমি আমাকে হাসে শিখিয়েছ, জীবনে যা ঘটুক তাকে মেনে নিতে শিখিয়েছ, প্রকৃত মানুষের মত গ্রহ করতে তুমি আমায় শিখিয়েছিলে।'

'আমি বারবার চিঠিটা পড়লাম। সে যেন আমার পাশেই দাঁড়িয়ে। সে যে বলছে, 'আমাকে যা শিখিয়েছ তাই করছো না কেন? যাই ঘটুক কাজ করে যাও তোমার ব্যক্তিগত শোক সরিয়ে রেখে হেসে এগিয়ে চল।'

আবার তাই কাজে ফিরে গেলাম। তিক্ত সেই বিদ্রোহী ভাব ত্যাগ করলা বারবার নিজেকে বললাম: যা হবার হয়ে গেছে, আমি এটা বদলাতে পারব না আমি যা করতে পারি তা হল, সে যা করতে বলেছে তাই করা। আমি সৈন্যদে আর অন্যান্য ছেলেদের চিঠি লিখতে লাগলাম। রাতের এক শিক্ষাক্রমে যোগও দিলা নতুন বহু বন্ধুও হল। আমার নিজের পরিবর্তন দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি আমার ভাইপো যা চাইতো আমি তাই করে চলেছি, ভাগ্যকে আমি মেনে নিয়েছি জীবনকে এখন আমি সম্পূর্ণ উপভোগ করছি।'

পোর্টল্যান্ডের এলিজাবেথ কনলি যা শিখেছিলেন এখন আমাদেরও তাই শেখ দরকার—আর তা হল যা অবশ্যম্ভাবী তাকে মেনে নিতেই হবে। 'যা হবার তা হবেই। এটা শেখা অবশ্য সহজ নয়। রাজা মহারাজাদেরও এটা বারবার স্মরণে রাখতে হয় স্বর্গতঃ রাজা পঞ্চম জর্জ বাকিংহাম প্যালেসে তার লাইব্রেরীর দেওয়ালে এই লেখাট ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছিলেন: 'আমি যেন অসম্ভবকে সম্ভব করতে না চাই, যা ঘটে গেছে তার জন্য অনুতাপ না করি।' ঠিক এমনই করেছেন শোপেন হাওয়ার: 'জীবনপথে চলার জন্য একটু উদাসীনতা চাইই।'

এটা ঠিক যে, সব সময় পারিপার্শ্বিকতা মানুষকে সুখী বা অসুখী করে না পারিপার্শ্বিকতায় আমাদের প্রতিক্রিয়াই আমাদের অনুভূতি গড়ে তোলে। যীশু বলেছিলেন স্বর্গের আবাস মানুষেরই মনে, আবার নরকও তাই।

আমরা সকলেই নিরুপায় হলে অনেক সময় ধ্বংস আর শোককে জয় করতে পারি। মনে হতে পারে এটা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়, অথচ আমাদের অন্তরের শক্তি এতই প্রবল

যে ইচ্ছে করলেই সেটা পারা যায়। আমরা নিজেদের যা ভাবি তার চেয়ে ঢের শক্ত ধাতুর আমরা।

স্বর্গীয় বুথ টার্কিংটন বলেছিলেন: 'জীবনে যা ঘটুক সবই আমি সহ্য করতে পারবো শুধু অন্ধত্ব ছাড়া। এটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।'

এরপর একদিন তিনি যখন ষাট বছর বয়সে মেঝের কার্পেটের দিকে তাকালেন তাঁর মনে হলো রঙগুলো কেমন অস্পষ্ট হতে চাইছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞের কাছে গেলেন। আর তখনই দুঃখজনক সেই কথাটা জানতে পারলেন: 'তিনি দৃষ্টি হারাচ্ছেন। তাঁর একটা চোখ অন্ধ হয়ে গেছে, অন্যটারও সেই অবস্থা হবে। যা ভয় করতেন তাই হতে চলেছে।'

টার্কিংটন এই ভয়ানক পরিস্থিতি কি ভাবে গ্রহণ করেছিলেন? তিনি যা ভেবেছিলেন, তাই হলো? এটাই কি অ নার জীবনের শেষ? না, তিনি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যান যে তিনি খুশি থাকতে পেরেছেন। অনেক মজার কথাও বলতে পেরেছিলেন তিনি। আশ্চর্য ব্যাপার, তিনি অন্ধকারে নানারকম ভেসে চলা মূর্তি দেখতে আরম্ভ করেন। একসময় বলেও ফেলেন: 'বাঃ কি মজার ব্যাপার। দাদু ভেসে চলেছেন— কিন্তু এত সকালে কোথায় চলসেন?'

এমন মনোভাব যার, ভাগ্য তার কি করবে? সত্যিই জয় করতে পারেনি তাকে। সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর টার্কিংটন বলেন: 'দেখলাম দৃষ্টি হারানোকে আমি সহজ মনেই গ্রহণ করতে পেরেছি। মানুষ যেভাবে সব পারে। আমার পাঁচটা ইন্দ্রিয়ও যদি নষ্ট হয়ে যায় আমি জানি আমার মনের মধ্যেই আমি বেঁচে থাকবো। কারণ এই মনের মধ্যেই আমরা বাস করি আর মন দিয়েই দেখি।'

দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য টার্কিংটনকে বারোবারেরও বেশি অস্ত্রোপচার করা হয় এক বছরে। আর সবটাই স্থানীয় ভাবে চোখকে অসাড় করে সম্পূর্ণ ভাবে তাঁকে অজ্ঞান করা হয়নি। তিনি কি এজন্যে বিদ্রোহ করেছিলেন? তিনি জানতেন এটা করতেই হবে, এ থেকে তার রেহাই নেই। তাই মুক্তি পাওয়ার পথ হল শান্ত ভাবে তা গ্রহন করা। তাঁকে আলাদা ভাবে রাখার কথায় তিনি আপত্তি করেন এবং হাসপাতালের ওয়ার্ডেই থাকেন। কারণ তাতে তিনি অন্য সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন বলে। তিনি সকলকে উৎসাহ দিতেন। তারপর সজ্ঞানে যখন অস্ত্রোপচার করা হল, তিনি কি ভাগ্যবান বলেই না নিজেকে ভাবলেন। তিনি বলেছিলেন, কি আশ্চর্য কথা। বিজ্ঞান মানুষের চোখের মত কোমল বস্তুতেও অস্ত্রোপচার করার কৌশল আয়ত্ত করেছে!'

সাধারণ মানুষ এরকম হলে ভেঙে পড়ত। তবুও টার্কিংটন বলেন, 'এর চেয়েও কোন সুখবর অন্য কিছুর জন্য এ অভিজ্ঞতা বদল করবে না।' এ ব্যাপারে তাঁকে মেনে নেবার কৌশল শিখিয়েছিল—আরও শিখিয়েছিল জীবনে যাই আসুক তাকে সহ্য করে নেওয়ার ক্ষমতা। জন মিল্টনও আবিষ্কার করেছিলেন. 'অন্ধ হওয়া দুঃখের নয়। দুঃখের হল তা সহ্য করার ক্ষমতা যদি না থাকে'

নিউ ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত মহিলা আন্দোলনকারী মার্গারেট ফুলার একবার বলেছিলেন : ধর্ম্ম সম্পর্কে আমি পৃথিবীকে গ্রহন করেছি।' খুঁতখুঁতে স্বভাবের বুড়ো টমাস কার্লাইল যখন কথাটা শুনেছিলেন তিনি বলে ওঠেন : 'হুম্, তার এটা করাই উচিত!' আর আসল কথাটা হল এরকম আমরা সবাই অবশ্যম্ভাবীকে মেনে নিলেই ভালো।

আমারও যদি অবশ্যম্ভাবীর বিরুদ্ধে মাথা খুঁড়ি তাহলে ফল কিছুই হবে না—যা ঘটার তা ঘটবেই, তার বিরুদ্ধে গেলে ক্ষতি আমাদের নিজেদেরই। একবার আমি ও অবশ্যম্ভাবী কোন ব্যাপার মেনে নিতে পারিনি। বোকার মতই বিদ্রোহ করেছিলাম তাতে আমার রাতের ঘুম চলে যায়। শেষ পর্যন্ত একবছর আত্মনির্যাতনের পর ব্যাপারটা মেনে নিতেই হল। অথচ আমি আগে থেকেই জানতাম এটা পরিবর্তনের শক্তি আমার নেই।

ওয়াল্ট হুইটম্যানের সঙ্গে গলা মিলিয়েই আমার বলা উচিত ছিল যে জন্তু আর বৃক্ষের মত হওয়াই ভালো, ওরা কি সুন্দর ভাবে রাত্রি, ঝঞ্ঝা, ক্ষুধা, দুর্ঘটনাকে এড়িয়ে যায়।

আমি বারো বছর গোরুবাছুরের দেখাশোনা করেছি অথচ কোনদিন তাদের বৃষ্টির অভাব নিয়ে ভেবে জ্বরে কাঁপতে দেখিনি। জন্তুরা রাত্রি, ঝড় বা ক্ষুধাকে শান্তভাবে গ্রহণ করে। তাই তাদের স্নায়ু ভেঙে পড়ে না, না পেটে আলসারও হয় না, মাথাও খারাপ হয় না।

তাহলে কি আমি যে বিপদই আসুক তাকে মাথা নিচু করে মেনে নিতে বলছি না, কখনও তা নয়। তা হলে তো নিয়তির দাস হতে হয়। যতক্ষণ কোন ব্যাপারে উদ্ধার পাওয়ার আশা থাকে ততক্ষণ চেষ্টা করতেই হবে। কিন্তু যদি স্পষ্ট বোঝা যায় কোন দিকেই কোন আশা নেই তখন যেন কি পাবো বা না পাবো তার হিসেব মেলানোর চেষ্টা না করি।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডীন হকস্ আমাকে বলেছিলেন তিনি একটা ছড়ার মধ্য থেকে তার জীবনের আদর্শ ঠিক করেছিলেন। সেটা এই রকম ছিল :

'সব ব্যাথারই ওষুধ আছে, হয়তো বা তা নেই,
থাকে যদি হাত পেতে নাও, চেয়োনা অলীককেই।'

এ বই লেখার সময় বহু আমেরিকান ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম একটা ব্যাপার আমার খুব মনে লেগেছিল তা হল এই যে, তাদের প্রায় সবাই অবশ্যম্ভাবীকে মেনে নিয়ে দুশ্চিন্তাকে জয় করেছিলেন। এটা না করলে তারা ওই যন্ত্রণার চাপে ভেঙে পড়তেন।

দেশ জোড়া পেনী ষ্টোর্সের প্রতিষ্ঠাতা জে. সি. পেনী আমায় বলেন : 'আমার পুঁজিটি ডলারের ক্ষতি হলেও দুশ্চিন্তা করি না—কারণ তাতে কোন লাভ হয় না আমি ভালো ভাবে কাজ করার চেষ্টা করি—ফল ভগবানের হাতেই ছেড়ে দিই।'

মনে হতে পার্ডও আমাকে বলেছিলেন একই কথা! 'যখন কোন ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ

করতে পারি না তখন তাদের হাতেই ব্যাপারটা ছেড়ে দিই।'

ক্রাইশলার কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট কে. টি. কেলারকে যখন প্রশ্ন করেছিলাম তিনি দুশ্চিন্তাকে কিভাবে ঠেকিয়ে রাখেন, তিনি উত্তর দেন: 'যখন কোন কঠিন অবস্থার সামনে পড়ি, তখন নিজে কিছু করার থাকলে তা করি, না থাকলে স্রেফ ভুলে যাই। আমি ভবিষ্যত নিয়ে ভাবি না, কারণ জানি যে কোন মানুষই ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে তা জানতে পারে না। বহু শক্তিই ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করে। কে. টি. কেলারকে যদি বলতাম তিনি দার্শনিক তাহলে বোধহয় তিনি অস্বস্তিতে পড়তেন, কারণ তিনি একজন ভালো ব্যবসায়ী। এসত্ত্বেও কিন্তু তিনি উনিশ শতক আগে, এপিক্টেটাস রোমে যে দর্শনের কথা বলেছিলেন সেই কথাই বলেছেন। এপিক্টেটাস বলেছিলেন: 'সুখ লাভের একটাই পথ আছে আর তা হলো আমাদের ক্ষমতার বাইরে যা আছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা না করা।'

সারা বার্নহার্ট যার নাম 'ঐশ্বরিক সারা'—তিনি জানতেন কি ভাবে অবশ্যম্ভাবীকে মানিয়ে নিতে হয়। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে চারটে মহাদেশের মঞ্চে তিনি সকলের হৃদয় জয় করে রাণীর মত রাজত্ব করেছিলেন—তিনি ছিলেন দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় অভিনেত্রী। তাঁর সত্তর বছর বয়সের সময় তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীনা হয়ে যান। সেই সময় তাঁর চিকিৎসক, প্যারীর প্রফেসর পোৎসী তাঁকে জানালেন তাঁর একটা পা কেটে বাদ দিতে হবে কারণ আটলান্টিক পার হতে গিয়ে জাহাজে পড়ে পায়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। এবং তার পায়ের শিরা ফুলে যায়। পা কুঁচকে যায়। তাতে এমনই যন্ত্রণা হতে থাকে যে ডাক্তার পা বাদ দিতে চান। ডাক্তার কথাটা তাঁকে জানাতে ভয় পান, কেননা ঐশ্বরিক সারা কিভাবে তা গ্রহণ করবেন জানা ছিল না। সারা ভেবেছিলেন তিনি হয়তো হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হবেন। কিন্তু তাদের ভুলই হয়। সারা শান্তভাবে তাকিয়ে থেকে বলেন, 'এটা যদি করতেই হয় তাহলে করতে হবে'। এই হল ভাগ্য।

তাঁকে যখন হুইল চেয়ারে করে অপারেশন কামরায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তাঁর ছেলে কাঁদছিল। তিনি তাকে ডেকে বেশ হাসিমুখেই বলেন: 'একটু দাঁড়াও, আমি এখনই ফিরব।'

অপারেশন কক্ষে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর একটা নাটক থেকে আবৃত্তি করতে থাকেন। একজন তাঁর কাছে জানতে চায় নিজের মন প্রফুল্ল রাখার জন্যই তিনি আবৃত্তি করছেন কিনা। তিনি উত্তর দেন: 'না, ডাক্তার আর নার্সকে প্রফুল্ল রাখার জন্য। ওদের মনের উপর অনেক চাপ পড়বে, তাই।'

অপারেশন থেকে সেরে ওঠার পর সারা বার্নহার্ট সারা বিশ্ব ঘুরে আরও সাত বছর ধরে মানুষকে মোহিত করেন।

রীডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকায় এলসি ম্যাককরমিক লিখেছিলেন, আমরা যখন অবশ্যম্ভাবীর সঙ্গে লড়াই করা ছেড়ে দিই তখন নতুন শক্তির জন্ম হয়ে আমাদের জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।'

কোন লোকই এমন শক্তিশালী হতে পারে না যে অবশ্যম্ভাবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে

পারে আর বাকি ক্ষমতায় নতুন জীবন গড়ে তুলতে পারে। যে কোন একটাকেই গ্রহণ করতে হবে। অবশ্যম্ভাবী ঝড়, শিলা বৃষ্টি মেনে নিলে আপনি বেঁকে পড়তে পারেন কিন্তু তাকে প্রতিরোধ করতে গেলে একেবারে ভেঙে পড়বেন।

মিসৌরীর এক খামারে আমি ব্যাপারটা ঘটতে দেখেছি। ঐ খামারে আমি অনেক গাছ লাগিয়ে ছিলাম। প্রথমে তারা বেশ দ্রুত বেড়ে উঠলো। তারপর একদিন তুষারপাত গাছের সব ডাল ঢেকে ফেলল। বোঝার ভারে গাছগুলো না নুইয়ে পড়ে গর্বের সঙ্গে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা চালালো তারপর ভারের ফলে ভেঙে পড়লে সবগুলোকে কেটে ফেলতে হল। গাছগুলো উত্তরাঞ্চলের গাছের মত জ্ঞান অর্জন করতে পারে নি। আমি কানাডার চিরসবুজ অরণ্য এলাকায় শত শত মাইল ঘুরেছি। কোথাও দেখিনি কোন স্প্রুস বা দেবদারু গাছ ভেঙে পড়েছে। কারণ ওই চিরসবুজ গাছগুলো জানে কিভাবে নিজেকে বাঁকাতে হয় আর অবশ্যম্ভাবীতাকে কিভাবে মেনে নিতে হয়।

জুজুৎসু শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদের বলে থাকেন; উইলো গাছের মতই নিজেকে বাঁকাবে, ওক গাছের মত প্রতিরোধ করবে না।'

গাড়ির চাকা কি ভাবে খারাপ রাস্তার ধাক্কা সামলায় জানেন? প্রথমে যে চাকা বানানো হয়েছিল সেটা রাস্তার ধাক্কা সামলাতেই দেখা যায় সব চাকাই টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এরপর তাই এমন চাকা বানানো হলো যাতে ধাক্কা সামলাতে পারে। জীবনের ক্ষেত্রেও একই কথা।

আমরা যদি জীবনের ধাক্কাকে হজম না করে বাধা দেবার চেষ্টা করি তাহলে কি ঘটবে? আমরা উইলোর মত নমনীয় না হয়ে যদি ওকের মত শক্ত হতে চাই? এতে এক বিরাট অন্তর্দ্বন্দ্বে পতিত হব আর এর ফলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ক্লান্ত, অসুস্থ হয়ে পড়ব।

আমরা যদি আরও অগ্রসর হয়ে কঠিন বাস্তবকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের মনে গড়া কোন স্বপ্নময় জগতে প্রবেশ করি তাহলে আমরা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যাব।

যুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ সেনা এই অবশ্যম্ভাবীকে হয় মেনে নিয়েছে বা ভেঙে পড়ছে। এ ব্যাপারে একটা উদাহরণ দেখা যাক। নিউইয়র্কের উইলিয়াম কাসেলিয়াসের কাছ থেকে যা বিবরণ পাই তা এই রকম:

'উপকুল রক্ষী বাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর আমাকে আতলান্তিকের এপারের সবচেয়ে বিপজ্জনক একটা কাজ দেওয়া হয়। আমাকে বিস্ফোরক দ্রব্যের দেখাশোনার ভার দেওয়া হয়। একবার ব্যাপারটা ভাবুন! আমি! যে কিনা সামান্য বাজি বিক্রীর কাজ করে তাকে বিস্ফোরক তদারকির ভার দেওয়া হল! হাজার হাজার টন টি এন টি'র বিস্ফোরক দ্রব্যের উপর দাঁড়িয়ে আছি এই ভাবনাটাই কোন বাজি বিক্রেতার মেরুদন্ডে বরফ স্রোত বইয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। আমায় মাত্র দুদিন নির্দেশ দেওয়া হল। তাতে যা শিখলাম আমার ভয় আরও মাত্রা ছাড়ালো। আমার প্রথম দায়িত্বের কথা ভুলব না। এক কুয়াশাময়, অন্ধকার দিনে আমাকে নিউজার্সির ক্যাভেন পয়েন্টে খোলা জায়গায় পাহারায় পাঠানো হল।

'আমার কাজ ছিল জাহাজে পাঁচ নম্বর গর্তে পাহারা দেওয়া। আমাকে সেখানে আরও পাঁচজন লোকের সঙ্গে কাজ করতে হত। তাদের পিঠ বেশ শক্ত ছিল, তবে বিস্ফোরক সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তাদের ছিল না। তারা জাহাজের গর্তে বিস্ফোরক বোঝাই করত, যেগুলোর প্রতিটায় এক টন টি এন টি—ওই জাহাজটাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার পক্ষে তা যথেষ্ট। ওই বিস্ফোরক নামানো হত দুটো তারের সাহায্যে। আমি নিজেকে বলতাম: 'ধর, ওই তারের একটা যদি ছিঁড়ে যায়, তাহলে কি ঘটবে? আমি ভয়ে কাঠ হয়ে থাকতাম। আমার গলা শুকিয়ে আসতো। এমন কাঁপুনি ধরতো যে হাঁটুতে লেগে যেত। বুক ধড়াস ধড়াস করত। তবু আমি পালাতে পারতাম না। তার অর্থ হত অপরাধ। এতে আমার মান থাকতো না—আমার বাবা মারও অপমান হত—পালানোর জন্য আমাকে গুলি করাও হতে পারতো। পালানোর উপায় না থাকায় আমি থেকে গেলাম। আমি চেষ্টা করে হালকা ভাবে লোকগুলোকে বিস্ফোরক নামাতে দেখতাম এরপর। এই রকম মেরুদণ্ড শীতল করা ভয়ের একঘন্টা পর আমি সাধারণ বুদ্ধি কাজে লাগালাম। তাই নিজেকে বললাম: দেখ, মনে করো তুমি বিস্ফোরণে উড়ে গেছো! তাতে হলোটা কি? এর পার্থক্য তো টেরই পাবে না। মৃত্যু হবে খুবই সহজ। ক্যান্সারে মরার চেয়ে তা অনেক ভালো। তাই বোকামি কর না। চিরকাল তো বেঁচে থাকবে না। একাজ না করলে গুলি খেতে হবে। অতএব এই কাজকেই ভালো লাগাওনা কেন?

'ঘন্টার পর ঘন্টা নিজেকে এটা বললাম তারপরেই মন শান্ত হল। শেষ পর্যন্ত আমার দুশ্চিন্তা আর ভয় দূর হয়ে অবশ্যম্ভাবীকে মেনে নিলাম।

'আমি জীবনে এই শিক্ষা ভুলিনি। প্রতিবার যখন যা বদলাতে পারবো না ভেবে কোন দুশ্চিন্তায় পড়েছি তখনই বলেছি 'এটা ভুলে যাও। এতে সাধারই কাজ হয়েছে।

যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা ছাড়া পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত মৃত্যু হচ্ছে সক্রেটিসের মৃত্যু। আজ থেকে দশ হাজার শতাব্দীর পরেও মানুষ প্লেটোর লেখা ওই বর্ণনা পড়বে—সাহিত্যের অসামান্য আবেগময় সুন্দর এক বর্ণনা। এথেন্সের কিছু লোক—সক্রেটিসের উপর ঈর্ষান্ধ আর হিংসাকাতর হয়ে তার সম্বন্ধে নানা অভিযোগ এনে তার বিচার করে প্রাণদণ্ড দিয়েছিল। কারারক্ষক বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন, তিনি সক্রেটিসকে বিষের পাত্র তুলে দিয়ে বলেন অবশ্যম্ভাবীকে হালকাভাবেই গ্রহণ করুন।' সক্রেটিস তাই করেছিলেন। তিনি মৃত্যুকে যেরকম শান্তভাবে আর অবশ্যম্ভাবী হিসেবে গ্রহণ করেন যে তা স্বর্গীয় হয়ে উঠেছিল।

'অবশ্যম্ভাবীকে হালকাভাবেই গ্রহণ করুন' কথাটা উচ্চারিত হয় খ্রীষ্টের জন্মের ৩৯৯ বছর আগে। কিন্তু আজকের পুরনো এই জটিল পৃথিবীর পক্ষে কথাটার প্রয়োজন অনেক বেশি।

গত আট বছরে আমি দুশ্চিন্তা দূর করার বিষয়ে প্রচুর বই আর পত্র পত্রিকা পাঠ করেছি। আপনার কি জানার বাসনা আছে দুশ্চিন্তা দূর করার বিষয়ে কোন উপদেশ

আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে ? তাহলে বলছি শুনুন—কথাটায় মাত্র সাতাশটা শব্দই আছে। এটা এমনই মূল্যবান যে আমাদের প্রত্যেকের বাথরুমের আয়নার সামনে ঝুলিয়ে রাখা উচিত যাতে রোজই চোখে পড়ে। এই অমূল্য প্রার্থনাটি লিখেছিলেন নিউ ইয়র্কের ব্যবহারিক খ্রীস্টধর্মের অধ্যাপক ডঃ রেইনহোল্ড নাইবুর। সেটি এই রকম :

'ঈশ্বর আমাকে সেই শক্তি দিন যাকে বদল করতে পারবো না তাকে যেন মেনে নিতে পারি। আর যা বদল করতে পারি তা করার সাহস দিন, আর আমি যেন এই দুটির পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।'

তাই দুশ্চিন্তা দূর করার চার নম্বর নিয়ম হল : 'অবশ্যম্ভাবীর সঙ্গে সহযোগিতা করুন।'

॥ দশ ॥

বৃথা দুশ্চিন্তা বন্ধ করুন

ওয়াল স্ট্রীটে টাকা রোজগারের উপায় জানতে চান কি? অবশ্য লক্ষ লক্ষ মানুষই এটা জানতে উৎসুক—এর উত্তরটা আমার জানা থাকলে এই বই প্রতি কপি দশ হাজার ডলারে বিক্রি হত। যাইহোক একটা কৌশলই সকল ফাটকাবাজরা কাজে লাগায়, এ কাহিনী আমায় শুনিয়েছিলেন চার্লস্ রবার্ট নামে এক কারবারী।

চার্লস্ রবার্ট বলেছিলেন, 'আমি টেক্সাস থেকে নিউ ইয়র্কে বন্ধুদের দেওয়া বিশ হাজার ডলার নিয়ে স্টক মার্কেটে লগ্নী করতে যাই। আমার ধারণা ছিল স্টক মার্কেটের কায়দা কানুন সবই আমার জানা। এও সত্যি কিছু লগ্নিতে আমার লাভও হলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই খুইয়ে বসলাম'

মিঃ রবার্ট বলেছিলেন, 'আমার নিজের টাকা গেছে বলে কিছু ভাবিনি', 'তবে আমার বন্ধুদের টাকা নষ্ট হওয়ায় দারুণ দুঃখ হলো যদিও সে ধাক্কা সামলানোর ক্ষমতা তাদের ছিল। ওই ক্ষতির পর আমি তাদের সামনে যেতেই ভয় পাচ্ছিলাম। কিন্তু তারা বেশ সহজভাবেই ব্যাপারটা গ্রহণ করল এবং আরও কিছু টাকা দিল ফাটকাবাজারে লাগানোর উদ্দেশ্যে।

'আমি জানতাম আমি প্রায় অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছিলাম। আমাকে নির্ভর শীল থাকতে হচ্ছিল কিছুটা ভাগ্য আর অন্য লোকের মনের উপর।

আমি আমার ভুল সম্পর্কে ভাবলাম আর ঠিক করলাম আবার কাজে নামার আগে সব ব্যাপারটা যাচাই করবো। তাই শেষ পর্যন্ত ফাটকাবাজারের সবচেয়ে বিখ্যাত মানুষ বার্টন এন. ক্যাসেলকে খুঁজে বের করে পরিচয় করলাম। আমি ভাবলাম ভদ্রলোক দীর্ঘকাল ফাটকাবাজারে ভাগ্যের জোরে জেতেননি। তাই তাঁর সব কৌশল আমার জানতে ইচ্ছে হল।

'তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন আমি আগে কেমন ভাবে কারবার করেছি—তা শোনার পর তিনি আমায় চমৎকার একটা পরামর্শ দিলেন। তিনি বলেন, 'বাজারে টাকা ছাড়লে আমি সব সময়েই বলে দিই 'ক্ষতি-বন্ধ' করতে। ধরা যাক আমি পঞ্চাশ ডলারের কোন শেয়ার কিনতে হলে বলে দিই শেয়ারের দাম প'য়তাল্লিশ ডলার হলেই তা বিক্রি করে দিতে হবে। এতে ক্ষতি হবে মাত্র পাঁচ ডলার।

'প্রথমেই যদি আপনি চিন্তা করে শেয়ার কেনেন তাহলে আপনার লাভ হবে গড়পড়তা, দশ, পঁচিশ বা পঞ্চাশ পয়েন্টই। ক্ষতিকে যদি পাঁচ পয়েন্টের মধ্যেই রাখা যায় তাহলেও প্রচুর লাভ করা যাবে।'

'আমি সঙ্গে সঙ্গেই ওই কৌশল কাজে লাগালাম। এর ফলে আমার হাজার হাজার ডলার লাভ হয়েছে।'

কিছুদিন পরে টের পেলাম 'ওই 'ক্ষতি-বন্ধ' ব্যাপারটা কেবল স্টক মার্কেট ছাড়াও অন্যান্য ব্যাপারেও কাজে লাগানো যায়। আমি এরপর থেকে অর্থনৈতিক ব্যাপার ছাড়াও অন্যান্য দুশ্চিন্তাতেও এটা কাজে লাগাই। এতে যাদুর মত কাজ হয়েছে।

একটা উদাহরণ দিই। আমি প্রায়ই এক বন্ধুর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সমাধা করতাম বন্ধু প্রায়ই মধ্যাহ্নভোজ অর্ধেক শেষ হবার মুখে দেরী করে আসতেন। শেষ পর্যন্ত আমি সেই 'ক্ষতি-বন্ধ' নীতি কাজে লাগালাম। তাকে বললাম, 'ভাই, বিল, আমি তোমাকে ঠিক দশ মিনিট সময় দেব। দশ মিনিট পরে এলে আমাকে আর পাচ্ছোনা।

ওহ্! কেন যে একথাটা আগে ভাবিনি। এই 'ক্ষতিবন্ধ' নিয়মের ফলে আমার অধৈর্য ভাব, মেজাজ, অনুশোচনা ইত্যাদি সব মানসিক ব্যাপারে কত সুবিধেই না হত আমার যখন সব শান্তি নষ্ট হয়েছে তখন কেন যে অবস্থা বুঝে নিজেকে বলিনি : 'ওহে ডেল কার্নেগী, এ ব্যাপারে ঠিক এতোটাই সময় নষ্ট করা চলতে পারে, তার বেশি নয়…। কেন যে তা করিনি ?

যাই হোক, অন্ততঃ একবার নিজের বুদ্ধির জন্য নিজেকে তারিফ করতে পেরেছি। আর ব্যাপারটা অত্যন্ত মারাত্মকই ছিল—সেটা আমার জীবনের একটা সঙ্কটকাল। তখন আমি আমার বহু বছরের কাজ ও স্বপ্নকে ধূলিসাৎ হতে দেখেছি। এটা হয় এই ভাবে। আমার ত্রিশ বছরের কাছাকাছি বয়সে আমি উপন্যাস লিখে জীবন কাটাব ভেবেছিলাম। আমি হতে চাইছিলাম দ্বিতীয় ফ্রাঙ্ক নরিস, বা জ্যাক লন্ডন বা টমাস হার্ডি হতে। আমার এমনই আগ্রহ ছিল যে দুবছর ধরে, যুদ্ধের পরবর্তীকালে ইউরোপে থেকে সস্তায় বই লিখে কাটালাম। বিরাট একখানা বই—নাম দিই 'তুষার ঝড়'। নামটা পছন্দসই হয়েছিল বলাই বাহুল্য, কারণ প্রকাশকদের কাছে সেটা বেশ ঠাণ্ডা অভ্যর্থনাই পায়। এমন তুষার মাখা ঠাণ্ডা যে বোধহয় ডাকোটা রাজ্যেও কেউ দেখেনি। আমার প্রকাশক যখন বললেন লেখাটা কিছুই হয়নি অর্থাৎ আমার কোন সাহিত্যিক গুণ নেই—অন্ততঃ উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে। এই কথা শোনার পর আমার হৃৎপিণ্ড প্রায় থমকে যায়। একটা ঘোরের মধ্য দিয়েই আমি অফিসের বাইরে এসেছিলাম। আমায় তিনি যদি একটা ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করতেন তাহলেও বোধ হয় এতোটা লাগতো না। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমি এটাই বুঝলাম জীবনের একটা সন্ধিস্থলে এসে পৌঁছেছি এবং নিশ্চিত একটা কিছু ঠিক করতে হবে। কি করা উচিত আমার ? কোন পথে যাব ? ওই ঘোর কাটতে প্রায় সপ্তাহ কাবার হয়ে গেল। দুশ্চিন্তার ক্ষেত্রে তখন ওই 'ক্ষতি-বন্ধ' কথাটা শুনিনি। এখন অতীতের কথা ভাবলে দেখতে পাই ঠিক তাই করেছিলাম। দুবছরের পরীক্ষার ফলে যা পেয়েছিলাম তাকে মনে করলাম একটা মহান পরীক্ষা মাত্র—সেখান থেকে নতুন পথে মোড় ফিরালাম। আমি আবার আমার আগেকার বয়স্ক-শিক্ষার ক্লাসে ফিরে আমি আমার জীবনী লেখায় মন দিই—জীবনী আর প্রবন্ধ লেখার কাজ, যেমন এই বইটিতে এখন যা আপনারা পড়ছেন।

ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বলে কি আমি আনন্দিত হই ? আনন্দিত ? যতবারই কথাটা ভাবি ততবারই রাস্তায় হাত তুলে নাচতে ইচ্ছে হয়। সত্যি কথা বলতে গেলে

টমাস হার্ডি হতে পারিনি বলে, এরপর একবারের জন্যও ভাবনা হয়নি।

এক শতাব্দী আগে ওয়ালডেন জলাশয়ের কাছে যখন একটা প্যাঁচা কর্কশ ধ্বনি তুলেছিল হেনরি থোরো তাঁর হাঁসের পালকের কলম আর নিজের বানানো কালিতে তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন : 'কোন জিনিসের দাম জীবনের একটা অংশেরই সমান—তা সেই দাম এখনই বা পরে যখনই দিতে হোক।'

অন্যভাবে বললে বলতে হয় কোন জিনিসের যখন আমাদের অস্তিত্ব দিয়ে দাম দিই সেটা হয় অত্যন্ত বেশিই দাম দেওয়া।

অথচ গিলবার্ট আর স্যুলিভান ঠিক তাই করেছিলেন। তাঁরা জানতেন কেমন করে হাসির কথা আর গান সৃষ্টি করতে হয়—কিন্তু তাঁরা নিজেদের জীবনে কিভাবে আনন্দ আনতে হয় তা জানতেন না। বেশ মজার কিছু গীতিনাট্য তাঁরা রচনা করেন। যেমন, পেশেন্স, পিনাফোর আর মিকাডো। কিন্তু তাঁরা নিজেদের মেজাজ ঠিক রাখতে পারতেন না। সামান্য একখণ্ড কার্পেটের দাম নিয়ে তাঁরা সারা জীবন তিক্ত করে তোলেন। স্যুলিভান তাঁদের থিয়েটারের জন্য একটা কার্পেটের অর্ডার দেন। গিলবার্ট যখন বিলটা দেখলেন তখন একদম রাগে ফেটে পড়লেন। ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গেল—আমৃত্যু তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নি। স্যুলিভান নতুন অপেরার জন্য গান লিখতেন আর সেটা গিলবার্টকে ডাকে পাঠিয়ে দিতেন। গিলবার্টও তাই করতেন। একবার যখন দুজনকে একসঙ্গে দর্শকদের সামনে আসতে হল দুজনে স্টেজের দুধারে পরস্পরের দিকে পিছন ফিরে অভিবাদন গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা লিঙ্কনের মত 'ক্ষতি-বন্ধ' করবার ব্যাপারটা একবারও ভাবেননি!

গৃহযুদ্ধের সময় একবার লিঙ্কনের বন্ধুরা যখন তাঁর শত্রুদের নিন্দা করছিলেন লিঙ্কন বলেন : 'সম্ভবতঃ আপনাদের মত আমার ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। খুব সম্ভবত আমার অতোটা নেই, আর মনে হয় এতে ফল ভালো হয়না। একজন লোকের জীবনের অর্ধেক সময় ঝগড়া করে কাটানোর দরকার নেই! কেউ আমায় আক্রমণ করা বন্ধ করলে আমি তার অতীত নিয়ে কখনই ভাবিনা।'

আমার এক পিসিমা আছেন, তাঁর নাম এডিথ পিসিমা। পিসিমার যদি লিঙ্কনের মত ক্ষমাশীল মন থাকতো তাহলে বড় ভালো হত। তিনি ও ফ্রাঙ্ক পিসেমশাই একটা খামারে থাকতেন। খামারটা বাঁধা দেওয়া ছিল এবং সেখানকার মাটিও খারাপ আর আগাছায় ভর্তি থাকতো। পিসিমা কিছু পর্দা ধার করে এনে বাড়িটা সাজাতে চেয়েছিলেন। ফ্রাঙ্ক পিসেমশাই ধার ভালোবাসতেন না। ধার সম্পর্কে তাঁর কৃষক সুলভ ভীতি ছিল, তাই তিনি দোকানীকে বলে দেন এডিথ পিসিমাকে যেন ধার না দেওয়া হয়। পিসিমা সেকথা জানতে পেরে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করেন। আর আশ্চর্য ব্যাপার ওই ঘটনার পঞ্চাশ বছর পরেও পিসিমা চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করতেন। গল্পটা তিনি বহুবার আমাদের শুনিয়েছেন। এডিথ পিসিমার যখন সত্তর বছর বয়স তখন আমি বলেছিলাম : 'এডিথ পিসি, পিসেমশাই অন্যায় করেছেন ঠিকই, কিন্তু পঞ্চাশ বছর পরে চেঁচিয়ে কোন লাভ আছে?'

এডিথ পিসিকে এর জন্য ঢের দামও দিতে হয়। সারা জীবন তিক্ত অভিজ্ঞতা বয়ে বেড়াতে হয়। তাঁর মনের শান্তিও তাতে নষ্ট হয়।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের যখন সাত বছর বয়স তখন তিনি এমন একটা ভুল করেন, যেটা সত্তর বছর ধরে মনে রেখেছিলেন। সাত বছর বয়সে একটা বাঁশিকে ভালোবেসে ফেললেন। তিনি এতই উত্তেজিত হলেন যে একটা খেলনার দোকানে গিয়ে জমানো সব পয়সা ঢেলে একটা বাঁশি কিনে ফেললেন। বাঁশির দাম জানার ইচ্ছেও হলোনা। তিনি সত্তর বছর পরে এক বন্ধুকে লেখেন, 'এরপর যখন বাড়ি ফিরে এলাম বাঁশিটা বাজিয়ে আনন্দে সারা বাড়ি মাতিয়ে রাখলাম। তারপর আমার দাদা দিদিরা যখন টিটকিরি দিয়ে বললেন বাঁশিটার জন্য অনেক বেশি দাম দিয়েছি তখন দুঃখে কেঁদে ভাসালাম।'

বহু বছর পরে ফ্রাঙ্কলিন যখন বিশ্ব বিখ্যাত হন আর ফ্রান্সে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত তখনও তিনি মনে রেখেছিলেন বাঁশির জন্য বেশি দাম দিয়েছিলেন আর সেটা তাকে আনন্দের চেয়ে দুঃখই দিয়েছিল।

তবে এর মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা ফ্রাঙ্কলিন পেয়েছিলেন তাতে তাঁর উপকারই হয়। তিনি তাই লিখেছিলেন, 'আমার বয়স বাড়লে যখন মানুষের ব্যবহার লক্ষ্য করলাম, তখন দেখলাম এমন বহু মানুষই আমার চেনা যারা তাদের বাঁশির জন্য বেশি দাম দিয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় মানুষের দুঃখের একটা বড় কারণ হল তারা জিনিসগুলোর আসল দাম বুঝতে পারেনা অথবা তারা তাদের বাঁশির জন্য বেশি দাম দেয়।'

গিলবার্ট আর সালিভান তাদের বাঁশির জন্য ঢের দাম দিয়েছিলেন। এডিথ পিসিমাও তাই। এমন কি ডেল কার্নেগীও বহু সময় তাই করে। আর সেই রকম করেন অমর সাহিত্যিক লেভ টলস্টয় যিনি দুটি বিখ্যাত উপন্যাস—'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' এবং 'আনা কারেনিনা' লিখেছিলেন। এনসাইক্লোপিডিয়া বিটানিকার মতানুযায়ী লিও টলস্টয় তার শেষ ত্রিশ বছরের জীবনে 'পৃথিবীতে সবচেয়ে শ্রদ্ধাস্পদ মানুষ ছিলেন।' তাঁর মৃত্যুর বিশ বছর আগে—১৮৯০ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত—তাঁর বাড়িতে তীর্থযাত্রীদের মত লোক সমাগম ঘটত। তারা একবারের জন্য অন্ততঃ তাঁকে চোখের দেখা দেখতে বা তাঁর কথা শুনতে বা তাঁর পোশাকের প্রান্ত স্পর্শ করতে চাইতো। তিনি যা বলতেন তার সবটাই নোটবইয়ে লিখে নেওয়া হত যেন তা ঐশ্বরীক বাণী। কিন্তু সাধারণ জীবন সম্বন্ধে টলস্টয় একেবারে অজ্ঞ ছিলেন। ফ্রাঙ্কলিনের সাত বছর বয়সে যে জ্ঞান ছিল তাঁর সত্তর বছর বয়সেও তা ছিলনা। আসলে এসম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞানই ছিলোনা।

যা বলতে চাই তা এই রকম। টলস্টয় যে মেয়েটিকে গভীর ভাবে ভালোবাসতেন তাকেই বিয়ে করেন। আসলে তাঁরা এতই সুখী ছিলেন যে তাঁরা হাঁটু গেড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতেন যেন তাদের এ সুখ চিরস্থায়ী হয়। কিন্তু টলস্টয় যে মেয়েটিকে বিয়ে করেন তিনি একটু ঈর্ষাপরায়ণা ছিলেন। তিনি চাষী রমণীর পোশাক পরে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে টলস্টয়ের উপর গোয়েন্দাগিরি চালাতেন। তাদের প্রচণ্ড ঝগড়া হত। তাঁর স্ত্রী এতই ঈর্ষা কাতর ছিলেন যে নিজের ছেলেমেয়েদের প্রতিও ঈর্ষা প্রকাশ করতেন।

ার বন্দুক নিয়ে মেয়ের ছবি গুলিতে ফুটো করে দেন। একবার এক বোতল আফিম ার সামনে ধরে তিনি মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করবেন বলে ভয় দেখিয়ে ন। তখন তাঁর ছেলেমেয়েরা ভয়ে এক কোনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে চলেছিল।

টলস্টয় তখন কি করতেন? ভদ্রলোক রাগে সব আসবাবপত্র ভেঙে ফেলেন বলে ন্য তাঁর উপর রাগ করতে পারছি না—সত্যিই রাগের কারণ ছিল। কিন্তু টলস্টয় ও খারাপ কাজ করেন। তিনি গোপনে একটা ডায়েরী লিখতেন! হ্যাঁ, সেই রীতে সব দোষ তিনি তাঁর স্ত্রীর উপর চাপিয়েছিলেন। ওই ডায়েরী ছিল তার ' ? তিনি ঠিক করেছিলেন পরবর্তী বংশধরদের জানিয়ে যাবেন দোষ তাঁর নয়, যাতে তাঁকে মার্জনা করে সব দোষ তাঁর স্ত্রীর বুঝতে পারে। এটা দেখে তাঁর স্ত্রী করেছিলেন শুনুন। তাঁর স্ত্রী রাগে ডায়েরীর সব পাতা ছিঁড়ে আগুন ধরিয়ে আর নিজেও একখানা ডায়েরী লিখতে সুরু করেন এবং তাতে স্বামীকে একটা ানের রূপে দেন। তিনি এ ছাড়া একটা উপন্যাসও লেখেন তার নাম দেন 'কার ' ? ওই উপন্যাসে স্বামীকে তিনি গৃহের দানব বিশেষ আর নিজেকে একজন শহীদ াবে চিত্রিত করেন।

এর পরিণতি কি হল? এই দুজনে মিলে তাদের বাড়িকে এক অস্বাভাবিক জায়গা তোলেন, টলস্টয় যাকে পাগলা গারদ নাম দেন। এসবের অবশ্যই নানা কারণ । এই সব কারণের একটা হল তারা সাধারণ সব মানুষকে প্রভাবিত করতে ছিলেন। হ্যাঁ, তারা আমাদের মত মানুষকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন। র মধ্যে আসল দোষীকে জানবার জন্য আমাদের কি কণামাত্রও মাথাব্যাথা আছে? ই নেই। কারণ আমাদের নিজেদেরই এত সমস্যা যে টলস্টয়দের ব্যাপারে মাথা ার সময় নেই। 'বাঁশির জন্য হতভাগ্য দুজন কত দামই দিয়েছেন! পঞ্চাশ বছর ন্দর্য নরকবাস—যেহেতু এদের দুজনের কেউ বলতে পারেন নি। এবার থামো!' া তাদের দুজনের কেউই বলতে পারেনি 'এবার থামা যাক—ক্ষতি বন্ধ করা যাক। রা আমাদের জীবনকে বাজে খরচ করছি। যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়!'

হ্যাঁ, আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি সত্যিকার মানসিক শান্তির মূলে রয়েছে মূল্য ন্ধ যোগ্য ধারণা। আমি বিশ্বাস করি আমাদের সব দুশ্চিন্তার শতকরা পঞ্চাশ-ই দূর করা যায় যদি এই স্বর্ণময় কথাটা মনে রাখি—জীবনের পটভূমিকায় কোন ার বিচার।

অতএব দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য ৫নং নিয়মটি হলো এই :

যখনই মানুষের জীবনের মাপকাঠির তুলনায় ভালো টাকাকে খারাপ টাকার দিকে দিই তখনই নিজেদের তিনটে প্রশ্ন করা উচিত :

১। যে বিষয়ে দুশ্চিন্তা করছি তাতে আমাদের কতখানি এসে যায়?

২। কখন আমি 'ক্ষতি বন্ধ' হিসেব করে সব দুশ্চিন্তা ভুলে যাবো?

৩। এই 'বাঁশির' জন্য কত দাম দেব? এর যা দাম তার চেয়ে কি ইতিমধ্যেই দিয়েছি?

॥ এগারো ॥

কাঠের গুঁড়ো করাত দিয়ে কাটতে চাইবেন না

এই বাক্যটা যখন লিখছি তখন জানালা দিয়ে তাকালে দেখতে পাই বাগানের প... উপর পড়ে থাকা পাথরের বুকে ডাইনোসরের পদচিহ্ন। ওই ডাইনোসরের পদ... আমি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের পীবডি যাদুঘর থেকে কিনি। এ সম্বন্ধে সেখান... কিউরেটরের একখানা চিঠিও পেয়েছি তাতে তিনি বলেছেন ওই পদচিহ্ন আঠারো কে... বছর আগের। কোন মোঙ্গলিয়ান আকাট মূর্খও ভাববে না আঠারো কোটি ব... আগে ফিরে গিয়ে ওই পদচিহ্নের পরিবর্তন করা সম্ভব। কিন্তু একশ আশি সেকে... আগে যা ঘটে গেছে তাকেও তো বদলানো অসম্ভব—অথচ আমাদের মধ্যে ... সেই চেষ্টা করেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমরা একশ আশি সেকেন্ড আগে... কাজের ফলাফল হয়তো কিছুটা পরিবর্তন করতে পারি—কিন্তু কিছুতেই ... ঘটনাকে বদল করতে পারি না।

ভগবানের রাজত্বে একটা মাত্র পথেই গঠনমূলক ভাবে অতীতকে গ্রহণ করা যে... পারে। আর তা হল অতীতের ভুলকে শান্তভাবে বিশ্লেষণ করে তা থেকে উপকার ল... করা—এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন অতীতকে বিস্মৃত হওয়া।

আমি জানি এটা সত্য, কিন্তু আমার কি তা মেনে নেওয়ার মত সাহস বা জ্ঞ... থাকে? এর উত্তর দিতে হলে বেশ কবছর আগে যে অদ্ভূত অভিজ্ঞতা লাভ করি ... কথা শোনাতে দিন। আমি এক পেনিও লাভ না করে লক্ষ লক্ষ ডলার নিজের হা... মধ্য দিয়েই নষ্ট করি। ব্যাপারটা এইভাবে ঘটে: আমি বয়স্ক শিক্ষার এক বি... ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলাম, নানা শহরে শাখাও খুলেছিলাম, নানা ভাবে বিজ্ঞাপন ... অফিসের পিছনে খরচও করেছিলাম। শিক্ষাদানে আমি এমনই ব্যস্ত ছিলাম যে টা... পয়সার দিকে নজরই দিতে পারিনি। আমি এতই অপরিণত ছিলাম যে খর... দিকটা দেখার জন্য যে একজন ব্যবসায় পাকা ম্যানেজার রাখা দরকার সেটা বুঝ... পারিনি।

শেষ পর্যন্ত প্রায় একবছর পরে মারাত্মক একটা অবস্থা টের পেলাম। দেখল... প্রচুর আয় হওয়া সত্বেও লাভ কিছুমাত্র হয়নি। এটা আবিষ্কারের পর দুটো জি... আমার করা উচিত ছিল। প্রথমতঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার যিনি বিখ্যাত এক... নিগ্রো বিজ্ঞানী—যা করেছিলেন তাই করা উচিত। অর্থাৎ একটা ব্যাঙ্ক ফেল মার... তার সারা জীবনের সঞ্চয় চল্লিশ হাজার ডলার জলে গেলে তিনি যা করেছিলেন। কে... যখন তাকে প্রশ্ন করত যে তিনি দেউলিয়া সেকথা জানেন কিনা—তিনি জবাব দিতে... 'হ্যাঁ সেরকম শুনেছি বটে'। তিনি তারপর তাঁর শিক্ষকতা চালিয়ে গেলেন। তি...

তাঁর ক্ষতির ব্যাপারটা মন থেকে একদম সরিয়ে দিয়েছিলেন। একবারের জন্যও আর ভাবতে চাননি।

দ্বিতীয় আর একটা কাজ আমার করণীয় ছিল: আমার উচিত ছিল আমার ভুলগুলো বিশ্লেষণ করা আর একটা স্থায়ী শিক্ষা পাওয়া।

সত্যি বলতে কি এদুটোর কোনটাই আমি করিনি। তার বদলে মারাত্মক দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে পড়ি। কয়েক মাস যাবৎ একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। আমি ঘুমোতে পারিনি, আমার ওজনও কমে গেল। একটা শিক্ষালাভ করার বদলে একই কাজ করে আবার অল্প টাকা খোয়ালাম?

এতসব বোকামির কথা স্বীকার করাটা সুখের হয়। তবে একটা ব্যাপার বেশ আগেই শিখেছি যে বিশজনকে শেখানো সহজ কিন্তু বিশজনের হয়ে একজন পালন করা সহজ নয়।

নিউ ইয়র্কের জর্জ ওয়াশিংটন হাই স্কুলের ডঃ পল ব্র্যান্ডওয়াইনের কাছেই আমার শিক্ষা নেয়া উচিত ছিল। তিনি অ্যালেন সন্ডার্স নামে একজনকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। মিঃ সন্ডার্স আমাকে বলেছিলেন যে ডঃ ব্র্যান্ডওয়াইনের স্বাস্থ্যের ক্লাসে এক মহামূল্যবান শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি বলেন: 'আমার বয়স তখন অল্পই। তবুও বড্ড দুশ্চিন্তা করতাম। যেসব ভুল করতাম তা ভেবে আমার অস্বস্তি আর রাগ হত। পরীক্ষা দেওয়ার পর জেগে থেকে আঙুল কামড়ে চলতাম পাছে পাশ না করি। সব সময় যা করতাম তা নিয়ে ভাবতাম আর অন্যরকম করলে ভালো হত মনে করতাম। বারবার যা করেছি তা রোমন্থন করতাম।

এরপর একদিন বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীতে সবাই ক্লাস করতে গেলাম। সেখানে ডঃ ব্র্যান্ডওয়াইন ছিলেন। তাঁর ডেস্কের উপর রাখা ছিল এক বোতল দুধ। আমরা অবাক হয়ে ভাবলাম দুধ দিয়ে কি হবে। আচমকা তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বোতলটা বেসিনের মধ্যে ফেলে দিলেন আর চেঁচিয়ে বলে উঠলেন: 'পড়ে যাওয়া দুধ নিয়ে অনুশোচনা করোনা!'

'এরপর তিনি আমাদের সকলকে ডেকে দেখালেন সব দুধ নর্দমায় চলে গেছে। তিনি এবার বললেন: 'ভালো করে দেখ সবাই। কারণ আমি চাই এই কথাটা সারাজীবন মনে রাখবে। দুধটা পড়ে গেছে—আর তাকে নর্দমা থেকে তুলে আনতে পারবে না। এক ফোঁটাও না। একটু সাবধান থাকলে দুধটা বোধ হয় বাঁচানো যেত, কিন্তু এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে—এখন যা করণীয় তা হল এর কথা ভুলে যাওয়া।'

অ্যালেন সন্ডার্স আমায় আরও বলেছিলেন, 'এই ছোট্ট ঘটনাটা আমি লাতিন আর জ্যামিতি ভুলে যাওয়ার পরেও মনে রেখেছি। আসলে হাই স্কুলে চার বছর পড়ে যা শিখেছি তার চেয়ে ঢের বেশি ওই ঘটনা থেকে শিখেছিলাম। এতে শিখি দুধ যাতে না পড়ে যায়, তবে তা পড়ে গেলে আর যেন মাথা না ঘামাই।'

কোন কোন পাঠক হয়তো ভাবতে পারেন 'দুধ পড়ে গেলে অনুশোচনা করোনা'

প্রবাদটা নিয়ে বড় বেশি রকম আলোচনা করছি। আমি জানি এটা অতি সাধারণ প্রবাদ, একদম বস্তাপচা। তবু আমি জানি এই বস্তাপচা প্রবাদের মধ্যে যুগ যুগের সঞ্চিত জ্ঞান রয়ে গেছে। এগুলো মানুষের অতীতের লভ্যজ্ঞান থেকে হাজার হাজার বছরের মধ্য দিয়ে এসেছে। বহু পুরনো আনন্দ থেকে যেসব প্রবাদ চলে আসছে তার সবগুলো পড়তে গেলে এইদুটো প্রবাদের প্রকৃতই কোন তুলনা মেলে না: 'কোন সেতু না আসা পর্যন্ত সেটা অতিক্রম করার চেষ্টা কোরোনা' বা 'গড়িয়ে যাওয়া দুধ নিয়ে অনুশোচনা কোরোনা'। আমরা যদি ওই প্রবাদ দুটো কাজে লাগাতাম তাহলে এই বই পড়ার কোন দরকারই হতোনা। আসলে প্রাচীন প্রবাদগুলো যদি আমরা মেনে চলতাম তাহলে মহাসুখেই জীবন কাটাতে পারতাম। তা যাইহোক জ্ঞানকে যতক্ষণ না কাজে লাগানো যায় ততক্ষণ তার দাম নেই। আর এ বইয়ের মধ্য দিয়ে আপনাদের নতুন কিছু বলতে চাইছি না। এ বইয়ের উদ্দেশ্য হল আপনাদের জানা কথাই আবার মনে করিয়ে দেওয়া। যাতে আপনারা তাকে কাজে লাগাতে উদ্বুদ্ধ হন।

প্রয়াত ফ্রেড ফুলার শেডের মত মানুষকে আমার বেশ লাগতো, তিনি পুরনো কথাকে বেশ নতুন করে বলতে পারতেন। তিনি ফিলাডেলফিয়া বুলেটিনের সম্পাদক ছিলেন। তিনি ক্লাসে একবার বলেছিলেন: 'তোমরা কতজন করাত দিয়ে গাছ কেটেছো? দেখি তোমাদের হাত।' দেখা গেল অনেকেই তা করেছে। এরপর তিনি বললেন: 'তোমরা কতজন করাত দিয়ে কাঠের গুঁড়ো কেটেছো?' কোন হাতই কেউ তুললোনা।

মিঃ শেড তখন বললেন: 'অবশ্যই কাঠের গুঁড়ো করাতে কাটতে পারবে না। এটাতো আগেই কাটা হয়ে যায়। অতীতেরও তাই ব্যাপার। অতীতে যা ঘটে গেছে তা নিয়ে যখন দুশ্চিন্তা মগ্ন হও তখন করাতে কাঠের গুঁড়ো কাটাই হয়।'

কিছুদিন আগে জ্যাক ডেম্পসির সঙ্গে আমি ডিনার খেয়েছিলাম। টুনির কাছে তিনি যে ভাবে হেরে যান সে ঘটনার কথা আমাকে শোনান তিনি। হেভিওয়েট প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে তাঁর সম্মানে দারুণ লেগেছিল। তিনি আমাকে বলেন: 'সেই লড়াইর মাঝখানে আমার হঠাৎ মনে হল বুড়ো হয়ে পড়েছি...দশ রাউণ্ডের শেষে যদিও সোজা দাঁড়িয়ে ছিলাম তবে তার বেশি কিছু করার শক্তি আমার ছিল না। আমার সারা মুখ ক্ষত বিক্ষত চোখ প্রায় বুজে গিয়েছে। দেখতে পেলাম রেফারি বিজয়ী হেসেবে জিন টুনির হাত তুলে ধরেছেন আমি আর বিশ্বজয়ী নই! আমি বৃষ্টির মধ্য দিয়ে লোকজনের ভিড় ঠেলে আমার সাজঘরে ফিরে এলাম। তখনই দেখলাম দর্শকদের কেউ আমার হাত ধরার চেষ্টা করছে, কারও বা চোখে জল।

'একবছর পর আবার টুনির সঙ্গে লড়লাম। তবে করার কিছুই আর ছিল না। চিরকালের জন্যেই আমি শেষ হয়ে গিয়েছিলাম। দুশ্চিন্তা না করে উপায় ছিল না তবুও নিজেকে বললাম: 'পড়ে যাওয়া দুধ নিয়ে মাথা ঘামাবো না। ঘুসির জন্য গাল পেতে দিলেও মাটিতে পড়বো না।'

জ্যাক ডেম্পসি ঠিক তাই করেছিলেন। কিভাবে জানেন? বারবার নিজেকে এই

কথা বলে, যা ঘটে গেছে তার জন্য শোক করব না।' না, তাহলে তাঁর অতীত নিয়ে চিন্তা আরও বেড়ে যেত। তিনি নিজের পরাজয় মেনে নিয়ে ভবিষ্যত নিয়ে পরিকল্পনা করতে সুরু করলেন। তিনি ব্রডওয়েতে জ্যাক ডেম্পসি রেস্তোঁরা আর গ্রেট নর্দার্ন হোটেল খুললেন। তিনি এসব করলেন মুষ্টিযুদ্ধ পরিচালনা আর প্রদর্শনী করে। এই সব করার কাজে তিনি এমনই ব্যস্ত হয়ে রইলেন যে দুশ্চিন্তা করার সময় তার আর রইল না। জ্যাক ডেম্পসি বলেছিলেন : গত দশ বছর আমি এত আনন্দে ছিলাম যে চ্যাম্পিয়ান হয়েও তা পাইনি।'

মিঃ ডেম্পসি আমায় বলেছিলেন যে তিনি আমার বই পড়েননি তবে তিনি শেকসপীয়ারের এই উপদেশ মেনে চলতেন : 'বুদ্ধিমান মানুষরা কখনও তাদের ক্ষতি নিয়ে ভাবতে চাননা বরং খুশি মনে এর ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চেষ্টা করেন।'

ইতিহাস আর জীবনীমূলক বই যখন পড়ি তখন ওই সব মানুষের কষ্টকর অবস্থার কথা পর্যালোচনা করি। আমি অবাক হয়েছি বিপদে এবং দুশ্চিন্তায় তারা কিভাবে দুঃখ দুর্দশাকে ভুলে নতুন উদ্যমে পরম সুখে দিন কাটিয়েছেন।

আমি একবার সিং সিং কারাগারে কয়েদীদের দেখতে যাই। সেখানে গিয়ে আমি অবাক হয়ে দেখেছিলাম সেখানকার কয়েদীরা বাইরের সাধারণ মানুষেরই মত সুখী। আমি কথাটা ওখানকার ওয়ার্ডেন লুইস ই লসকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন কয়েদীরা যখন প্রথম সিং সিং এ আসে তারা স্বভাবতই ভেঙে পড়ে আর দুঃখিত বোধ করে। কিন্তু কয়েক মাস পরে ওদের মধ্যে বুদ্ধিমান যারা তারা নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা ভুলে গিয়ে শান্তভাবে জেলখানার জীবন যাপন মেনে নেয়। ওয়ার্ডেন লুইস লস আমাকে বলেছিলেন একজন কয়েদী জেলখানার মধ্যেই গান গাইতে গাইতে চাষ বাস করত।

সে কয়েদীটি ফুলের বাগান তৈরি করত আর গান গাইত আমাদের অনেকের চাইতেই তার বুদ্ধি বেশি ছিল। সে জানতো—

চলমান অঙ্গুলি যে লিখে চলে দ্রুত
লেখা হলে থামেনা সে, ভাবেনা সতত,
যা কিছু হলো লেখা মোছেনা তখনও
শত অশ্রুজল তাতে পারেনা কখনও।

তাই অশ্রুজল ফেলে লাভ কি? আমরা নিশ্চয়ই ভুল করেছি—অবিশ্বাস্য কাজও করেছি! কিন্তু তাতে হলো কি? এরকম কে না করে? নেপোলিয়ানও একদিন তার করা সমস্ত বড় যুদ্ধের এক তৃতীয়াংশ হেরে যান। সম্ভবতঃ আমাদের গড়পড়তা কাজ নেপোলিয়ানের চেয়ে খারাপ নয়, কে বলতে পারে?

আর যাই হোক রাজার সমস্ত ঘোড়া আর সৈন্য অতীতকে ফিরিয়ে আনতে পারেনা। অতএব আসুন ৭ নম্বর নিয়মটা মনে রাখি :

'করাত দিয়ে কাঠের গুঁড়ো কাটতে চাইবেন না'

॥ বারো ॥

যে শব্দ কটি আপনার জীবনের মোড় ফেরাতে পারে

ক'বছর আগে এক বেতার অনুষ্ঠানে আমাকে এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে বলা হয় 'জীবনে সবচেয়ে বড় কোন্ শিক্ষা লাভ করেছেন আপনি ?'

ব্যাপারটা বলা নেহাতই সহজ ছিল। সবচেয়ে বড় যা শিখেছি তা হল আমরা চিন্তা করি তার গুরুত্ব। আমি যদি জানি আপনার চিন্তাধারা কেমন তাহলে বুঝে পারব আপনি কেমন ধরণের মানুষ। আমাদের মানসিক পরিস্থিতির উপরেই আমাদে ভাগ্য নির্ধারিত হয়। আমরা কি সেটা আমাদের চিন্তার উপরেই নির্ভরশীল। এমার্স বলেছেন: 'একজন মানুষ সারাদিন যা চিন্তা করে সে হল তাই'...সত্যিই, তার পক্ষে অন্যকরকম হওয়া কিভাবে সম্ভব ?

আমি দৃঢ় ভাবেই জানি এবং সন্দেহাতীত ভাবেই আমার বা আপনার সবচেয়ে ব সমস্যা হল—আসলে একমাত্র সমস্যাই—সঠিক কোন্ চিন্তা করব। এটা যদি করা পারি তাহলে আমাদের সব সমস্যাই মিটিয়ে ফেলতে পারি। যে বিখ্যাত দার্শনি এককালে রোম সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন সেই মারকাস অরেলিয়াস কটি কথ ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—যে কটি কথা আপনার ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে 'আমাদের চিন্তার মধ্যেই আছে আমাদের জীবন।'

হ্যাঁ তাই। যেমন ভালো চিন্তায় আমরা সুখী হই। দুঃখের চিন্তা করলে দুঃখ হতে হয়। ভয়ের চিন্তা করলে ভয় পেতে হয়, অসুখের চিন্তায় হতে হয় অসুস্থ ব্যর্থতার চিন্তায় নামে ব্যর্থতা। পরাজয়ের ভাবনা থাকলে সবাই পরাজিতই ভাব চাইবে। নর্মান ভিনসেন্ট পীল বলেছিলেন: 'আপনি নিজেকে যা ভাবেন আপনি নন, আপনি নিজে যা ভাবেন আপনি তাই।'

সমস্ত সমস্যা এইভাবেই দেখা উচিত বলছি কি ? না, জীবনের সব কিছু এরব সহজ সরল কখনই নয়। আসলে আমি বলতে চাই জীবনের সব কিছুতে নঙর্থ ভাব না নিয়ে চলাই উচিত; আমার কথা হলো জীবনের সমস্যা নিয়ে চিন্তা ক দরকার তবে দুশ্চিন্তা নয়। তাহলে ভাবনা আর দুশ্চিন্তার মধ্যে তফাৎ কি ? এক ব্যাখ্যা দেওয়া যাক। যখনই আমি নিউ ইয়র্কের প্রচুর গাড়ি চলা রাস্তায় চলি তখ আমি চিন্তা করি—কিন্তু দুশ্চিন্তা করি না। চিন্তা হল সমস্যা কি সে বিষয়ে ঠাণ্ড মাথায় তার সমাধানের চিন্তা করা—দুশ্চিন্তা হল পাগলের মত ভেবে ঘুরপাক খাওয়া

কোন মানুষ তার মারাত্মক সমস্যা নিয়ে একই সঙ্গে চিন্তা করতে পারে আব গাউনের বোতামঘরে লাল ফুলও লাগাতে পারে। আমি লাওয়েল টমাসকে ঠিক ত

৫ দেখেছি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি যখন অ্যালেনবি-লরেন্সের ছ

দখাচ্ছিলেন তখন সৌভাগ্যবশতঃ আমি তার সঙ্গে ছিলাম। তিনি ও তার বন্ধু স্তত: ছটি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ছবি তুলে আনেন। এসবের মধ্যে সব সেরা ছবি ছিল ট ই-লরেন্সের এবং তার ঝকমকে বিচিত্র আরবীয় বাহিনীর চিত্র। তাছাড়াও ছিল ্যালেনবীর পবিত্র ভূমি জয় করারও ছবি। তাঁর অ্যালেনবি আর লরেন্স সম্পর্কিত বি ও বক্তৃতা লন্ডনকে চমকিত করেছিলেন। তাছাড়া সারা বিশ্বেও তার নাম য়েছিল। কনভেণ্ট গার্ডেন অপেরায় তিনি যাতে ওই সব অ্যাডভেঞ্চারের কথা শানাতে পারেন এবং ছবি দেখাতে পারেন সেজন্য অপেরা ছ'সপ্তাহের জন্য বন্ধ াখা হয়। এরপর তিনি সারা বিশ্ব পরিক্রমা করেন। এরপর অবিশ্বাস্য কিছু ুর্ভাগ্যের পর তিনি লণ্ডনে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। আমি সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলাম। মামার মনে আছে আমাদের সস্তার রেস্তোরাঁয় খেতে হত। আর সে খাওয়াও ুটতো না যদি মিঃ টমাস একজন স্কচের কাছ থেকে টাকা না ধার করতেন। ই ভদ্রলোক ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী জেমস ম্যাকবে। এ কাহিনীর সারবস্তু ল এই: 'লাওয়েল টমাসের যখন বিরাট দেনা আর শুধু হতাশায় ভরা জীবন খনও তিনি চিন্তা করলেও—দুশ্চিন্তা করেন নি। তিনি জানতেন এই বিপর্যয়ে দি ভেঙে পড়েন তাহলে কেউ তাকে মূল্য দেবেনা আর ধারও পাবেন না। তাই কটা ফুল বুকে গুঁজে তিনি মাথা উঁচু করে অক্সফোর্ড স্ট্রীট ধরে হেঁটে যেতেন। তিনি নানা সাহসের কথা ভাবতেন আর পরাজয় স্বীকার করতেন না। তাঁর বিশ্বাস হল বড় হতে গেলে ছোট হতে হয়। এটা প্রয়োজনীয়। আমাদের দৈহিক শক্তির পর এই মানসিক ভাব অদ্ভুত রকম কাজ করে। বিখ্যাত বৃটিশ মনস্তত্ত্ববিদ জে এ ্যাডফিল্ড তাঁর 'সাইকোলজি অব পাওয়ার' বইতে এর চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন; 'আমি তিনজন লোককে মানসিক শক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে ডায়- নামোমিটারে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য আমায় সহায্য করতে বলেছিলাম' তিনি তাদের তনটি বিভিন্ন অবস্থায় মনের ও শারিরীক শক্তির প্রভাব পরীক্ষা করেন।

তাদের যখন স্বাভাবিক অবস্থার পরীক্ষা করা হলো, তারা গড়ে ১০১ পাউন্ড নতে পেরেছিল।

তিনি তাদের সম্মোহিত করে যখন বলেন তারা খুব দুর্বল, তারা মাত্র ২৯ পাউন্ড জন টানতে পারে। তখন দেখা গেল তারা কেবল মাত্র ২৯ পাউন্ড ওজন টানতে পরেছে। এদের একজন আবার চ্যাম্পিয়ন লড়িয়ে। তাকে যখন সম্মোহিত করা হয়, স বলেছিল তার নিজের হাত শিশুর মতই লাগছিল।

এরপর ক্যাপ্টেন হ্যাডফিল্ড তাদের যখন সম্মোহিত করে ব'ললেন তাদের দেহে চন্ড শক্তি, তারা তখন গড়পড়তা ১৪২ পাউন্ড টানতে পারলো। তাদের মনে শক্তির থা জেগে উঠতেই তাদের দৈহিক শক্তি প্রায় শতকরা পাঁচশ ভাগই বেড়ে যায়।

মানসিক অবস্থার এই হল অবিশ্বাস্য ক্ষমতার উদাহরণ।

চিন্তার যাদুকরী ক্ষমতা বোঝানোর জন্য আমেরিকার ইতিহাসের পাতা থেকে কছু উদাহরণ রাখা যাক। কাহিনীগুলো সত্যিই আশ্চর্যজনক সন্দেহ নেই।

এসব নিয়ে একখানা বইও লিখতে পারি। তবে ছোট করেই বলি। এক কুয়াশা গৃহযুদ্ধের কিছু পরে অক্টোবরের রাত—একজন গৃহহারা দুঃস্থ মহিলা, যিনি অনব পৃথিবীতে সৎ পথেই চলেছেন তেমন একজন মহিলার দরজায় কড়া নাড়লেন। মহিলার নাম 'মা ওয়েবস্টার' তিনি অনৈক অবসর প্রাপ্ত জাহাজের ক্যাপ্টেনের থাকতেন ম্যাসাচুসেটসে।

দরজা খুলে মা ওয়েবস্টার দেখলেন দাঁড়িয়ে আছে অতি দুর্বল, রুগ্ন ছোটখা একটা দেহ, ওজন হবে বড়জোর হাড়মাস মিলিয়ে একশ পাউন্ড। আগন্তুক ছিল মিসেস গ্লোভার, তিনি তাঁকে জানালেন সারা দিনরাত একটা সমস্যা নিয়ে ভাবতে চা এমন একটা সমস্যা নিয়ে ভাবনার জন্য তিনি অন্য একটা বাড়ী চান।

'এখানেই তাহলে থাকুন না কেন' : মিসেস ওয়েবস্টার বললেন। 'এবাড়িতে অ একদম একা।'

মিসেস গ্লোভার হয়তো মা ওয়েবস্টারের কাছে অনির্দিষ্টকালই থেকে যেতে কিন্তু তা সম্ভব হল না। একদিন গৃহকর্ত্রীর জামাই বিল এলিস নিউ ইয়র্ক থে সেখানে ছুটি কাটাতে এলেন। সে মিসেস গ্লোভারকে বাড়িতে দেখেই চিৎকার ক বললো : এবাড়িতে কোন ভবঘুরেকে আমি থাকতে দিতে রাজি নই।' এরপর সে গৃ হীন মহিলাটিকে পথেই বের করে দিল। সেসময় প্রচন্ড বৃষ্টি পড়ছিল। মিসে গ্লোভার বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কিছুক্ষণ কাঁপতে লাগলেন তারপর ওরই মধ্যে রা ধরে কোন আশ্রয়ের সন্ধানে চললেন।

এ কাহিনীর আশ্চর্যজনক দিকটার কথা এবারে শুনুন। ওই ভবঘুরে মহি যাকে বিল এলিস বাড়ি থেকে বের করে দেয় তিনি ভবিষ্যতে চিন্তার জগতকে যে র প্রভাবিত করেন কোন মহিলাই বিশ্বে আর তা পারেন নি। আজকে সবাই জানে 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্সের' প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মেরী বেকার এডি বলে—লক্ষ ল অনুরাগীদের কাছে তিনি বিশেষ পরিচিত।

তবুও এ পর্যন্ত তিনি শুধু পেয়ে এসেছেন রোগ, শোক আর বিষাদ ব্যঞ্জন তাঁর প্রথম স্বামী বিয়ের কিছুকাল পরেই মারা যান। তাঁর দ্বিতীয় স্বামী তাঁ ত্যাগ করে এক বিবাহিতা স্ত্রীলোককে নিয়ে পালান। তাঁর শেষ পর্যন্ত এক অ আশ্রমে মৃত্যুও হয়। তাঁর একটি মাত্র ছেলে ছিল—কিন্তু অবস্থার বিপর্যয়ে ও অভাব অনটনে আর রোগে তাকেও তার চার বছর বয়সে ত্যাগ করতে বাধ্য হন তিনি একত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত ওই ছেলের আর দেখা পাননি তিনি। সব সম্পর্ক হারি ফেলেছিলেন।

নিজের অসুখের জন্যেই মিসেস এডি বছরের পর বছর কেবল বৈজ্ঞানিক উপা মানসিক শক্তির সাহায্যে রোগ নিরাময়ের কথা ভাবতেন। তিনি সব সময় যা খুঁজে তা হল—'মানসিক ক্ষমতায় বৈজ্ঞানিক প্রথায় রোগ নিরাময়'। তাঁর জীবনে নাটক পরিবর্তন আসে ম্যাসাচুসেটসের লেনে। এক প্রচন্ড শীতার্ত দিনে বরফ মাখা রাস্ত পা পিছলে পড়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। তাঁর মেরুদন্ডে এমনই আঘাত লাগে শ্বাস কষ্ট দেখা দেয়। এমন কি ডাক্তারও ভেবে ছিলেন তিনি বাঁচবেন না। তিনি

বলেন কোন রকমে উনি বেঁচে গেলেও কখনও হাঁটতে পারবেন না।

মেরী বেকার এডি যাকে বলা যায়, তাঁর মৃত্যু শয্যায় শুয়ে বাইবেল খুলতেই যেন ভগবানই সেন্ট ম্যাথুর এই কথাগুলো তাঁকে দিয়ে 'পড়িয়ে নিলেন: 'দেখ, তাঁর কাছে তারা একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে নিয়ে এল। লোকটি তার শয্যায় শায়িত। তখন যীশু বললেন: 'পুত্র, আনন্দ করো···তোমার পাপ ক্ষমা করা হলো···ওঠ, বিছানা কাঁধে করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করো। এরপর সে উঠে বিছানা কাঁধে নিয়ে গৃহে ফিরে গেল।'

যীশু খ্রীষ্টের ওই কথাগুলোয় তিনি যেন তাঁর সমস্ত বিশ্বাস, শক্তি আর রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা ফিরে পেয়ে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বিছানা ছেড়ে উঠে হেঁটে বেড়ালেন।

মিসেস এডি বলেছেন, 'ওই অভিজ্ঞতাই আমার কাছে নিউটনের আপেল, ওটা থেকেই আমি নিজের ভালো করার পথ নির্দেশ লাভ করি। লাভ করি অপরেরও ভালো করার পথ···এ থেকেই আমার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্বাস জন্মায় সব কিছুর মূলই হল মন আর সব কার্য কারণই মনের সৃষ্টি।'

এই পথ ধরেই মেরী বেকার এডি এক নতুন ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা করলেন: খৃষ্ট বিজ্ঞান—কোন মহিলার প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত। এই ধর্মমত সারা দুনিয়াতেই ছড়িয়ে পড়েছে।

আপনি বোধ হয় এখন নিজেকে প্রশ্ন করছেন: 'এই কার্নেগী লোকটা নিশ্চয়ই খৃষ্ট বিজ্ঞানের হয়ে প্রচার চালাতে চায়।' না, আপনারা ভুল করছেন। আমি কোন খৃষ্ট বিজ্ঞানী নই। তবে যত বয়স বাড়ছে ততই আমি দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে উঠছি—চিন্তার শক্তি কত বিরাট। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বয়স্কদের শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থেকে বুঝেছি পুরুষ আর স্ত্রীলোকেরা সকলেই সব দুশ্চিন্তা, ভয় আর নানা রকম রোগ দূর করতে পারে আর তাদের চিন্তাধারা বদল করে তাদের জীবনকেও পালটাতে পারে। আমি জানি! আমি জানি! আমি জানি! আমি বহুবার এমন কাণ্ড ঘটতে দেখেছি। আমি এতবার এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি যে এতে আর আশ্চর্য হই না।

উদাহরণ হিসেবে আমার এক ছাত্রের জীবনের কথাই বলছি, কি ভাবে এই চিন্তার শক্তি কি রকম অবিশ্বাস্য পরিবর্তন ঘটাতে পারে। ছাত্রটির স্নায়ু ভেঙে পড়েছিলো। এটা হলো কেন? দুশ্চিন্তার জন্য। ছাত্রটি আমাকে বলেছিল, সব ব্যাপারেই আমার দুশ্চিন্তা হত। আমি রোগা বলে দুশ্চিন্তা হত, দুশ্চিন্তা হত টাক পড়েছে বলে ভয় পেতাম বিয়ে করার জন্য, যথেষ্ট টাকা আয় করতে পারব না, ভালো বাবা হতে পারব না, দুশ্চিন্তা করতাম ভাল ভাবে জীবন কাটাচ্ছিনা, যাকে বিয়ে করতে চাই সেই মেয়েটিকে হারাতে চলেছি। আমার দুশ্চিন্তা হত অন্য লোকেরা আমার প্রতি কিরকম ধারণা গ্রহন করছে। দুশ্চিন্তা করতাম আমার পেটে আলসার হয়েছে। আমি আর কাজ করতে পারলাম না, আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম। আমার মধ্যে এসব দুশ্চিন্তা

একেবারে বয়লারের মত টগবগ করে ফুটতে চাইতো। কিন্তু সেই দুশ্চিন্তা দমনে কোন সেফ্‌টি ভাল্‌ব ছিল না। এতে এমনই চাপ বেড়ে গেল যে একটা কিছু ঘটে যাবে বলে মনে হল—আর হলও তাই। আপনাদের কখনও যদি স্নায়ু ভেঙে না পড়ে থাকে, ঈশ্বর করুন কখনও যেন তা না হয়। কারণ শরীরের কোন যন্ত্রণা, যন্ত্রণাকাতর মনের তুলনায় কিছুই না।

'আমার ওই ভেঙে পড়া অবস্থা এমনই হল যে আমার পরিবারের লোকজনের সঙ্গেও কথা বলতে পারতাম না। আমার চিন্তাধারায় কোন লাগাম ছিলোনা। একরাশ ভয়ই আমায় চেপে ধরেছিল। সামান্য শব্দেই আমি চমকে উঠতাম। প্রত্যেককেই আমি এড়িয়ে চলতাম। কোন বিশেষ কারণ না থাকলেও চিৎকার করে কেঁদে উঠতাম।

'আমার প্রতিটা দিনই ওই যন্ত্রণায় কাটতে লাগলো। আমার মনে হতে লাগলো সবাই আমাকে ত্যাগ করে যাচ্ছে—এমনকি ভগবানও। নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন শেষ করে দেবার কথাও ভেবেছিলাম।

'এর বদলে ফ্লোরিডায় বেড়াতে যাব ঠিক করলাম—ভাবলাম নতুন জায়গায় গেলে ভালো হবে। ট্রেনে ওঠার সময় বাবা আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বললেন ফ্লোরিডায় পেঁছনোর আগে যেন চিঠিটা না খুলি। সেই সময় ছুটি কাটানোর জন্য ফ্লোরিডায় প্রচুর জনসমাগম হয়। হোটেলে জায়গা না পেয়ে একটা গ্যারেজে আশ্রয় নিলাম। মিয়ামির উপকুলে একটা মালবাহী জাহাজে চাকরি জোগাড়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। তাই সমুদ্র তীরেই সময় কাটাতে লাগলাম। দেখলাম বাড়িতে যা ছিলাম তার চেয়েও খারাপ সময় কাটতে লাগলো, তাই চিঠিটা খুলে দেখতে চাইলাম বাবা কি লিখেছেন। তিনি লিখেছিলেন: "প্রিয় বৎস, তুমি এখন বাড়ি থেকে ১৫০০ মাইল দূরে আর কোন তফাৎ বুঝতে পারছো কি? আমি জানি তা পারছো না। কারণ আমি জানি তুমি তোমার সঙ্গে নিয়ে গেছো এমন কিছু যা সব গোলমালের মূল—আর তা হল তুমি নিজে! তোমার শরীর বা মনে আসলে কিছুই হয়নি। পারিপার্শ্বিকতা তোমায় শাস্তি দিচ্ছে না। বরং তুমি যা ভাবছো তাই দিচ্ছে। 'মানুষ হৃদয়ে যা চিন্তা করে, সে নিজে হল তাই। এটা যখন বুঝতে পারবে, বৎস, তখনই বাড়ি ফিরে এস, কারণ তুমি তখন সেরে যাবে।'

'বাবার চিঠিতে বেশ রাগ হল। আমি সহানুভূতি চাই, উপদেশ নয়। আমার এমন পাগলের মত রাগ হল যে ঠিক করলাম আর কখনও বাড়ি ফিরব না। ওই রাত্তিরে যখন মিয়ামির উপকুলের রাস্তায় হাঁটছিলাম তখন এক গির্জার পাশে এসে শুনলাম সেখানে সান্ধ্য প্রার্থনার অনুষ্ঠান চলছে। কোথাও যাওয়ার জায়গা না থাকায় ভিতরে ঢুকে প্রার্থনা শুনতে চাইলাম। তখন বলা হচ্ছিলো: 'যে তার নিজের ইচ্ছাকে জয় করতে সক্ষম সে একজন শহর বিজয়ী সৈনিকের চেয়েও শক্তিমান।' ঈশ্বর উপাসনা গৃহের পবিত্র এলাকায় যে কথা শুনলাম আমার বাবাও তো তাই লিখেছেন—এ সমস্ত মিলে আমার মস্তিষ্কের সব ময়লা বেরিয়ে গেলো। জীবনে ওই

প্রথম পরিষ্কার আর বুদ্ধিমানের মত চিন্তা করতে পারলাম। বুঝতে পারলাম কত মূর্খ আমি। নিজেকে সঠিক ভাবে চিনতে পেরে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমি এখানে বসে সারা পৃথিবী আর সবাইকে বদলে ফেলার চেষ্টা করছি অথচ যা দরকার তা হল আমার মনের ক্যামেরার লেন্সটাই বদলে ফেলা।

'পরের দিনই মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি রওয়ানা হলাম। এক সপ্তাহ পরেই কাজে যোগ দিলাম। চার মাস পরে যে মেয়েটিকে হারাতে বসেছি ভেবে ছিলাম তাকেই বিয়ে করলাম। আমাদের এখন পাঁচটি সন্তান নিয়ে সুখের সংসার। ভগবান আমার বাস্তবে আর মানসিক দিক থেকে সুখী করেছেন। স্নায়ু ভেঙে পড়ার সময় আঠারো জনের শিফটে রাতের ফোরম্যান হিসেবে কাজ করতাম। আজ আমি সাড়ে চারশ লোকের এক কারটন তৈরির কারখানার সুপারিন্টেন্ডেণ্ট! আজ আমার জীবন বহু বান্ধব নিয়ে পরিপূর্ণ। আমার বিশ্বাস জীবনের পরিপূর্ণতা আমি টের পেয়েছি। যখন কোন অস্বস্তিকর অবস্থা আসে (যা প্রত্যেকের জীবনে আসে) তখন নিজেকে বলি ক্যামেরার লেন্সটা অতীতের দিকে ঘুরিয়ে দিতে। তাতেই সব ঠিক হয়ে যায়।

'সত্যিই বলতে চাই আমার স্নায়ু ভেঙে পড়ার জন্য আমি খুশী, কারণ আমি বেশ কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়েই বুঝেছি চিন্তা আমাদের মনের আর শরীরের উপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করে। এখন আমি আমার চিন্তাকে মনের বিরুদ্ধে না গিয়ে স্বপক্ষে আনাতে পারি। এখন বুঝতে পারছি বাবা ঠিকই বলেছিলেন বাইরের অবস্থা আমার যন্ত্রণার কারণ ছিলো না। সেই অবস্থা নিয়ে আমি যা ভেবেছিলাম তাই দুর্দশার কারণ। সেটা যেই বুঝতে পারলাম তখনই আমার সব রোগ সেরে গেল আর আমিও ঠিক রইলাম।'

আমার ছাত্রটির অভিজ্ঞতা এই রকমই ছিল।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের জীবন যাপন থেকে মানসিক আর অন্য যে আনন্দ পাই তা আমাদের অবস্থার উপর নির্ভর করে না। অথবা আমাদের কি আছে তার উপরও না। বরং সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমাদের মানসিক অবস্থার উপর। বাইরের অবস্থার এর উপর হাত নেই। উদাহরণ হিসেবে জন ব্রাউনের কথাটাই ধরুন। জন ব্রাউনকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রশস্ত্রের গুদামে লুঠ আর ক্রীতদাসের বিদ্রোহে প্ররোচিত করার জন্য ফাঁসি দেওয়া হয়। তিনি তার কফিনের উপর বসে বধ্যভূমিতে যান। যে জেলার তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিনি বেশ দুশ্চিন্তায় পড়লেও জন ব্রাউন বেশ শান্ত সমাহিত ছিলেন। তিনি ভার্জিনিয়ার ব্লুরিজ পাহাড় লক্ষ্য করে বলে ওঠেন: 'আহা কি সুন্দর দৃশ্য! এমন সুন্দর দেশটা ভালো করে দেখার সুযোগ হলো না।'

এবার রবার্ট ফ্যালকন স্কট আর তার সঙ্গীদের কথাই ধরুন—তিনিই ছিলেন ইংরেজদের সর্বপ্রথম দক্ষিণ মেরু অভিযানকারী। তাঁদের দেশে প্রত্যাবর্তনের কাজই বোধ হয় মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ভ্রমণ। কোন খাদ্য ছিলোনা—জ্বালানীও ছিলোনা। এগারো দিনরাত ধরে সমানে প্রচণ্ড তুষার ঝড় চলেছিল তাই হাঁটাও ছিল

অসম্ভব। এমন ভয়ানক জোরে বাতাস বইছিল যে তুষারের বুক কেটে গর্ত হয়ে যাচ্ছিল। স্কট আর বন্ধুরা বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের মৃত্যু আসন্ন। এরকম কোন ভয়ংকর অবস্থার মুখোমুখি হতে পারে ভেবেই তাঁরা সঙ্গে খানিকটা আফিম এনেছিলেন। একটু বেশি খেলেই তারা ঘুমিয়ে সুখের স্বপ্নে বিভোর হবেন আর কোনদিন জাগতে হবে না। কিন্তু তাঁরা আফিম না খেয়ে আনন্দের গান গাইতে গাইতে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। একথা যে সত্য তা আমরা জেনেছি। কারণ প্রায় আটমাস পরে একদল উদ্ধারকারী তাদের বরফে জমাট বাধা মৃতদেহের কাছে তাদের বিদায়কালীন একটা চিঠি আবিষ্কার করেন।

হ্যাঁ, আমরা যদি গঠনমূলক চিন্তা আর সাহস এবং শান্তির কথা ভাবতে পারি তাহলে কফিনে বসেও পারিপার্শ্বিক দৃশ্য উপভোগ করতে পারি। পারি বধ্যভূমিতে হাসি মুখে পৌঁছতে বা আনন্দের গান গেয়ে মৃত্যুকেও জয় করতে পারি।

কবি মিল্টনও এটা তাঁর অন্ধত্বের মধ্য দিয়ে তিনশ বছর আগে আবিষ্কার করেছিলেন :

'মানুষের মন একই জায়গায় থাকে।

এই মনই স্বর্গকে নরক আর নরককে স্বর্গ করে তোলে।'

নেপোলিয়ান আর হেলেন কেলারই মিল্টনের কথার সত্যতা প্রমাণ করতে পারে : মানুষ যা চায় তার সবই ছিল নেপোলিয়ানের—সম্মান, ক্ষমতা, সম্পদ—তা সত্ত্বেও তিনি সেন্ট হেলেনায় বলেন, 'জীবনে ছটা দিনও সুখে কাটাই নি।' অন্যদিকে অন্ধ, বাকশক্তিহীন, বধির হেলেন কেলার বলেছিলেন : 'জীবন আমার কাছে এত সুন্দর।'

পঞ্চাশ বছরের জীবনে আমি যদি কিছু শিখে থাকি তাহলো, 'আপনি নিজে ছাড়া কেউ শান্তি আনতে পারেনা'।

আত্মনির্ভরতা নামে একটি প্রবন্ধের শেষে এমার্সন যা বলেছিলেন সেই কথাটাই আপনাদের শোনাতে চাই। কথাটা এই : 'রাজনৈতিক জয়, ভাড়া বৃদ্ধি, রোগমুক্তি বা আপনার হারানো বন্ধুর প্রত্যাবর্তন বা অন্য যে সব জিনিস আপনাকে খুশি করে, তাতে ভাবেন সুদিন আসছে। এটা কিন্তু বিশ্বাস করবেন না, কারণ কখনই তা হয়না। আপনি নিজে ছাড়া কেউ আপনাকে শান্তি এনে দিতে পারবে না।'

বিখ্যাত উদাসী দার্শনিক এপিকটেটাস সকলকে সতর্ক করে বলেছিলেন আমাদের উচিত দেহ থেকে টিউমার বা পুঁজ বের করে দেওয়ার চেয়ে বদ চিন্তা তাড়ানো অনেক বেশী প্রয়োজনীয়।

এপিকটেটাস কথাটা বলেছিলেন উনিশশো বছর আগে, তবে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান তাঁর কথাই সমর্থন করে। ডঃ জি. ক্যানবি রবিনসন বলেন জনস হপকিন্স হাসপাতালে যেসব রোগী আসে তাদের পাঁচজনের মধ্যে চারজনই আবেগজনিত রোগের শিকার। এমনকি শরীরের নানা বিকলনেরও মূল এটাই। তিনি বলেছেন যে জীবনের পথে চলতে গিয়ে নানা সমস্যা থেকেই এই সব রোগ আসে। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক মঁতেইনের কথা হলো : 'যা ঘটে তাতে মানুষ যতোটা না আঘাত পায়, তার চেয়ে বেশি

আঘাত পায় সেই ঘটনা সম্পর্কে তার অভিমতের ফলে। আর সেই মতামত নির্ভর করে আমাদের নিজেদেরই উপরে।'

কি বলতে চাই জানেন ? আমার কি এমন ধৃষ্টতা যে আপনার মুখের উপর বলছি যে আপনার দুঃখ কষ্টের পরিসীমা নেই আর তা সত্ত্বেও এর পরিবর্তন সম্ভব ? হ্যাঁ, আসলে তাই বলতে চাই। আর সেটাই সব নয়। আমি সেটা কেমন করে করা যায় দেখাচ্ছি। এতে একটু চেষ্টার দরকার হলেও ব্যাপারটা খুবই সহজ। ব্যবহারিক মনস্তত্ত্বের বিখ্যাত পণ্ডিত উইলিয়াম জেমস একবার বলেন : 'মনে হতে পারে মানুষ অনুভূতির ফলেই কাজ করে। আসলে কিন্তু দুটোই একসঙ্গে চলে। কাজকে যদি মন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা যায়—যা করা সম্ভব, আমরা পরোক্ষভাবে অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি।'

অন্যকথায় বললে উইলিয়াম জেমস বলেছেন যে আচমকা আমরা আমাদের অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনা—তবে আমাদের কার্যধারা বদল করতে পারি। আর যখনই কার্যধারা বদল করব তখনই আমাদের অনুভূতিও বদলাতে পারি।

এই সহজ কৌশল কি ফলপ্রদ ? নিজেই চেষ্টা করুন না। মুখে সত্যিকার একটা হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করুন, তারপর হেলান দিয়ে বসে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে এক কলি আনন্দের গান গাইতে থাকুন। যদি গাইতে না পারেন তবে শিস দিন। যদি শিস না দিতে পারেন গুনগুন করুন। উইলিয়াম জেমস ঠিকই বলেছিলেন, আপনি দেখবেন যে এই রকম খুশির সুর ভাঁজতে থাকলে মন খারাপ করে থাকা একেবারেই অসম্ভব।

এটাই প্রকৃতির একটা অমোঘ সত্য যা আমাদের জীবনে অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারে। আমি ক্যালিফোর্ণিয়ার এক মহিলাকে জানি—অবশ্য তাঁর নাম করব না—তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সুখী হতে পারতেন শুধু যদি এই কৌশলটা জানতেন। মহিলাটি বৃদ্ধা আর বিধবা, স্বীকার করতেই হবে ব্যাপারটা খুবই দুঃখের। তবে তিনি কি সুখী হওয়ার চেষ্টা করেছেন ? উত্তর হল 'না' তাঁকে যদি প্রশ্ন করা হয় তিনি উত্তর দেন, 'ওহ্, আমি ঠিক আছি'—তবে তাঁর মুখভাব আর কণ্ঠস্বরই বলে দেবে কথাটা ঠিক নয় যেহেতু মনে হবে তিনি বলছেন, 'ওঃ ভগবান, যদি জানতেন কত কষ্টই না আমি পেয়েছি।' মনে হয় তাঁর সামনে সুখী থাকায় যেন আপত্তি আছে। অনেক মেয়েই তাঁর চেয়ে কষ্টে আছে, তাঁর স্বামী তার জন্য বীমার যে টাকা রেখে গেছেন তাতে তাঁর অভাব নেই। তাঁর বিবাহিত ছেলেমেয়েরা আছে সেখানে তিনি থাকতে পারেন। তবে আমি কখনই তাঁকে হাসতে দেখিনি ; তিনি সব সময় অভিযোগ করেন তার জামাইরা কৃপণ আর স্বার্থপর—অথচ তিনি তাদের বাড়িতে মাসের পর মাস কাটিয়েছেন। তিনি আরও বলেন মেয়েরা তাকে কোন উপহারই দেয়না—অথচ তিনি নিজে এক পয়সা খরচ করেন না, নিজের জন্য সব টাকা জমিয়ে রাখেন। তিনি তাঁর পারিবারকে এইভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। কিন্তু এরকম হওয়ার কি কোন প্রয়োজন ছিলো ? সেটাই হল দুঃখের কথা—তিনি ইচ্ছে করলেই অসুখী থেকে সুখী

হতে পারতেন—নিজেকে তিনি হতভাগিনী তিক্ততা মাখা এক অসুখী স্ত্রীলোক থেকে আদরণীয়, প্রিয় একজন হতে পারতেন। এটা না করে নিজের অসুখী জীবনের দিকে সর্বদা নজর দিলে মোটেও কেউ সুখী হতে পারে না।

আমি ইণ্ডিয়ানাতে একজনকে জানতাম, নাম এইচ জে. ইঙ্গলার্ট, তিনি আজও বেঁচে আছেন কারণ তিনি এই রহস্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন। দশ বছর আগে তাঁর 'স্কারলেট ফিভার' হয়। তা থেকে সেরে ওঠার পরেই তিনি আক্রান্ত হন মূত্রাশয়ের প্রদাহে। সব রকম ডাক্তার দেখালেন ইঙ্গলার্ট এমনকি হাতুড়েদেরও। কিন্তু কিছুতেই তাঁর রোগ সারলো না; তারপর কিছুকাল পরেই নতুন উপদ্রব সুরু হল। তাঁর রক্তচাপ বেড়ে গেল। তিনি এক ডাক্তারের কাছে দেখাতেই শুনলেন রক্তচাপ ২১৪। তাঁকে বলা হল এটা মারাত্মক—সেটা বেড়েই চলছে অতএব ভবিষ্যতের সব কিছু ঠিকঠাক করে ফেলা উচিত।

ভদ্রলোক বলেন, 'আমি বাড়ি চলে গেলাম,' 'আর দেখতে চাইলাম বীমা কোম্পানীর টাকা মেটানো আছে কিনা। তারপর বিধাতার কাছে ক্ষমা চাইলাম আমার সব ত্রুটির জন্য। তারপর মনখারাপ করা ভাবনায় তলিয়ে গেলাম। আমি এবার সকলকেই অসুখী বানিয়ে ছাড়লাম। আমার স্ত্রী আর পরিবারের সবাইকে ভারি অসুখী করে তুললাম আর নিজে হতাশায় ডুবলাম। যাইহোক এক সপ্তাহের আত্মনিগ্রহের পর নিজেকে বললাম: 'তুমি বোকার মতই কাজ করছ। হয়তো আগামী এক বছরেও তোমার মৃত্যু হবে না। অতএব আবার সুখী হতে চেষ্টা করছো না কেন?'

'আমি তাই সটান হেলান দিয়ে বসে হাসি মাখানো মুখে এমন ভাব করতে চাইলাম যেন সবই স্বাভাবিক। স্বীকার করছি ব্যাপারটা গোড়ায় তেমন সহজ হয়নি—তবে চেষ্টা করে খুশির ভান বজায় রাখলাম আর তাতে যে আমার পরিবারকেই খুশি করলাম তাই নয়, আমারও ভালো হলো।

'প্রথমতঃ আমি ভালো বোধ করতে আরম্ভ করলাম—যা ভাবতাম সেই রকমই। ক্রমেই ভালো হয়েও উঠলাম। আর আজ? আজ যখন আমার কবরে থাকার কথা তারও কয়েক মাস পরে শুধু যে সুখী তাই নই। বেশ ভালো ভাবেই বেঁচে আছি, আমার রক্তের চাপও স্বাভাবিক! একটা জিনিস আমি নিশ্চিত জানি। ডাক্তারের ভবিষ্যতবাণীই ঠিক হত, যদি মৃত্যুর ওই চিন্তা করতাম। কিন্তু আমি আমার শরীরকে সেরে ওঠার সুযোগ দিই আর সেটা হল মানসিক অবস্থার পরিবর্তন!'

আনন্দের একটা প্রশ্ন করি আসুন: যদি আনন্দের ভান আর সত্যিকার সুস্বাস্থ্যের কথা ভাবলে এবং মনে সাহস আনলে একজনের জীবন রক্ষা করতে পারেন, তাহলে আমি বা আপনি ছোটখাটো দুঃখ আর মন খারাপের কথা ভাববো কেন? কেন আমাদের হাসপ'র সবাইকে অসুখী করব? অথচ কেবল হাসিখুশি থাকলেই তাদেরও ভালো 'শিকার।

পথে চ বছর আগে একটা ছোট্ট বই পড়ছিলাম বইখানা আমার জীবনে গভীর প্রভাব ম'তেই রেছে। বইটার নাম 'মানুষ যেরকম ভাবে।' লেখক জেমস্ অ্যালেন। তাতে

কি ছিল বলছি।

'একজন মানুষ যখন কোন লোক বা জিনিস সম্পর্কে তার চিন্তাধারা বদল করে, অন্য লোক আর জিনিসও তেমনি বদলে যায়।...একজন লোককে তার চিন্তাধারা বদলাতে দিন তাহলে অবাক হয়ে দেখবেন যে তার জীবনের বাস্তব অবস্থারও পরিবর্তন ঘটছে। যে ঈশ্বর আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি আমাদেরই মধ্যে। এ আমরা নিজেরাই ...মানুষ যা করে তাহল তার নিজের চিন্তারই ফসল...কোন মানুষের উন্নতি, জয়লাভ আর সবই তার নিজের চিন্তাতেই হয়। যখনই সে দুর্বল, আর দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে তখনই চিন্তার উন্নয়ন সে ছেড়ে দেয়।'

বাইবেলের প্রথম পরিচ্ছেদ অনুসারে ভগবান মানুষকে দুনিয়ার অধীশ্বর বানিয়ে ছিলেন। এ এক মহান উপহার। কিন্তু এরকম রাজকীয় উপহার আমি চাইনা। আমি যা চাই তা হল নিজের উপর অধিকার—আমার চিন্তার অধীশ্বর হতে, ভয় জয় করতে, আমার মন আর চিন্তার উপর প্রভুত্ব করতে। আমি এও জানি একাজ আমার পক্ষে সম্ভব—ইচ্ছে করলেই আমি আমার মনের অধীশ্বর হতে পারি।

অতএব আসুন উইলিয়াম জেমসের এই কথাগুলো মনে গেঁথে রাখি:

'যাকে আমরা অকল্যাণ বলে থাকি...তাকে সহজেই কল্যাণকর সালসা তৈরি করাও সম্ভব। যে মানুষ দুর্ভাগ্যতাড়িত তার উচিত মন থেকে ভয় দূর করে লড়াই করা।'

আসুন আমরা আমাদের সুখের জন্য যুদ্ধ করি!

আসুন এজন্য আমরা প্রত্যেক দিনের প্রফুল্লতা আর গঠনমূলক কাজের জন্য কার্যসূচী তৈরী করি। এই কার্যসূচীকে নাম দিতে পারি 'শুধু আজকের জন্য।' এটা আমার এত ভালো লেগেছিল যে শ'য়ে শ'য়ে কপি বিলিয়েছি। এটা ছত্রিশ বছর আগে প্রয়াত সিবিল এফ প্যাট্রিজ লিখেছিলেন। যদি এটা আমরা মেনে চলি তাহলে আমাদের দুশ্চিন্তার আবেগটা কেটে গিয়ে আনন্দের ভাগ ঢের বেড়ে যাবে।

শুধু আজকের জন্য

(১) শুধু আজকের জন্য আমি সুখী হব। এতে বোঝা যায় আব্রাহাম লিঙ্কন যা বলেছেন তাই ঠিক যে 'অধিকংশ মানুষই যতখানি খুশী হতে চায় তাদের মন যা চায় ততটাই তারা তাই হয়।' সুখ বাইরের বস্তু নয়। এ হলো অন্তরের।

(২) শুধু আজকের জন্য যা ঘটে তাকে গ্রহণ করব, আমার ইচ্ছে মত সেটা করতে চাইব না। আমি আমার পরিবার, ব্যবসা আর ভাগ্য যেমন আসবে তাকে সেই ভাবেই মেনে নেব।

(৩) শুধু আজকের জন্য আমার শরীরের যত্ন নেব। আমি ব্যায়াম করব, যত্ন করব, শরীরকে অবহেলা করব না। কারও দোষ খুঁজব না, কাউকে নিয়ন্ত্রণ বা উন্নত করার চেষ্টা করব না।

(৪) শুধু আজকের জন্য মনকে আমি সবল করার চেষ্টা করব। দরকারী কিছু

শিক্ষা করব। আমি এমন কিছু পড়তে চেষ্টা করব যাতে চেষ্টা দরকার। সেইসঙ্গে দরকার চিন্তা আর মনসংযোগ।

(৫) শুধু আজকের জন্য আমার আত্মাকে তিনটি পথে সক্রিয় করব। আমি একজনের কোন উপকার করব কিন্তু নিজের পরিচয় জানাবো না। যা করতে চাই না—এমন দুটো কাজ করব উইলিয়াম জেমসের উপদেশ মত। কেবল অভ্যাসের জন্যই এই সব কাজ করব।

(৬) শুধু আজকের জন্য আমি প্রীতিময় থাকবো। আমি আজ বাহ্যিক ভাবে সুদর্শন থাকতে, পোশাক পরতে চেষ্টা করব। আমি ধীরে কথা বলব, শিষ্ট থাকব। আমি অপরের প্রশংসা করব। কোন সমালোচনা করব না।

(৭) শুধু আজকের জন্য আজকের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করবো। সারা জীবনের সমস্যা নিয়ে একসাথে মাথা ঘামাবো না। আমি বারো ঘণ্টার জন্য কোন কাজ করতে পারি তবে তা সারা জীবন ধরে করে চলব না।

(৮) শুধু আজকের জন্য একটা কার্যসূচী রাখব। প্রতিঘণ্টায় কি করব তার হিসেব রাখব। আমি যে সব সময় তা মেনে চলব তা নয়, তবু তা সত্ত্বেও রাখব। এতে দুটো জিনিস ধ্বংস হবে তাহল—ব্যস্ততা আর অনির্দিষ্টতা।

(৯) শুধু আজকের জন্য আধঘণ্টা একাকী বিশ্রাম নেব। এই আধ ঘণ্টায় ঈশ্বরের চিন্তা করব যাতে জীবনকে প্রকৃত উপলব্ধি করতে পারি।

(১০) শুধু আজকের জন্য আমি ভয় পাব না। অন্ততঃ সুখী হতে ভীত হব না। যা ভাল অর্থাৎ সেই সুন্দরকে নির্ভীক ভাবে পূজা করব, এবং যাদের ভালোবাসি তাদের বিশ্বাস করতে চাইব যে তারাও আমায় ভালোবাসে।

শান্তি ও সুখের জন্য যদি মনকে সুদৃঢ় ভাবে তৈরী করতে চান তাহলে এই নিয়মটি মেনে চলুন :

'হাসি মুখে চিন্তা করে কাজ করুন, দেখবেন তাহলেই প্রফুল্লতা সত্যিই আসবে।'

॥ তেরো ॥

হিংসা ও ঘৃণার পরিণতি

বহু বছর আগে ইয়েলোস্টোন পার্কে যখন বেড়াচ্ছিলাম তখন ভ্রমণার্থীদের সঙ্গে বসে ঘন পাইনবনের ঝোপের দৃশ্য উপভোগ করছিলাম। ঠিক তখনই আমরা যে জন্তুটিকে দেখার অপেক্ষায় ছিলাম সেই জঙ্গলের আতঙ্ক এক প্রকাণ্ড আকারের গ্রিসলি ভালুক আলোয় বেরিয়ে এসে পার্কের হোটেলের জমা করা জঞ্জাল ঘাঁটতে আরম্ভ করল। জঙ্গলের একজন শিকারী মেজর মার্টিনডেল ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণার্থীদের ভালুক সম্বন্ধে নানা কাহিনী শোনালেন। তিনি বললেন ওই গ্রিসলি ভালুক একমাত্র বন্য মহিষ আর কোডিয়াক ভালুক ছাড়া পশ্চিম জগতের কোন জানোয়ারকেই ভয় করেনা। অথচ আমি সে রাতে দেখলাম গ্রিসলি ভালুকটা সে রাতে একটা জন্তুকে জঙ্গলের বাইরে এনে ওর সঙ্গে খেতে দিল। জন্তুটা একটা স্কাঙ্ক। অথচ ভালুকটা জানত ওর থাবার এক আঘাতেই ও ছোট্ট স্কাঙ্কটাকে শেষ করে দিতে পারে। কিন্তু সে তা করল না কেন? কারণ সে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জেনেছিল এতে কোন লাভ হয় না।

এটা আমিও আবিষ্কার করি। আমার ছেলে বয়সে কাজ করার সময় আমি চার পেয়ে বহু স্কাঙ্ক ধরেছি আর নিউইয়র্কের ফুটপাথে হাঁটার সময় বহু দুপেয়ে স্কাঙ্কও দেখেছি। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি এই দুজাতের জীবকেই ঘাঁটিয়ে লাভ হয় না।

আমরা যখন আমাদের শত্রুদের ঘৃণা করি তখন তারা মানসিক দিক দিয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আমাদের ঘুম, হজমশক্তি, ব্লাড প্রেসার, স্বাস্থ্য আর আমাদের সুখের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের শত্রুরা যদি জানতে পারত তারা কিভাবে আমাদের দুশ্চিন্তায় ফেলে ক্ষতি করে চলেছে তাহলে তারা আনন্দে নাচতে থাকতো। আমাদের ঘৃণা তাদের কোনই ক্ষতি করে না বরং সে ঘৃণা আমাদেরই দিনরাতকে নরক করে তোলে। এই কথাটা কে বলেছিলেন জানেন? 'স্বার্থপরেরা যদি আপনাদের উপর টেক্কা দিতে চায় তাহলে তাদের তুচ্ছজ্ঞান করে বাতিল করুন, শোধ নেবার দরকার নেই। যখন শোধ নেবার চেষ্টা করবেন, জানবেন তার ক্ষতি করার চেয়ে নিজেরই বেশি ক্ষতি করবেন।'......কথাটা শুনে মনে হয় কোন বিখ্যাত আদর্শবাদীর উক্তি। কিন্তু তা নয়। কথাটা মিলওয়াকির পুলিশ দপ্তরের এক বুলেটিনে বের হয়।

শোধ নেবার চেষ্টা কিভাবে আপনার ক্ষতি করতে পারে? নানা ভাবেই তা পারে। লাইফ পত্রিকার ভাষা অনুযায়ী এতে আপনার স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি হতে পারে। 'ব্যক্তিত্বময় রক্তচাপ সম্পন্ন মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঘৃণা। যখন ঘৃণা দীর্ঘকালীন হয় তখনই সঙ্গী হয় দীর্ঘকালের রক্তচাপ আর হার্টের অসুখ।'

অতএব দেখছেন যখন যীশু বলেছিলেন, 'আপনার শত্রুকে ভালোবাসুন', তখন তিনি শুধু নীতিশাস্ত্রের কথাই বলেন নি। তিনি বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসাশাস্ত্রের কথাও বলেছেন। তিনি যখন বলেন, 'শতশতবার ক্ষমা কর' তখন তিনি আপনাকে আর আমাকে উচ্চ রক্তচাপ, হার্টের রোগ, পাকস্থলীর আলসার এবং অন্যান্য বহু রোগ থেকে কিভাবে দূরে থাকতে হয় সেটাই বলেছিলেন।

আমার এক বন্ধুর সম্প্রতি সাংঘাতিক হৃদরোগ হয়। তাঁর চিকিৎসক তাঁকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলেছিলেন আর বলেছিলেন যাই ঘটুকনা কেন কোনরকম ক্রুদ্ধ হওয়া চলবে না। ডাক্তাররা জানেন আপনার যদি হৃৎপিণ্ড দুর্বল থাকে তাহলে আচমকা রাগ আপনার মৃত্যু ঘটাতে পারে। মৃত্যু ঘটাতে পারে বলেছি? এই রাগ সত্যিই একজন রেস্তোরাঁ মালিকের মৃত্যুর কারণ হয়। এটা ঘটে কবছর আগে ওয়াশিংটনের স্পোকেনে। আমার সামনেই স্পোকেনের পুলিশ দপ্তরের পুলিশ প্রধানের একখানা চিঠি রয়েছে, তাতে তিনি লিখেছেন: 'ক'বছর আগে স্পোকেনের এক রেস্তোরাঁর মালিক আটষট্টি বছরের মিঃ উইলিয়াম থডেবার রেস্তোরাঁর পাচকের উপর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হন। এমনই তাঁর রাগ হয় রিভলবার বের করে তিনি পাচককে তাড়া করেন আর তৎক্ষণাৎ পড়ে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান—হাতে তখনও রিভলবারটা ধরা। করোনারের বক্তব্য ছিল 'প্রচণ্ড রাগের ফলে হৃদরোগে মৃত্যু।'

যীশু যখন বলেছিলেন 'শত্রুকে ভালোবাসো', তখন তিনি এটাই বলেছেন কি করে আমরা চেহারা ভালো রাখতে পারি। আমি বা আপনি জানি, যেসব মেয়েদের মুখ কুঁচকে গেছে বা চেহারা শুকিয়ে গেছে তা ঘৃণারই পরিণতি। পৃথিবীর সবরকম চিকিৎসাতেও এটা ভালো হবে না। কিন্তু ক্ষমা, নমনীয়তা আর প্রেমে তাদের চেহারার উন্নতি হতে পারে।

ঘৃণা আমাদের খাদ্যকেও বিস্বাদ করে তোলে। বাইবেলে ব্যাপারটা এই ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে: 'ঘৃণার সঙ্গে মোটা ভেড়ার মাংসের চেয়ে প্রেমময় নিরামিষ খাদ্যই শ্রেয়।'

আমাদের শত্রুরা যদি জানতে পারে তাদের প্রতি আমাদের ঘৃণা আমাদের কিভাবে শেষ করে ফেলছে, নার্ভাস করছে আর সৌন্দর্য নষ্ট করছে, হৃদরোগ আনছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জীবনীশক্তি নিঃশেষ করছে তাহলে তারা আনন্দে লাফাতো।

আমরা যদি শত্রুদের ভালোবাসতে নাও পারি অন্ততঃ নিজেদের ভালোবাসি আসুন। নিজেদের এমন ভাবে ভালোবাসতে হবে যে কিছুতেই শত্রুদের আমরা আমাদের সুখ, স্বাস্থ্য বা চেহারা নষ্ট করতে দেব না। শেক্সপীয়ার যেমন বলেছিলেন:

'শত্রুর জন্য এমন উত্তাপ সৃষ্টি করবেন না যাতে
নিজেই দগ্ধ হবেন।'

যীশু যখন বলেছিলেন 'শতশতবার শত্রুকে ক্ষমা কর', তিনি তখন দরকারী কথাই বলেছিলেন। যেমন ধরুন, একখানা চিঠির কথা বলি। সেখানা লিখেছেন সুইডেন থেকে জর্জ রনা। তিনি সুইডেনের একজন অ্যাটর্নী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি

ভিয়েনা থেকে সুইডেনে পালান। তাঁর কোন টাকাপয়সা না থাকায় কাজের খোঁজ করছিলেন। যেহেতু তিনি বহু ভাষায় লিখতে কইতে পারতেন তাই আমদানী-রপ্তানীর কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ পাবেন ভেবেছিলেন। সবাই জানাল যুদ্ধের জন্য তাদের লোক দরকার নেই, তবে নামটা তারা ফাইলে লিখে রেখে ছিলেন…। একজন লিখেছিলেন: 'আমার ব্যবসা সম্বন্ধে আপনি যা ভাবেন তা ঠিক নয়। আপনি ভুল করেছেন এবং আপনি মহামূর্খ। আমার কোন পত্রলেখক চাই না। যদি দরকার হয়ও আপনাকে নেব না কারণ আপনি ভালো সুইডিশ ভাষায় লিখতে পারেন না, আপনার চিঠিতে অসংখ্য ভুল।'

জর্জ রনা যখন চিঠিটা পেলেন তখন রেগে আগুন হয়ে গেলেন। লোকটা ভেবেছে কি আমি সুইডিশ ভাষায় লিখতে পারি না! বরং লোকটা যা লিখেছে তাই ভুলে ভরা! তাই জর্জ রনা যা একটা চিঠি লিখতেন তাতে লোকটা জ্বলে পুড়ে মরবে। এবারই রণা একটু থামলেন। তিনি নিজেকে বললেন: 'এক মিনিট দাঁড়াও। কি ভাবে বুঝলে লোকটা ঠিক বলেনি? আমি সুইডিশ ভাষা শিখেছি বটে তবে তা আমার মাতৃভাষা নয়, অতএব ভুল করতেও পারি। তাই কাজ পেতে গেলে আরও ভালো করে ভাষাটা শিখতে হবে। এই লোকটা পরোক্ষ ভাবে উপকারই করেছে। ওর কাছে ঋণী রইলাম! অতএব সে যা করেছে তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখব।'

অতএব জর্জ রনা এবার আগের চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে নতুন একটা চিঠি লিখলেন: 'আপনি একজন পত্রলেখক না চাইলেও কষ্ট করে যে চিঠিটা লিখেছেন তার জন্য ধন্যবাদ। আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভুল করার জন্য দুঃখিত। আপনাকে চিঠি লেখার কারণ হল আপনাদের কারবারই শ্রেষ্ঠ শুনেছিলাম। জানতাম না চিঠিতে ব্যাকরণ ভুল করেছি। আমি এজন্য দুঃখিত ও লজ্জিত। এরপর থেকে ভুল সংশোধন করার জন্য ভালো করে সুইডিশ ভাষা শিখব। আত্মোন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

কয়েক দিনের মধ্যেই জর্জ রনা লোকটির কাছ থেকে উত্তর পেলেন, তিনি তাঁকে দেখা করতে বলেছিলেন। রনা দেখা করলেন—আর একটা কাজও পেলেন। জর্জ রনা এইভাবেই আবিষ্কার করলেন যে 'নরম উত্তর দিলে রাগ জল হয়ে যায়।'

আমরা হয়তো আমাদের শত্রুদের ভালোবাসার মত অতখানি সাধু হতে পারব না, তবে আমাদের স্বাস্থ্য আর সুখের জন্য আসুন তাদের ক্ষমা করে সব ভুলে যাই। এটা একটা চমৎকার কাজ। কনফুসিয়াস বলেছিলেন: 'অন্যায় নিগ্রহ ভোগ বা লুণ্ঠিত হওয়া কিছুই নয়, যদি তা মনে না রাখি। আমি একবার জেনারেল আইসেনহাওয়ারের ছেলে জনকে প্রশ্ন করি তার বাবা কি কোনদিন রাগ পুষে রেখেছিলেন? সে উত্তরে বলে, 'না', 'বাবা যাদের পছন্দ করেন না তাদের কথা এক মুহূর্তও ভাবেন না।'

একটা প্রাচীন প্রবাদ আছে 'যে লোক রাগতে জানে না সে মূর্খ, কিন্তু যে রাগ করে না সে বুদ্ধিমান।' নিউইয়র্কের ভূতপূর্ব একজন মেয়র উইলিয়াম জে. গেনরের নীতিও ছিল এই। সস্তা কুরুচিকর খবর কাগজগুলো তাঁর পিছনে লেগেছিল আর এক

উম্মাদ তাঁকে গুলি ও করে, তিনি প্রায় তাতে মরতে বসেছিলেন। হাসপাতালে চিকিৎস সময় তিনি বলেন : 'প্রত্যেক রাতেই আমি সবকিছু আর সবাইকে ক্ষমা করি।' এ অতিরিক্ত আদর্শবাদ ? অতিরিক্ত মিষ্টি কথা ? তাই যদি হয় তাহলে আসুন বিখ্য জার্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ারের কথা শুনি। 'স্টাডিস ইন পেসিমিজম্' রচনা। জীবন তাঁর কাছে দুঃখ আর হতাশায় ভরা ছিল। দুঃখ আর হাহাকা মথিত অবস্থায় থেকেও তিনি বলেছিলেন : 'যদি সম্ভব হয় কারও প্রতি শত্রুতা থা উচিৎ নয়।'

আমি একবার ছ'জন প্রেসিডেন্ট—উইলসন, হার্ডিং, কুলিজ, হুভার, রুজভে আর ট্রুম্যানের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা বার্নার্ড বারুচকে প্রশ্ন করি তাঁর শত্রুদের আক্রম তিনি কিছু মনে করেন কি না। তিনি জবাব দেন : 'কেউই আমায় খারাপ লাগা বা ছোট করতে পারে না, তাদের করতেই দিই না।'

আমি বা আপনি অন্যকে সুযোগ না দিলে তারা কেউই আমাদের ছোট কর পারবে না। লাঠি আর পাথরে আমার হাড় ভাঙতে পারে কিন্তু কথাকে আমি ভ পাই না।

যুগ যুগ ধরে মানুষ খ্রীষ্টের মত মানুষের উপাসনা করেছে যিনি কখনও শত্রু ঘৃণা করেন নি। আমি বহুবার কানাডার জ্যাসপার ন্যাশানাল পার্কে দাঁড়ি বিশ্বের অন্যতম সেরা পর্বতের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়েছি। ওই পর্বত ব্রিটি নার্স এডিথ ক্যাভেলের নামে নামাঙ্কিত—যিনি ১৯১৫ সালের ১২ই অক্টোব সন্ন্যাসিনীর মতই জার্মান ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁ অপরাধ ? তিনি গোপনে বহু আহত ফরাসী আর ইংরেজ সৈন্যকে তাঁ বেলজিয়ামের বাড়িতে রেখে সেবা করেন আর তাদের হল্যাণ্ডে পালাতে সাহায করেন। একজন ইংরেজ পাদ্রী যখন তাঁর মৃত্যুর আগে তাঁর ব্রাসেলসের কারাগার দেখা করতে আসেন এডিথ ক্যাভেল দুটি কথা বলেছিলেন, আর তা ব্রোঞ্জ গ্রানাই পাথরে তাঁর মূর্তির কাছে খোদাই করে রাখা আছে : আমি বুঝতে পারছি শুধু স্বদেশপ্রেমই সব নয়। কারও প্রতিই আমার তিক্ততা বা ঘৃণা নেই। চারবছর পরে তাঁ মৃতদেহ ইংল্যাণ্ডে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে তাঁর স্মৃতিসভ হয়। একবার লন্ডনে এক বছর কাটানোর সময় এডিথ ক্যাভেলের মূর্তির সামনে দাঁড়ি তাঁর বাণী পড়েছিলাম।

শত্রুদের ক্ষমা করা আর ভুলতে পারার একটা পথ হল, আমাদের সব চাইতেও ব কিছু করার শপথ গ্রহণ করা। তাহলে আমরা অপমান ও শত্রুতার কথা ভুলে যা আর আমাদের কাজই আমাদের কাছে বড় হয়ে উঠবে। উদাহরণ হিসেবে ১৯১ সালের মিসিসিপির পাইনের বনে যে নাটকীয় ঘটনার জন্ম নেয় সেটাই দেখা যাক বিনা বিচারে মৃত্যুদণ্ড দান বা ঘৃণ্য লিঞ্চিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল একজনকে লরেন্স জোন্স নামে একজন কালা আদমী, যিনি একজন শিক্ষক ও পাদ্রী, তাঁকে লিঞ্চ করার ব্যবস্থা হচ্ছিল। কয়েক বছর আগে লরেন্স জোন্স পাইনী উড কাশি

কুল স্থাপন করেন। এ ঘটনাটা ঘটে বহু আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবেগময় দিনগুলোয়। একটা গুজব রটে যায় যে জার্মানরা নিগ্রোদের উত্তেজিত করে বিদ্রোহে প্ররোচিত করছে। যাকে লিঞ্চ করা হচ্ছিল সেই লরেন্স জোন্স একজন নিগ্রো, সন্দেহ করা হচ্ছিল তিনি নিগ্রোদের প্ররোচিত করছেন। একদল সাদা মানুষ—চার্চের সামনে জমায়েত হয়ে লরেন্স জোন্সকে কিছু লোকের সামনে এই বক্তৃতা করতে শোনে : 'জীবন হল একটা লড়াই আর প্রত্যেক নিগ্রোকে বেঁচে থাকতে গেলে অস্ত্র নিয়ে লড়াই করে জয়লাভ করতে হবে।'

'লড়াই! অস্ত্র!' এই কথাগুলো যুবকদের খেপিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তারা তাই একজোট হয়ে রইলো, পাদ্রী গির্জায় ফিরে এলে তার গলায় একটা দড়ি পরিয়ে এক মাইল দূরে টেনে নিয়ে এক বাশ শুকনো কাঠের উপর দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর তারা সবাই ঠিক করল তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে আর সেই সঙ্গে আগুনেও পোড়ানো হবে। ঠিক তখনই একজন চেঁচিয়ে বললো, 'পোড়ানোর আগে ঘ্যানর ঘ্যানর মশাইর কাছ থেকে কিছু শোনা যাক। বল! কিছু বল!' লরেন্স জোন্স কাঠের গাদার উপর দাঁড়িয়ে গলায় সেই দড়ি নিয়ে তাঁর জীবন আর আদর্শের কথা শুনিয়ে গেলেন। তিনি ১৯০৭ সালে আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। তাঁর সুন্দর চরিত্র, তাঁর জ্ঞান, তাঁর সঙ্গীতে দক্ষতা ইত্যাদির ফলে তিনি ছাত্র আর অধ্যাপক, সকলের কাছেই জনপ্রিয় হন। স্নাতক হওয়ার পর তিনি একজন হোটেল মালিকের সঙ্গে ব্যবসার আমন্ত্রণ আর সঙ্গীত শিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কেন? কারণ তিনি এক আদর্শের পূজারী ছিলেন। বুকার টি, ওয়াশিংটনের জীবনী পাঠ করে তিনি ভেবেছিলেন দারিদ্র্য পীড়িত, অশিক্ষিত নিগ্রো জাতের মানুষের সেবায় তাঁর জীবন নিয়োজিত করতে চান। তাই তিনি দক্ষিণের সবচেয়ে অনগ্রসর অংশ জ্যাকসন থেকে পঁচিশ মাইল দক্ষিণে মিসিসিপিতে চলে যান। মাত্র পৌনে দু ডলারে তাঁর ঘড়িটি বাঁধা দিয়ে তিনি জঙ্গলের মধ্যে এক খোলা জায়গায় তাঁর স্কুল খোলেন। লরেন্স জোন্স ক্রুদ্ধ জনতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, গরীব ছাত্রদের শিক্ষিত করে তুলতে কি অমানুষিক পরিশ্রমই না তিনি করেন। তিনি তাঁদের একথাও জানান পাইনী উড কান্ট্রি স্কুল খোলার জন্য কোন কোন সাদা মানুষরা তাঁকে জমি, কাঠ, শুয়োর, গরু আর টাকা দেন।

এরপর লরেন্স জোন্সকে যখন প্রশ্ন করা হয় যারা গলায় দড়ি পরিয়ে আগুনে পোড়াতে চায় তাদের তিনি ঘৃণা করেন কিনা। এর জবাবে তিনি বলেছিলেন—নিজের কাজ নিয়ে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত তাই ঘৃণা করার সময় তাঁর নেই, নিজের চেয়েও বড়, কাজ করবার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত। তিনি বলেছিলেন, 'আমার ঝগড়া করার সময় নেই, সময় নেই অনুশোচনা করার আর কোন মানুষই আমাকে ঘৃণা করার মত নিচে নামাতে পারবে না।'

লরেন্স জোন্স যখন আন্তরিকতার সঙ্গে সুন্দর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, এবং যখন নিজের জীবন ভিক্ষা না চেয়ে নিজের কাজ সম্বন্ধে ওকালতি করছিলেন, তখন জনতা আস্তে

আস্তে নরম হতে আরম্ভ করল। অবশেষে একজন বৃদ্ধ জনতার মাঝখান থেকে ব উঠলেন: 'আমি বিশ্বাস করি এই ছেলেটি সত্য কথাই বলছে। যে সাদা লোকে নাম ও করেছে তাদের আমি চিনি। ও ভাল কাজ করছে। আমরাই ভুল করেছি আমাদের উচিত ওকে ফাঁসি না দিয়ে সাহায্য করা।' এই বলে তিনি তাঁর টু সকলের সামনে ধরলেন—আর বাহান্ন ডলার সাহায্য তুলে দিলেন ঠিক তাদেরই ক থেকে—যারা পাইনী উড স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাকে একটু আগে ফাঁসি দিতে যাচ্ছিল।

এপিকটেটাস উনিশ শতাব্দী আগে বলেছিলেন; যে যেরকম কাজ করে। তদনুরূপ ফলই পায়।' তিনি আরও বলেন, "শেষ পরিণতিতে প্রত্যেক মানুষই ত কুকর্মের ফল পায়। যে মানুষ একথা মনে রাখে সে কোন কারণেই রাগ করে অসন্তুষ্ট হয় না। কুৎসা রটনা করেনা, কাউকে দোষ দেয় না কাউকে ঘৃণ করেনা।'

আমেরিকার ইতিহাসে সম্ভবতঃ লিঙ্কনের চেয়ে আর কাউকে এত ঘৃণা, নি বা ঠকানো হয়নি। তাসত্ত্বেও হার্নডনের লেখা তাঁর বিখ্যাত জীবনী অনুসা 'মানুষকে লিঙ্কন কখনও তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ দিয়ে বিচার করতেন ন যদি কোন কাজ করানো প্রয়োজন দেখা দিত তিনি ভাবতেন তাঁর শত্রুও সেকাজ কর পারে। কোন লোক তাঁকে গালমন্দ করে থাকলেও সে যদি কাজটি করার উপযুক্ত হ তিনি তাকেই সে কাজের ভার দিতেন যেটা তাঁর যে কোন বন্ধুকেও দিতে পারতে ...আমার মনে হয় তিনি কখনই তাঁর ব্যক্তিগত শত্রু হওয়া সত্ত্বেও বা তাঁকে অপছ করলেও কাউকে কাছ থেকে সরিয়ে দেন নি।'

লিঙ্কন যেসব মানুষকে উঁচু পদে বসান যেমন, ম্যাকলেলান, সেওয়ার্ড, স্ট্যান আর চেজ—তাঁরা অনেকেই তাঁকে অপমান ও প্রকাশ্যে নিন্দা করেন। তাসত্ত্বে 'হার্নডনের কথা অনুযায়ী, লিঙ্কন কখনই তাদের নিন্দা করেন নি। লিঙ্কন বলে 'কোন লোককেই তার কাজের জন্য বেশি প্রশংসা বা নিন্দা করা উচিত নয়। কা আমরা সকলেই অবস্থা, পরিবেশ, শিক্ষা, অভ্যাস, বংশগত ধারা ইত্যাদির উপ নির্ভরশীল আর তাই চিরকাল থাকব।'

লিঙ্কন সম্ভবতঃ ঠিকই বলেছিলেন। আমি বা আপনি যদি আমাদের শত্রুদের ম শারীরিক, মানসিক আর আবেগমণ্ডিত হতাম তাহলে হয়তো তাদের মতই ব্যবহ করতাম। হয়তো অন্য কিছু আমরা করতে পারতাম না। তাই আসুন আমরা এ আমেরিকার আদিম অধিবাসী সিউক্স ইণ্ডিয়ানদের মত প্রার্থনা করি: হে মহান দেব আমি যতক্ষণ না অন্য একজনের মত অবস্থায় অন্ততঃ দুসপ্তাহ কাটাচ্ছি ততক্ষণ যে তার সমালোচনা না করি।' তাই আমাদের শত্রুদের ঘৃণা করার বদলে আসুন তা অনুকম্পা জানাই আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে তাদের মত জীবন কাটাতে হয়নি শত্রুদের দুর্নাম না দিয়ে আর প্রতিশোধ গ্রহণ না করে আসুন তাদের জন্য সাহা প্রার্থনা আর ক্ষমা করি।'

আমি যে পরিবারে জন্মেছি সেখানে প্রত্যেক রাতে বাইবেল থেকে পাঠ ক

প্রার্থনা করা হত। আমার মনে পড়ছে বাবার কথা—যিনি মিসৌরীর খামারে বসে এই কথাগুলো আবৃত্তি করতেন : 'শত্রুকে ভালোবাসো। যে তোমায় অভিশাপ দেয়, তাকে আশীর্বাদ কর, যারা ঘৃণা করে তাদের ভালো কর। যারা তোমায় শাস্তি দেয় তাদের জন্য প্রার্থনা কর।'

আমার বাবা যীশুর ওই কথাগুলো মেনে চলার চেষ্টা করতেন। এতে তিনি অন্তরের শান্তি পান, যে অন্তরের শান্তির জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা আর সেনাপতিরা হন্যে হয়েও তা পাননি।

শান্তি আর সুখের জন্য তাই দু-নম্বর নিয়ম হল :

'কখনই শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবেন না, তাতে তাদের ক্ষতি করার চেয়ে নিজেরই ক্ষতি হয়। বরং জেনারেল আইসেনহাওয়ার যা করতেন তাই করা ভালো : 'যাদের পছন্দ করিনা তাদের নিয়ে যেন এক মিনিটও ভেবে সময় নষ্ট না করি।'

॥ চোদ্দ ॥

এভাবে চললে অকৃতজ্ঞতা আপনাকে চিন্তায় ফেলবে না

সম্প্রতি আমার সঙ্গে টেক্সাসের একজন ব্যবসায়ীর দেখা হয়, ভদ্রলোক সব সময় মেজাজ খারাপ করেই থাকতেন। আমাকে আগেই কেউ কেউ বলেছিল তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই সে তার মেজাজ খারাপের কথাটা শোনাবে। তিনি করলেনও তাই। যে ঘটনার জন্য তার রাগ সেটা ঘটে প্রায় এগারো মাস আগে—অথচ তিনি এখনও সেটা ভুলতে পারেন নি। অন্য কোন বিষয়ে তিনি কথাও বলতেন না। তিনি তাঁর চৌত্রিশজন কর্মচারিকে মোট দশ হাজার ডলার বড়দিনের বোনাস হিসেবে দিয়েছিলেন প্রত্যেককে প্রায় তিনশ ডলার করে—এজন্য কিন্তু কেউ তাঁকে ধন্যবাদও দেয়নি। ভদ্রলোক অভিযোগ করেছিলেন, 'আমি দুঃখিত যে ওদের এত টাকা দিয়েছিলাম।'

কনফুসিয়াস বলেছিলেন 'কোন ক্রুদ্ধ লোক সবসময় বিষময়', ওই লোকটি এতই বিষময় ছিলেন যে সত্যিই তাঁর প্রতি আমার করুণা হয়। ভদ্রলোকের বয়স ছিল প্রায় যাট। বীমা প্রতিষ্ঠানের লোকরা বলেন আমাদের বর্তমান যা বয়স আর আশি বছরের মধ্যে যেটা বাকি থাকে তার দুই তৃতীয়াংশ আমরা সাধারণতঃ বাঁচি। এই লোকটি—ভাগ্যবান হলে—হয়তো আর চোদ্দ পনেরো বছর বাঁচবেন। অথচ তিনি তাঁর বাকি জীবনের একটা পুরো বছর শুধু তিক্ততায় আর মেজাজ খারাপের মধ্য দিয়ে নষ্ট করেছেন শুধু অতীতের একটা ঘটে যাওয়া ব্যাপার নিয়ে। আমি তাঁকে করুণা করি।

এই ব্যাপারে ওই রকম ঘ্যানর ঘ্যানর না করে তিনি অবশ্যই আত্ম সমালোচনা করে জানার চেষ্টা করতে পারতেন কেন তিনি ধন্যবাদ পান নি। হয়তো কর্মচারিদের তিনি কম মাইনে দিতেন বা বেশি খাটাতেন। হয়তো তারা ভেবেছিলো বোনাসটা তারা বড়দিনের উপহার হিসেবে পায় নি, ওটা তাদের পাওনা। হয়তো তিনি সবসময় সমালোচনা করেন বা তার কাছে সবাই যেতে ভয় পায়। তাই কেউ তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চায়নি। এটাও হতে পারে তিনি বোনাস দিয়েছিলেন বেশির ভাগ টাকাই কর দিতেই চলে যায় বলে।

অন্যদিকে এমনও হতে পারে কর্মচারিরাই ছিল স্বার্থপর, নীচমনা, অভদ্র। হয়তো এটাই—হয়তো বা অন্য কিছু আমার তা জানার সুযোগও নেই। তবে আমি ডক্টর স্যামুয়েল জনসনের কথাটা জানি: 'কৃতজ্ঞতা বোধ অনেক কষ্টেই জাগ্রত হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে সেটা আশা করা বাতুলতা।'

আমি যা বলতে চাই তা হল এই: এই লোকটি সাধারণ মানুষের মত দুঃখজনক

একটা ভুল করেছিলেন কৃতজ্ঞতা আশা করে। মানব চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণাই ছিলোনা।

আপনি যদি কোন মানুষের জীবন বাঁচান তাহলে কি কৃতজ্ঞতা আশা করবেন? হয়তো তাই করবেন—তবে স্যামুয়েল লিবোউইৎস, যিনি বিচারক পদ পাওয়ার আগে বিখ্যাত ফৌজদারী উকিল ছিলেন, অন্ততঃ আটাত্তর জনকে বৈদ্যুতিক চেয়ারে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান। এই সব মানুষদের মধ্যে কতজন তাঁকে বড়দিনে মনে রেখেছে ভাবছেন? কতজন বলুন তো?···একজনও না? ঠিকই বলেছেন।

যীশুখ্রীষ্ট একদিন বিকেলে দশজন কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করেছিলেন। তাদের মধ্যে কজন তাঁকে ধন্যবাদ দেয়? মাত্র একজন। এটা বাইবেলে পাবেন। খ্রীষ্ট যখন তাঁর শিষ্যদের প্রশ্ন করলেন, 'আর নজন কোথায়?' তারা সকলেই পালিয়ে গিয়েছিল। তারা ধন্যবাদ না দিয়েই পালায়। আপনাদের একটা প্রশ্ন করি আসুন: আপনি বা আমি বা ওই মালিক—বেশি ধন্যবাদ আশা করে স্বয়ং যীশুই যখন তা পাননি, আপনি বা আমি যীশুর চাইতে কম কাজ করেও ধন্যবাদ আশা করব কেন?

আর এটা আবার যখন টাকা পয়সার ব্যাপারে হয়, তখন ব্যাপারটা খুবই খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। চার্লস্ শোয়াব আমাকে বলেছিলেন যে তিনি একবার ব্যাঙ্কের টাকা নিয়ে ফাট্কা খেলে তা নষ্ট করার অপরাধ থেকে একজন ক্যাশিয়ারকে বাঁচান। এই লোকটিকে চার্লস শোয়াব টাকা দিয়ে জেলে যাওয়া থেকে বাঁচান। ক্যাশিয়ার কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে?—হ্যাঁ, তবে অল্প সময়ের জন্য। পরে সে শোয়াবের নানা রকম নিন্দা করতে থাকে—অথচ তাকেই শোয়াব জেল থেকে বাঁচান।

আপনি যদি আপনার কোন আত্মীয়কে দশলক্ষ ডলার দেন তাহলে কি আশা করবেন তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন? আন্ড্রু কার্নেগী ঠিক তাইকরেছিলেন। অ্যান্ড্রু কার্নেগী যদি কবর থেকে কদিন পরে উঠে আসতেন তাহলে দেখতেন আর ব্যথিত হতেন যে সেই আত্মীয় তাঁকে গালাগাল দিচ্ছে। কেন? কারণ বৃদ্ধ অ্যান্ড্রু প্রায় ত্রিশ কোটি ডলার সাধারণ মানুষের জন্য দান করে যান—অথচ আত্মীয়টির ভাগে মাত্র দশ লক্ষ ডলার!'

দুনিয়ায় এই রকমই ঘটে। মনুষ্য চরিত্র এই রকমই···আপনার সারা জীবনেও তা বদলাবার আশা নেই। তাহলে এটাই গ্রহণ করুন না কেন? এ ব্যাপারে মার্কাস অরেলিয়াসের মত বাস্তববাদী হওয়াই তো ভালো। রোমান সাম্রাজ্যের শাসকদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে জ্ঞানী। তিনি তাঁর ডায়েরীতে একদিন লেখেন: 'আমি আজ একদল লোককে দেখতে যাচ্ছি যারা খালি কথা বলে—এমন সব লোক যারা স্বার্থপর, অহঙ্কারী, অকৃতজ্ঞ। তবে আমি এতে আশ্চর্য হবনা, কারণ এ রকম মানুষ ছাড়া পৃথিবীকে ভাবতেই পারিনা।'

কথাটার বেশ অর্থ রয়েছে, তাই না? আপনি বা আমি যদি অকৃতজ্ঞতা নিয়ে ক্রমাগত মাথা ঘামাই দোষটা কার? এটাই মানব চরিত্র—না মানব চরিত্র সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা? আসুন আমরা আর কৃতজ্ঞতা আশা করব না। তাই মাঝে মাঝে

হঠাৎ যদি তা পাই তাহলে আনন্দে আত্মহারাই হব। আবার কেউ তা না দিলে দুঃখিত হব না।

এই পরিচ্ছেদে যা বলতে চাইছি তার প্রথম কথা এই : কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ভুলে যাওয়াই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই যদি আমরা কৃতজ্ঞতা আশা করি তার বদলে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী

আমি নিউ ইয়র্কের এক মহিলাকে চিনি যিনি সব সময় একাকী বলে অনুযোগ করেন। তাঁর একজন আত্মীয়ও তাঁর কাছে আসতে চায়না—এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তাঁর কাছে কখনও যদি যান তিনি আপনাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শোনাবেন—তিনি তার ভাইঝিদের কেমন ভাবে ছোটবেলায় হাম, মাম্পস, হুপিং কাশি ইত্যাদিতে সেবা করেছেন, কিভাবে তাদের আশ্রয় দিয়েছেন, একজনকে স্কুলে পাঠিয়েছেন, একজনের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আশ্রয় দিয়েছেন।

ভাইঝিরা তাঁকে কি দেখতে আসে ? ওহ্ হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আসে—নবে নেহাতই কর্তব্যের খাতিরে। তবে এসবে তারা কাছে আসতে ভয় পায়। তারা জানে এলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের অনুযোগ শুনে যেতে হবে। সমস্তক্ষণ ধরে ঘ্যানর ঘ্যানর এবং গালাগাল শুনতে হবে। যখন ভাইঝিদের বকাবকি শেষ হয় তখন তাঁর হৃদরোগ দেখা দেয়।

হৃদরোগটা কি আসল ? হ্যাঁ, সেটা আসল। ডাক্তারদের মতে তাঁর বুকে প্রচন্ড ধুকধুকুনি আছে। ডাক্তাররা এটাও বলছেন তাদের করার কিছু নেই কারণ এর সবটাই আবেগের কারণে।

এই মহিলাটি আসলে যা চান তা হলো একটু ভালোবাসা আর স্নেহ। অথচ তিনি একে বলেন 'কৃতজ্ঞতা'। কিন্তু তিনি কোন কালেই কৃতজ্ঞতা পাবেন না কারণ তিনি তা দাবী করেন। তাঁর ধারণা এটা তার পাওনা।

তাঁর মত এমন হাজার হাজার স্ত্রীলোক আছেন, 'অকৃতজ্ঞতা', একাকীত্ব আর অবহেলার শিকার। তাঁরা ভালোবাসা চান, কিন্তু এই পৃথিবীতে ভালোবাসা পাওয়ার একটাই পথ আছে, আর তা হল ফেরত পাওয়ার আশা না করে ভালোবেসে যাওয়া।

কথাটা নিছক আদর্শবাদের মত শোনাচ্ছে ? মোটেই তা নয়। এটা সাধারণ জ্ঞানের কথা। যে সুখ আমরা সন্ধান করি এটা আমার বা আপনার পাওয়ার পক্ষে একটা খুব ভালো উপায়। এটা আমার জানা, কারণ আমার পরিবারেই এটা ঘটেছে। আমার বাবা আর মা সাহায্যের আনন্দেই অন্যকে সাহায্য করতেন। আমরা গরীবই ছিলাম—সব সময় ধার দেনা হতো। তা সত্ত্বেও যতই গরীব হোন, আমার বাবা মা প্রতি বছর অনাথ আশ্রমে টাকা পাঠাতেন। সেটা ছিলো আইওয়াতে। বাবা মা সেটা কোনদিন দেখেন নি। আশ্রমের উপকারের জন্য কেউ বাবা মাকে ধন্যবাদও দেয়নি—একমাত্র চিঠিতে ছাড়া। তবুও বাবা মা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাহায্য করে, কোন রকম কৃতজ্ঞতা ছাড়াই আনন্দ পেতেন।

বাড়ি ছেড়ে আসার পর আমি বাবা আর মাকে বড়দিনে কিছু টাকার চেক পাঠিয়ে

জানাতাম কোন সখের জিনিস কিনতে। কিন্তু তাঁরা কদাচিৎ তা করতেন। বড়দিনের কিছু আগে আমি বাড়ি এলে বাবা মা আমায় জানাতেন, প্রচুর সন্তান সহ এক গরীব মহিলার জন্য তাঁরা কয়লা আর খাদ্য কিনেছেন। এই উপহার পেয়ে তাদের কত আনন্দ কিন্তু কিছু ফিরে না পাওয়ার আশা করে দান করা আনন্দও কতখানি।

আমার বিশ্বাস বাবা অ্যারিস্টটলের 'আদর্শ মানুষ' হবারই যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, 'আদর্শ মানুষ সেই, যে অন্যের উপকার করে আনন্দ পায়—আর অন্যে উপকার করলে লজ্জিত হয়। কারণ কোন দান করা মহত্বের লক্ষণ আর তা গ্রহণ করা নীচতা।'

এ পরিচ্ছেদে যা বলতে চাই এ হলো তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য : 'আমরা যদি সুখী হতে চাই তাহলে কৃতজ্ঞতা বা অকৃজ্ঞতার কথা ভুলে যাওয়া ভাল—আর দান করার আনন্দেই দান করা উচিত।'

দশ হাজার বছর ধরে বাবা মায়েরা অকৃতজ্ঞ ছেলেমেয়ের কথা বলে আসছেন এবং নিজেদের চুল ছিঁড়ছেন।

এমন কি শেক্সপীয়ারের রাজা লিয়ার বলেছেন : 'যে সন্তান অকৃতজ্ঞ তার দাঁতের ধার সাপের চেয়েও বেশি।'

কিন্তু ছেলেমেয়েদের আমরা না শেখালে তারা কৃতজ্ঞ হবে কেমন করে? অকৃতজ্ঞতা খুবই স্বাভাবিক—আগাছারই মত। কৃতজ্ঞতা হল গোলাপের মত। তাকে যত্ন করতে হবে, জল দিতে হবে, রক্ষা করতে হবে।

আমাদের সন্তানরা অকৃতজ্ঞ হলে দায়ী কে? হয়তো আমরাই। আমরা যদি তাদের অন্যের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে না শেখাই তারা কি করে আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে?

আমি শিকাগোয় একজনকে চিনি যিনি তাঁর সৎ ছেলেদের অকৃতজ্ঞতা সম্পর্কে অনুযোগ করে থাকেন। তিনি একটা বাক্স তৈরির কারখানায় ক্রীতদাসের মত খেটে সপ্তাহে মাত্র চল্লিশ ডলার পেতেন। তিনি এক বিধবাকে বিয়ে করেন। সেই মহিলা তাঁর ছেলেদের কলেজে পাঠাতে বলায় তাঁকে ধার করতে হয়। সপ্তাহের মাত্র চল্লিশ ডলার দিয়েই তাঁকে খাওয়া, বাড়ি ভাড়া, কয়লা, কাপড় কিনতে হত আর ধারও শোধ করতে হত। চারবছর কোন অভিযোগ না করে তিনি এসবই কুলির মত খেটে করে যান।

কিন্তু এজন্য কি কোন ধন্যবাদ পান তিনি? না—তাঁর স্ত্রী আর ছেলেরা এটা তাঁর কর্তব্য বলেই ধরে নেয়। ছেলেরা ভাবেই নি তাদের সৎ বাবার এজন্য কোন কিছু পাওনা আছে—এমনকি ধন্যবাদও।

দোষটা কার? ছেলেদের? হ্যাঁ—তবে মা-র দোষ আরও বেশি। মা ভেবেছিলেন ছেলেরা কারও কাছে ঋণী, এই চিন্তা থাকা উচিত নয়। তিনি কখনই বলেন নি, 'তোমাদের বাবা কত সুন্দর কলেজে পড়াচ্ছেন।' বরং ভাব দেখাতেন 'এর চেয়ে আরও ভালো করা উচিত ছিল।'

তিনি ভাবতেন তিনি ছেলেদের ভালোর জন্যই এটা করছেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি ছেলেদের একটা বিপজ্জনক ধারণা সৃষ্টি করছিলেন যে, কারও ধার ধারার দরকার নেই।

এই ধারণাটা শেষ পর্যন্ত বিপজ্জনকই হয়, কারণ ছেলেদের মধ্যে একজন এক কোম্পানীর মালিকের কাছে কাজ করত। ধার করে শেষ পর্যন্ত জেলে যায়।

আমাদের জানা দরকার আমরা সন্তানদের যেভাবে গড়ে তুলি তারা সেই ভাবেই বেড়ে ওঠে। একটা উদাহরণ দিই—আমার মাসী, মিনিয়াপোলিসের ভায়োলা আলেকজাণ্ডার হলেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তাঁকে কোনদিন সন্তানদের অকৃতজ্ঞতার জন্য অনুযোগ জানাতে হয়নি। ভায়োলা মাসী তাঁর মাকে কাছে এনে প্রচুর যত্ন করতেন। আর ঠিক সেটি করতেন তাঁর শাশুড়ীকেও। এখনও চোখ বুজে স্মরণ করতে পারি ভায়োলা মাসীর খামার বাড়িতে চুল্লীর সামনে দুই বৃদ্ধা বসে আছেন। তারা কী মাসীকে ঝামেলায় ফেলতেন? ফেলতেন না তা বলব না। তবে মাসী দুই বৃদ্ধাকে খুবই যত্ন করতেন আর ভালোবাসতেন। তাছাড়া মাসীর নিজের ছ'টি ছেলেমেয়ে ছিল—তাঁর কখনই মনে হতো না তিনি কোন মহৎ কাজ করছেন আর সেজন্য লোকে তাকে পুজো করবে। তাঁর কাছে কাজটা ছিল অতি স্বাভাবিক আর সেটাই তিনি করতে চেয়েছিলেন।

ভায়োলা মাসী এখন কোথায়? বছর কুড়ির মত হল তিনি বিধবা হয়েছেন—তাঁর পাঁচটি বড় ছেলেমেয়েও আছে—তারা সবাই মাকে কাছে রাখতে চায়। তাঁর ছেলে মেয়েরা তাকে দারুণ ভালোবাসে। তারা ভাবে মাকে পুরোপুরি কাছে পাচ্ছে না! এটা কি কৃতজ্ঞতা থেকে? বাজে কথা। এ হলো ভালোবাসা—নিছক ভালোবাসা! এই সব ছেলেমেয়েরা শিখেছে তাদের ছোটবেলায় মানবিকতার ঔদার্যের মধ্যে। এটা কি আশ্চর্য লাগছে যে ব্যপারটা এখন ঠিক উল্টো হয়ে গেছে আর তারা সেই ভালোবাসাই ফিরিয়ে দিচ্ছে?

অতএব মনে রাখতে হবে কৃতজ্ঞ সন্তান চাইলে তাদের কৃতজ্ঞ হবার শিক্ষা দেওয়া চাই। আমাদের মনে রাখা দরকার ছোটছেলেমেয়েরা কথাবার্তা শুনতে ওস্তাদ হয়। এরপর তাই আমরা যেন তাদের সামনে কারও নিন্দে না করি। কখনও বলা উচিত নয়, 'এই দেখ সুসান তোয়ালে পাঠিয়েছে, এতে ওর একপয়সাও খরচ হয়নি।' বরং বলা উচিত, এই তোয়ালে পাঠাতে সুসানের কত পরিশ্রম হয়েছে। ভারি চমৎকার, তাই না? তাকে ধন্যবাদ দিয়ে চমৎকার চিঠি লিখতে হবে।' এতে আমাদের সন্তানরা অবচেতন মনেই ধন্যবাদের ঔদার্য শিখতে থাকবে।

তাই অকৃতজ্ঞতার দুঃখ আর যন্ত্রণা ভোলার জন্য তিন নম্বর নিয়ম হল:

(ক) অকৃতজ্ঞতার জন্য দুশ্চিন্তা না করে বরং সেটা আশা করাই ভালো। মনে রাখা দরকার স্বয়ং যীশু একদিন দশজন কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করে দিয়েও কারও কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা পাননি। তাহলে যীশু যা পাননি আমরা তা আশা করব কেন?

(খ) মনে রাখবেন শান্তি পাওয়ার একটা পথই আছে—কৃতজ্ঞতা আশা না করা এবং তার পরিবর্তে দান করে আনন্দ পাওয়া।

(গ) মনে রাখবেন 'কৃতজ্ঞতা' হলো শিক্ষা সাপেক্ষ, তাই আমাদের সন্তানদের যদি কৃতজ্ঞ দেখতে চাই তাহলে তাদের সেই ভাবেই শিক্ষা দিতে হবে।

॥ পনেরো ॥

আপনার সম্পদ হাতবদল করবেন ?

হ্যারল্ড অ্যাবটকে বহু বছর ধরেই আমি চিনি। তিনি ৮২০ নং সাউথ ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ, মিসৌরীর ওয়েবসিটিতে থাকেন। তিনি আমার বক্তৃতার ম্যানেজার ছিলেন। তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় কানসাস সিটিতে। তিনি আমায় তাঁরই গাড়িতে আমার বেলটনের খামারে পৌঁছে দেন। পথ চলতে চলতে আমি তাঁকে প্রশ্ন করি উদ্বেগকে তিনি কেমন করে সরিয়ে রাখেন? উত্তরে তিনি এমন একটা উদ্বুদ্ধ করা গল্প শোনান যা কোনদিনই ভুলতে পারবো না।

তিনি বলেন 'আমি আগে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা করতাম', 'তবু ১৯৩৪ সালের বসন্তকালে একদিন ওয়েব সিটির ওয়েস্ট ডুহার্টি বরাবর বেড়ানোর সময় এমন একটা দৃশ্য আমার চোখে পড়লো যাতে আমার সব দুশ্চিন্তা দূরে হয়ে গেলো। মাত্র দশ সেকেণ্ডে ব্যাপারটা ঘটে যায়। কিন্তু ওই দশ সেকেণ্ডে আমি যা শিখেছিলাম দশ বছরেও তা পারিনি।

'বিগত দু'বছর ধরে ওয়েব সিটিতে আমি একটা মুদীখানার দোকান চালিয়ে আসছিলাম। কাজটা করতে গিয়ে আমার সর্বস্ব যে হারাই তাই নয়, এমন ঋণগ্রস্ত হই যে সেটা শোধ করতে ৭ বছর লেগে যায়। আমার মুদী দোকান গত শনিবার থেকে বন্ধ হয়ে গেছে, আর এখন আমি চলেছি ব্যাঙ্কে কিছু টাকা ধার করতে যাতে কানসাস সিটিতে গিয়ে একটা চাকরির খোঁজ করতে পারি। পরাজিত এক মানুষের মতই আমি চলেছিলাম। তখনই আচমকা আমার নজরে পড়লো একজন লোক আসছে যার দুটো পা নেই। সে একটা ছোট স্কেটিং করার চাকা লাগানো কাঠের তক্তায় বসে হাতে একখণ্ড কাঠ দিয়ে সেটা ঠেলে নিয়ে আসছিলো। সে লোকটি রাস্তা পার হওয়ার ঠিক পরেই তার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হলো। সে চমৎকার হাসি দিয়ে আমায় অভ্যর্থনা জানালো। 'সুপ্রভাত স্যার অতি চমৎকার সকাল তাই না?' তার দিকে তাকাতেই আমার মনে খেলে গেলো আমি কতোখানি ভাগ্যবান। আমার দুটো পা আছে, আমি হাঁটতে পারি। আমার নিজের উপর ধিক্কার দেওয়ার জন্য লজ্জিত বোধ করলাম। আমি আমার নিজেকেই বললাম ও যদি ওর দুটো পা না থাকা সত্ত্বেও সুখী আনন্দিত আর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকতে পারে তাহলে পা নিয়ে আমি নিশ্চয়ই পারবো। ইতিমধ্যেই আমি বুকে জোর পেতে সুরু করেছিলাম। আমি ব্যাঙ্কের কাছে একশ ডলার ধার নেবো ভেবেছিলাম, এখন ঠিক করলাম দুশো ডলার নেব। আগে ভেবেছিলাম টাকা নিয়ে কানসাস সিটিতে গিয়ে একটা চাকরির

চেণ্টা করবো। এখন ঠিক করে দৃঢ় নিশ্চিত হলাম সেখানে গিয়ে একটা চাকরি পাবোই। আমি ধারও পেলাম আর চাকরিও পেলাম।

এখন আমার স্নানঘরের আয়নার উপর নিচের কথাগুলো সেঁটে রাখা আছে। এগুলো প্রতিদিন সকালে দাড়ি কামানোর সময় আমি পাঠ করি :

'একদিন আমার জুতো ছিলোনা বলে মন খারাপ ছিলো,
সে দুঃখ দূর হয়ে গেলো রাস্তায় যখন দেখলাম একজন মানুষের
দুটো পা নেই।'

আমি একবার এডি রিকেন ব্যাকারকে প্রশ্ন করেছিলাম, প্রশান্ত মহাসাগরে অসহায় ভাবে সঙ্গীদের নিয়ে একটা ভেলায় চড়ে একুশদিন ভেসে বেড়িয়ে কি পেয়েছেন তিনি। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, ওই অভিজ্ঞতা থেকে সবচেয়ে বড় যে শিক্ষা আমি পাই ; তাহলো যদি আপনার ইচ্ছে মত যথেষ্ট খাওয়ার জল থাকে, ইচ্ছেমত খাওয়ার জন্য খাদ্যও থাকে তাহলে কোন ব্যাপারেই কখনও অনুযোগ জানানো উচিত নয়।'

টাইম পত্রিকায় একবার গয়াদাল কানালে আহত এক সার্জেন্টের গল্প বেরিয়ে ছিলো। গোলার টুকরো গলায় লেগে সে আহত হওয়ার পর তাকে রক্ত দিতে হয়। সে ডাক্তারকে একটা চিরকুট পাঠিয়ে প্রশ্ন করে : 'আমি কি বাঁচবো ?' ডাক্তার জবাব দেন, 'হ্যাঁ'। সে এবার লেখে : 'আমি কি কথা বলতে পারবো ?' এবারও উত্তর এলো 'হ্যাঁ'। সে তখন আর একটা চিরকুট পাঠালো : 'তাহলে এতো ভাবনায় পড়ছি কেন ?

আপনিও ঠিক এই ভাবে নিজেকেই প্রশ্ন করতে পারেন : 'আমিই বা এতো দুশ্চিন্তা করছি কেন ?' হয়তো একটু ভাবলেই দেখতে পাবেন চিন্তার কারণটা সত্যিই অকিঞ্চিৎকর।

আমাদের জীবনে শতকরা নব্বই ভাগ ব্যাপারই ঠিক আর মাত্র দশ ভাগই ভুল। আমরা যদি সুখী হতে চাই তাহলে আমাদের সে শতকরা নব্বই ভাগ ঠিক তার উপরেই নজর রাখতে হবে বাকি দশভাগ ভুলকে অগ্রাহ্য করতে হবে।

অন্যদিকে দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়ে যদি পাকস্থলীর আলসারে আক্রান্ত হতে চাই তাহলে ওই শতকরা দশভাগের উপরেই নজর দিয়ে নব্বই ভাগকে অগ্রাহ্য করতে হবে।

ক্রমওয়েলের আমলে ইংল্যান্ডের বহু গীর্জায় 'চিন্তা করুন ও ধন্যবাদ জানান' কথাগুলো খোদাই করা আছে। এই কথাগুলো আমাদের হৃদয়ে গেঁথে রাখা উচিত। আমরা যে যে জিনিসের জন্য কৃতজ্ঞ হতে পারি সেকথাই চিন্তা করা দরকার আর আমাদের সমস্ত রকম সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

গ্যালিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্তের লেখক জোনাথান সুইফটই ছিলেন ইংরাজী সাহিত্যের সবচেয়ে সাংঘাতিক নিরাশাবাদী। তিনি এতোই দুঃখিত থাকতেন যে তিনি সবসময় কালো পোশাক পরতেন আর নিজের জন্মদিনে উপবাস পর্যন্ত করতেন। অথচ তা সত্ত্বেও হতাশায় ভেঙে পড়েও ইংরেজী সাহিত্যের অত বড় নিরাশাবাদীও আনন্দিত আর সুখী থাকার স্বাস্থ্যদায়িণী ক্ষমতার প্রশংসা করেছেন।

তিনি বলেছিলেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ডাক্তার বলেন', 'ডাক্তার কম খাওয়া, ডাক্তার শান্ত থাকা আর ডাক্তায় আনন্দ।

আপনি বা আমি ওই ডাক্তার আনন্দকে প্রতিটি ঘণ্টাই আমাদের কাছে রাখতে পারি শুধু আমরা যদি মনে করি আমাদের অফুরান ঐশ্বর্য—যে সম্পদের পরিমাণ আলিবাবার ধন গুহাকেও হার মানতে পারে! কোটি টাকা পেলে আপনি কি আপনার চোখ দুটো বিক্রি করতে পারবেন ? পারবেন আপনার পা বিক্রি করে দিতে ? আপনার হাত ? আপনার শ্রবণ শক্তি ? আপনার সন্তানদের ? আপনার পরিবার ? সব সম্পদ যোগ করে দেখুন, তাহলেই দেখতে পাবেন রকফেলার, ফোর্ড অথবা মর্গ্যানদের সংগৃহীত সমস্ত সোনার বদলেও আপনি এগুলো বিক্রি করতে পারবেন না।

কিন্তু আমরা কি এটার কথা ভাবি কখনও ? ওহ্, না। সোপেনহাওয়ার যেমন বলেছিলেন: 'আমাদের যা আছে তার কথা আমরা কদাচিতই ভেবে থাকি বরং অধিকাংশ সময় চিন্তা করি যা আমাদের নেই।' এটাই হলো এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিয়োগান্ত ব্যাপার। এটাই পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধ আর রোগের যত দুঃখের সৃষ্টি করেছে তার চেয়ে বেশি দুঃখ এনেছে এই ধরণের চিন্তা।

ঠিক এই চিন্তাই জন পামারকে সুস্থ মানুষ থেকে খুঁতখুঁতে স্বভাবের এক বৃদ্ধে বদলে দেয়। আর তার সংসার প্রায় ভাঙার মুখে এনে দাঁড় করায়। এটা আমার জানা কারণ তিনি নিজেই আমাকে বলেছিলেন।

মিঃ পামার নিউ জার্সির প্যাটার্বিজের ১৯ অ্যাভিনিউতে থাকতেন। তাঁর নিজের কথায় বলি: 'সৈন্যবাহিনী ছেড়ে আসার ঠিক পরেই আমি একটা ব্যবসা আরম্ভ করি। সারাদিন রাতই পরিশ্রম করতাম। সবই বেশ চমৎকার চলেছিলো। তারপরেই গণ্ডগোল আরম্ভ হলো। আমি ব্যবসার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাজারে পাচ্ছিলাম না। ভয় হলো ব্যবসা হয়তো বন্ধ করেই দিতে হবে। আমার দুশ্চিন্তা এমনই বেড়ে গেলো যে সুস্থ মানুষ থেকে খিটখিটে বুড়ো হয়ে গেলাম। তাছাড়া আমি এমনই খিটখিটে আর রাগী হয়ে পড়লাম যে তখনও বুঝতে পারিনি আমার সুখের সংসারটাই ভাঙতে বসেছে। তখন একদিন আমার এক পুরনো প্রতিবন্ধী কর্মচারি আমায় বললো, 'বন্ধু, তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছো যেন পৃথিবীতে একমাত্র তোমারই যত সমস্যা আছে। হয়তো কিছুদিন ব্যবসার দরজা বন্ধ রাখতে হবে—তাতে হলোটা কি ? আবার সব ভালো হলে নতুন করে সুরু করতে পারবে। তোমার যা আছে তাতে তোমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। তা সত্বেও তুমি খালি অনুযোগ জানাচ্ছো, চ্যাচাঁমেচি করছো। বন্ধু, আমার ইচ্ছে করে তোমার অবস্থায় আমি যদি থাকতাম! আমার দিকে একটু তাকিয়ে দেখ। আমার একটা মাত্র হাত আছে, মুখের একটা অংশ উড়ে গেছে, তবুও আমি কোন অনুযোগ জানাচ্ছি না। এই রকম চ্যাচাঁমেচি আর অনুযোগ যদি বন্ধ না করো তাহলে জেনে রেখ শুধু তোমার ব্যবসাটাই হারাবে না, হারাতে হবে তোমার স্বাস্থ্য, সংসার আর বন্ধুবান্ধবকেও!'

'ওই মন্তব্যগুলো আমায় স্তব্ধ, হতবাক করে দিলো। আমি বুঝতে পারলাম আমি কত সুখে আছি। আমি তখন সেই মুহূর্তেই প্রতিজ্ঞা করলাম আমি আবার আগের মতই হব—আর হলামও তাই।'

আমার এক বান্ধবী লুসিল ব্লেক, এক শোচনীয় অবস্থায় পড়তে পড়তেও বেঁচে গিয়েছিলো। তার দুশ্চিন্তাই কেবল ছিলো তার কি নেই, কিন্তু তার কি আছে একবারও চিন্তা করে সে দেখেনি।

লুসিলের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে বেশ কয়েক বছর আগে আমরা যখন কলম্বিয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোট গল্প লেখার পাঠ নিচ্ছিলাম। নবছর আগে সে জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ধাক্কা খায়। সে থাকতো আরিজোনার টাকশনে। তার কাহিনী তার জবানীতেই শুনুন:

'আমি একদম ঘূর্ণীর মতো জীবন কাটাচ্ছিলাম। আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি অর্গ্যান বাজানো শিখছিলাম, তাছাড়াও শিখছিলাম অনেক কিছু, সঙ্গীতবোধ সম্পর্কে ক্লাসে বক্তৃতাও দিতাম। নানা অনুষ্ঠানে, নাচে, ঘোড়ায় চড়ায় অংশও নিতাম একদিন সকালে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলাম। আমার বুকের অসুখ দেখা দিলো। ডাক্তার জানালেন, 'আপনাকে এক বছর বিছানায় শুয়ে কাটাতে হবে, সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।' তিনি একবারও উৎসাহ জানিয়ে বললেন না আবার আগের মত আমি সুস্থ হয়ে উঠতে পারবো।

'বিছানায় শুয়ে এক বছর কাটাতে হবে? শয্যাশায়ী হয়ে—শেষ পর্যন্ত হয়তো মারাই যাবো। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। আমার জীবনে এরকম হলো কেন? আমি কি অপরাধ করলাম যে এমন শাস্তি আমায় পেতে হবে? আমি বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়লাম। এছাড়াও আমি যেন তিক্ত আর বিদ্রোহী হয়ে উঠলাম। তাসত্ত্বেও ডাক্তারের পরামর্শ শুনে শয্যাতেই আশ্রয় নিলাম। আমার প্রতিবেশী শিল্পী মিঃ রুডলফ আমায় বললেন, 'তুমি ভাবছো বিছানায় একবছর শুয়ে থাকা ভারি কষ্টকর কিন্তু দেখে নিও, তাহলে তুমি ভাববার অনেক সময় পাবে আর নিজেকে জানতে পারবে। তোমার সমস্ত আগেকার জীবনটায় যা পারোনি আগামী কয়েক মাসে তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটবে দারুণভাবে।' এসব শুনে আমি কিছুটা শান্ত হলাম আর নতুন কিছু মূল্যবোধ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতে চাইলাম। অনুপ্রাণিত করার মত বই পড়তে লাগলাম আমি। একদিন একজন বেতার ঘোষককে বলতে শুনলাম: 'আপনার জ্ঞানে যা আছে সেটাই আপনি প্রকাশ করতে পারেন। এধরণের কথা আগে বহুবার শুনেছি, কিন্তু এখন কথাগুলো আমার শরীরে এবং মনের গভীরে শিরায় শিরায় যেন ছড়িয়ে গেলো। আমি মনে মনে ঠিক করলাম যে, যে চিন্তা নিয়ে আমি বাঁচতে চেয়েছি তাই শুধু ভেবে চলবো—সে চিন্তা হলো আনন্দ, সুখ, আর স্বাস্থ্য। রোজ সকালে ঘুম ভাঙার পরেই যে সব জিনিসের জন্য আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তাই শুধু ভাবতে আরম্ভ করলাম। কোন যন্ত্রণা নেই। সুন্দর কিশোরী একটি মেয়ে। আমার দৃষ্টি শক্তি। আমার শ্রবণ শক্তি। রেডিওতে চমৎকার গান। পড়ার সময়।

ভালো খাদ্য ভালো বন্ধু। আমি এমনই হাসিখুশি উচ্ছল হয়ে উঠলাম যে প্রচুর বন্ধুবান্ধবী দেখা করার জন্য আসতে সুরু করলে ডাক্তারকে বাধ্য হয়ে একটা নোটিশ টাঙিয়ে দিতে হলো আমার কেবিনে একবারে মাত্র একজন দর্শনার্থীই আসতে পারবেন —তাও আবার নির্দিষ্ট সময়ে।

'এ ঘটনার পর ন'বছর কেটে গেছে আর আমি এখন পরিপূর্ণ সুস্থ অবস্থায় চমৎকার জীবন কাটিয়ে চলেছি। একটা বছর যে আমায় বিছানায় শুয়ে কাটাতে হয়েছে তার জন্যে আমি আজ কৃতজ্ঞ। আরিজোনায় কাটানো ওই একটা বছর আমার কাছে দারুণ মূল্যবান আর সুখের বছর। ওই সময় যে আশীর্বাদ আমি পেয়েছি তা প্রতি সকালে স্মরণ করার অভ্যাসটি আজও আমার রয়ে গেছে। এ আমার কাছে অত্যন্ত দামী কোন সম্পদ। এটা বুঝতে আমি লজ্জাবোধ করি যে যতক্ষণ না আমি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি জানতেও পেরেছি, ততদিন সত্যি বাঁচার কথা আমি অনুভব করতে পারিনি।'

প্রিয় লুসিল ব্লেক তুমি হয় তো উপলব্ধি করতে পারোনি, তবে তুমি যা শিখেছিলে সেই শিক্ষাই লাভ করেছিলেন দুশ বছর আগে ডঃ স্যামুয়েল জনসন। ডঃ জনসন বলেছিলেন: প্রতি ঘটনার ভালো দিকটা দেখা বছরে হাজার পাউন্ডের চেয়েও বেশি মূল্যবান!'

এই কথাগুলো মনে রাখবেন, কোন পেশাদার আশাবাদীর মুখ থেকে বের হয়নি, বরং বেরিয়েছিলো এমন একজন মানুষের মুখ থেকে যিনি বিশ বছর যাবৎ উদ্বেগ, দারিদ্র আর অনাহারে মুখোমুখি হন—আর শেষ পর্যন্ত তিনি সেই আমলের এক বিখ্যাত লেখক এবং সর্বকালের নামী বক্তা হয়ে ওঠেন। লোগান পিয়ারসন স্মিথ অল্পকথার মধ্যে একমুঠো দামী কথা প্রকাশ করেছিলেন এই ভাবে: 'জীবনে দুটো বস্তুর জন্য নজর রাখা উচিত, আপনি যা চান তাই পাওয়া, আর তারপর সেটা উপভোগ করা। একমাত্র শুধু সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষই দ্বিতীয়টি লাভ করে থাকে।'

আপনার কি জানতে ইচ্ছে আছে রান্নাঘরে শুধু ডিস ধোওয়াও কতো উত্তেজনাকর অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়? তা যদি থাকে তাহলে বর্গহিল্ড ডালের লেখা একখানা বই পড়ে দেখতে পারেন। বইখানার নাম **'আমি দেখতে চেয়েছিলাম'**।

এ বইখানা লিখেছিলেন যে মহিলাটি তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে অন্ধই ছিলেন। ভদ্রমহিলা লিখেছেন: আমার মাত্র একটা চোখ ছিলো আর সে চোখও এমন ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো যে সামান্য একটা ফুটো দিয়ে আমায় দেখতে হতো। একেবারে চোখের কাছে এনে প্রায় চোখে লাগিয়েই কোন বই দেখতে পেতাম তারপর লেখা চোখে পড়তো চোখ টান টান করে একেবারে বাঁ পাশে তাকালে।'

এমন হওয়া সত্ত্বেও তিনি কারও অনুকম্পা নিতে চাননি, চাননি অন্যরকম কোন ব্যবহার। ছোটবেলায় অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গে তিনি এক্কাদোক্কা খেলতে চাইতেন, কিন্তু মাটিতে দেয়া দাগ তিনি দেখতে পেতেন না। তাই সব বাচ্চারা খেলার পর বাড়ি চলে গেলে তিনি মাটিতে চোখ লাগিয়ে দাগগুলো দেখার জন্য হামাগুড়ি দিতেন। এমনি

করে মাটির প্রতিটি দাগই তিনি একেবারে মনে গেঁথে রেখেছিলেন। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে তিনি সকলকে প্রায় হারিয়ে দিতেন। বাড়িতেই তিনি লেখাপড়া করতেন, বড় বড় অক্ষরে লেখা বই প্রায় চোখের কাছে ঠেকিয়ে পড়ে ফেলতেন তিনি এমন করেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ডিগ্রী লাভও করেছিলেন। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী আর কলম্বিয়া থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।

তিনি মিনেসোটারা টুইন ভ্যালীতে ছোট্ট এক গ্রামে শিক্ষকতা সুরু করেছিলেন আর শেষ পর্যন্ত তিনি সাউথ ডাকোটার অগাস্টানা কলেজের সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যের অধ্যাপিকা হন। সেখানে তিনি তেরো বছর শিক্ষাদান করেন আর মেয়েদের ক্লাবে বক্তৃতা দেন। তিনি রেডিওতে বই আর লেখকদের উপর কথিকাও প্রচার করেন তিনি লিখেছেন : 'আমার মনের কোণে বরাবরই চিরদিনের মতো অন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তির তির করে কাঁপতো। এটা থেকে বাঁচার জন্যই জীবন সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ আনন্দ উচ্ছল, হাস্যময় একটা ধারণা পোষণ করতাম।'

এরপর ১৯৪৩ সালে তাঁর বয়স যখন বাহান্ন বছর, একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটে যায়। বিখ্যাত মেয়ো ক্লিনিকে তাঁর চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়। এর ফলে তিনি চল্লিশ গুণ বেশিই আগের চেয়ে দেখতে লাগলেন।

এর ফলে তাঁর চোখের সামনে সৌন্দর্যময় উত্তেজনায় ভরপুর একটা দুনিয়ার দরজা খুলে যায়। তিনি রান্নাঘরের বেসিনে ডিস ধোয়ার মধ্যেও অদ্ভুত একটা উত্তেজনার স্পর্শ খুঁজে পেলেন। তাঁর নিজের কথায় ব্যাপারটা এই রকম : 'আমি বেসিনের মধ্যে ডিসে লাগানো সাবানের ফেনা নিয়ে খেলতে আরম্ভ করেছিলাম। ওই সাবানের ফেনায় হাত ঢুকিয়ে ছোট ছোট বুদ্বুদের গোল বল তুলে এনে আলোর সামনে ধরে তার মধ্যে দেখে চলতাম ছোট্ট ছোট্ট রামধনু রঙের খেলা।'

রান্নাঘরের বেসিনের উপরের জানালা দিয়ে তাকাতেই তাঁর চোখে পড়তো সাদাকালো ডানা ঝাপটে তুষার স্তূপের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে চড়ুই পাখির ঝাঁক।

চড়ুই পাখি আর সাবান ফেনার ওই অপরূপ দৃশ্য দেখে তাঁর মন ক্রমশই উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। তিনি তাঁর বইটি শেষ করেন এই কটি কথা দিয়ে : 'প্রিয় ঈশ্বর আমাদের স্বর্গের পিতা, আমি ফিসফিস করে বলি, 'আমি আপনাকে আমার অন্তরে ধন্যবাদ দিই, জানাই আমার প্রণাম।'

একবার ভাবুন আপনি, যেহেতু ডিস ধুতে পারছেন আর সাবানের বুদবুদে রামধনু দেখতে পাচ্ছেন আর তুষারের বুকে চড়ুইকে উড়তে দেখছেন বলে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

আপনার বা আমার নিজেদের সম্বন্ধে লজ্জিত হওয়া উচিত। সমস্ত সময়ে আমরা সৌন্দর্যময় রূপকথার জগতে বিচরণ করে চলেছি। কিন্তু আমরা এমনই অ- যে এসব আমরা দেখেও দেখতে পারিনা, আমরা এতোই পরিপূর্ণ যে আমরা এ আনন্দ উপভোগ করতে পারিনা।

আমরা যদি দুশ্চিন্তা ত্যাগ করে জীবনকে উপভোগ করতে চাই, তাহলে এ নিয়মটাই মেনে চলা উচিত :

'জীবনে যা পেয়েছেন তারই হিসেব করুন, যা পাননি তার নয়।'

॥ ষোলো ॥

নিজেকে আবিষ্কার করুন :
আপনার মত আর কেউ নেই

আমি নর্থ ক্যারোলিনার মাউন্ট এয়ারির মিসেস এডিথ আলরেডের কাছ থেকে খানা চিঠি পাই। চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন : 'ছোট বয়সে আমি অত্যন্ত র্শকাতর আর লাজুক ছিলাম। বয়সের তুলনায় আমার ওজন বড্ড বেশি ছিলো র আমার ফোলা ফোলা গাল দুটোর জন্য আমাকে আরও মোটা দেখাতো। আমার ছিলেন একেবারে সেকেলে ধরনের, তাঁর ধারণা ছিলো সুন্দর পোশাক বানানো া বোকামি। তিনি সব সময় বলতেন : 'ঢিলে ঢালা পোশাক টেকে বেশি, টা পোশাক ছেঁড়ে তাড়াতাড়ি'। সেই ভাবেই তিনি আমায় পোশাক পরাতেন। ম কোনদিন কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিতাম না, কোন আনন্দও করতাম না। াড়া যখন স্কুলে যেতাম অন্য সব ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কোন ব্যাপারে যোগ দিতাম এমন কি খেলাধুলোতেও না। আমি অস্বাভাবিক রকম লাজুক ছিলান। ার খালি মনে হতো আমি বাকি সবাইয়ের চেয়ে আলাদা আর আমাকে ই চায়না।

'আমি যখন বড় হলাম তখন আমার চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড় একজনকে বিয়ে াম। কিন্তু আমার কোন রকম পরিবর্তন হলোনা। আমার শ্বশুর বাড়ির ীয় স্বজনেরা সবাই বেশ ফিটফাট আর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ছিলো। তাদের গত ইচ্ছে ছিলো আমিও তাদের মত হই, কিন্তু কিছুতেই তা আর হলোনা। আপ্রাণ চেষ্টায় তাদের মত হতে চাইলেও পারলাম না। তারা যতোই আমাকে সের মধ্য থেকে বাইরে টেনে আনার চেষ্টা চালালো আমি ততই যেন আরও বেশি খোলসের মধ্যে ঢুকে গেলাম। এতে আমি বেশ অস্বস্তি আর বিরক্তিও বোধ আরম্ভ করলাম। সব বন্ধু বান্ধবদের এড়িয়ে চলতেও সুরু করলাম আমি। অবস্থাটা খারাপ হয়ে দাঁড়ালো যে দরজার ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনতে পেয়েও আমি সিঁটিয়ে থাকতাম। আমি বুঝতে পারতাম আমি সর্বদিক দিয়েই একদম ব্যর্থ। এটা বেশ ভালো করেই বুঝতে পারতাম আর আমার খালি ভয় হতো আমার সব একদিন টের পেয়ে যাবেন। তাই যখনই আমরা বাইরে বেরোতাম, আমি খুশি থাকতে চেষ্টা করতাম এবং তাতে ভয়ে বেশ একটু বাড়াবাড়িই করে ম। আমি বুঝতে পারতাম এই বাড়াবাড়িটা, এবং এরপর কয়েকদিন বেশ অবস্থায় কষ্টে কাটাতাম। শেষ পর্যন্ত আমি এমনই অসুখী হয়ে উঠলাম যে তো আর আমার বেঁচে থাকারই বোধ হয় কোন যুক্তি নেই। আমি আত্মহত্যা কথা ভাবতে সুরু করলাম।'

এই অসুখী মহিলার জীবনধারা কেমন করে কি ভাবে বদলে গেলো জানেন আচমকা বলা একটা মন্তব্যের মধ্য দিয়ে।

'আচমকা বলা একটা মন্তব্যই মিসেস আলরেড তাঁর চিঠিতে লেখেন, 'আম সমস্ত জীবনটাই বদলে দিলো। আমার শাশুড়ি একদিন বলেছিলেন কিভাবে তি তাঁর ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলেন। তিনি বললেন, 'যাই ঘটুক না কেন আ সব সময়েই তাদের নিজের মত চলতে দিতাম'···নিজের মত চলতে দিতাম'···এই মন্তব টাই সব কিছু ওলোট পালোট করে দিলো। একটা বিদ্যুতের পরশেই যেন আ বুঝতে পারলাম, যে অবস্থার সঙ্গে আমার খাপ খায়না আমি তার মধ্যেই কেবল আম মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে চলেছি।

'রাতারাতিই আমি পালটে গেলাম। আমি নিজেকে ফিরে পেয়ে নিজের মত হতে সুরু করলাম। আমি আমার নিজের ব্যক্তিত্ব পর্যালোচনা করতেও সুরু ক দিলাম এবং কি ছিলাম সেটা জানতে চেষ্টা করতে লাগলাম। আমি, আমার দোষ গু সম্পর্কে কি আছে বারবার সেটা জানার চেষ্টা করলাম। আমি রঙ আর পোশাকে কায়দা কানুন পর্যালোচনা করে আমায় যা মানায় সেই পোশাক পরতে সুরুও ক দিলাম। এরপর বন্ধুত্ব লাভের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলাম। একটা প্রতিষ্ঠানে আ যোগদানও করলাম—প্রথমে এক ছোট প্রতিষ্ঠানে—সেখানে আমি ভয়ে প্রায় সিঁটিয়ে গেলাম, যখন দেখলাম তারা আমাকে একটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার ব্যবস্থা করলো কিন্তু প্রতিবার কথাবলার পর থেকেই একটু একটু করে আমার সাহস বেড়ে গেলো এসবে বেশ সময় লেগেছে সেটা ঠিক—তবে আজ আমি যে রকম সুখী তা কেন কাে সম্ভবপর বলে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আমার নিজের ছেলেমেয়েদের মানুষ ক তোলার কাজে আমি বিশেষ ভাবেই তাদের এটাই শিখিয়েছি। যে তিক্ত অভিজ্ঞ আমার জীবনে ভোগ করতে হয়েছে, আর আমি যে শিক্ষাটি লাভ করেছি তাহলো : 'যা ঘটুক না কেন সব সময় নিজের মত হও।'

'নিজের মত হওয়ার ইচ্ছের এই সমস্যা প্রায় ইতিহাসের মতই পুরনো,' কথা বলেন ডঃ জেমস গর্ডন গিলকি। তাঁর আরও বক্তব্য হলো, 'এ ব্যাপারটা আবা মানুষের জীবনের মতই সার্বজনীনও বটে। নিজের মত না হওয়ার এই সমস্যাটা বহ জটিলতা, মনোবিকলন আর মানসিক অশান্তির আড়ালে থেকে গেছে। এঞ্জেলো পাা শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে তেরো খানি বই আর হাজার হাজার সাময়িক খবরে কাগজে প্রবন্ধও লিখেছেন। তাঁর কথা হলো : 'যাঁরা অন্যের মত হওয়ার চেষ্টা কে তাদের মত হতভাগ্য আর কেউ নেই। যদি সে নিজে শারীরিক এবং মানসিক দিক দিে অন্যরকম কিছু হয়'।

নিজে যা নয় সেই রকম হওয়ার চেষ্টা বা ইচ্ছে বিশেষ করেই হলিউডে অত্যং বেশি রকম প্রকট। স্যাম উড, অতীতের একজন হলিউডের অতি প্রখ্যাত পরিচালক বলেছিলেন, উঠতি অভিনেতাদের নিয়ে তাঁর সবচেয়ে বেশি সমস্যা ছিলো এই : তাদে ঠিক নিজেদের মত গড়ে তোলা। সমস্যাটা হলো তারা প্রায় সবাই চাইতো লান

র্নার বা ক্লার্ক গেবেল হয়ে উঠতে। 'জনসাধারণ তো ইতিমধ্যেই বিখ্যাত ওই সব ভিনেতাদের দেখেছে, স্যাম উড তাদের বোঝাতে চাইতেন, 'এখন তারা চায় নতুন ছু।'

'গুডবাই মিষ্টার চিপস্' আর 'ফর হুম দি বেল টোলস্'-এর মত ছবি পরিচালনা রু করার আগে স্যাম উড বহুবছর সম্পত্তি বেচা-কেনার কারবারে কাটিয়েছিলেন, ার কাজ ছিলো ব্যবসার কাজে ব্যক্তিত্ব তৈরি করা। তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে বেসা জগতে যে নীতি চলে ঠিক সেই নীতিই আবার চলে চলচ্চিত্র জগতটাতেও। বন-নুষের মত নকল নবীশ হয়ে কোথাও পৌঁছনো যায় না, এমন কি তোতাপাখি হয়েও াভ নেই। স্যাম উড আরও বলেন, 'অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই আমি শিখেছি, যে মস্ত লোক তারা যা নয় সেটাই হবার ভান করে তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদেয় রা যায় ততই নিরাপদ হওয়া যায়।'

আমি কিছুদিন আগে সোকোনি-ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানীর চাকুরী সংক্রান্ত য়োগ বিষয়ে ডাইরেক্টর পল বয়েনটনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম চাকরির আবেদন করার ময় মানুষ সবচেয়ে বড় ভুল কি করে? তাঁর একথা জানা আছে অবশ্যই, কারণ জীবনে িনি প্রায় ষাট হাজারেরও বেশি আবেদনকারীর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। এছাড়াও তিনি াবার চাকরি পাওয়ার ছটি উপায়' নামে একখানা বইও রচনা করেছেন। তিনি জবাবে লেছিলেন : চাকরির আবেদন করার সময় মানুষ সবচেয়ে বড় যে ভুল করে তা হলো ারা আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে। নিজেদের প্রকৃত তথ্য গোপন রেখে তারা মোটেই খোলা-লি সবকথা বলতে চায়না, বরং এটা না করে তারা এমন সব উত্তর দেয় যা তারা মনে রে আপনি এতে খুব খুশী হবেন। তবে এতে কাজ হয়না কারণ কেউই গোপনীয়তা-শ্রয় মানুষকে চায়না। যেহেতু কোন মানুষই জাল মুদ্রা চায় না।

এই ব্যাপারটা একজন গাড়ির কন্ডাকটারের মেয়েকে বেশ কষ্ট করেই শিখতে য়েছিলো। সে একজন গায়িকা হতে চেয়েছিলো, কিন্তু ওর দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে ঠেছিলো ওর মুখখানা। ওর মুখ বেশ বড় আর দাঁতগুলো সামনের দিকে বেরোনো বস্থায় থাকতো। সে যখন প্রথম জনসাধারণের সামনে গানে অংশ নেয়—নিউ জার্সির ক নাইট ক্লাবে—সে বারবার গান গাওয়ার ফাঁকে উপরের ঠোঁট দিয়ে দাঁত ঢাকার চেষ্টা রছিল। সে অবশ্য আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে "সুন্দরী" প্রমাণ করতে চাইছিলো। র ফল কি হলো? সে নিজেকে হাস্যকর করে তুললো। ব্যর্থতার দিকেই সে এগিয়ে লছিলো।

যাই হোক, ওই নাইট ক্লাবে একজন ছিলেন, তিনি মেয়েটিকে গান গাইতে দেখে ঝেছিলেন ওর প্রতিভা আছে। 'এই যে শোনো', ভদ্রলোক সোজাসুজি বলে ফেল-ন, 'আমি তোমায় গান গাইতে দেখেছিলাম আর আমি জানি তুমি কি লুকোবার ষ্টা করছো। তুমি তোমার দাঁতের জন্য লজ্জা পাচ্ছো।' মেয়েটি বেশ অস্বস্তিতে ড়ে গেলো, তবুও ভদ্রলোক বলে চললেন, 'এতে হয়েছে কি? এরকম দাঁত থাকা ি অপরাধ? এটা লুকোবার চেষ্টা কোরোনা। মুখ খুলেই গান গাইবার চেষ্টা করো

তাতে শ্রোতারা বুঝতে পারবে তুমি লজ্জিত নও। তাছাড়া ভদ্রলোক বেশ দ
নিয়ে বললেন, 'যে দাঁত তুমি লুকোনোর চেষ্টা করছো তাই হয়তো তোমাকে এ
ঐশ্বর্য এনে দেবে!'

ক্যাস ডেলি ভদ্রলোকের উপদেশে সত্যিই দাঁতের কথা ভুলে গেলো। ওই
থেকেই মেয়েটি শুধু ওর শ্রোতাদের কথাই ভাবতে লাগলো। সে মুখ খুলে এমন
স্বরে আর আনন্দে গাইতে আরম্ভ করলো যে অল্পদিনের মধ্যেই সে বেতার আর চল
শিল্পী হয়ে উঠলো। এখন অন্যান্য কমেডিয়ানরা তাকেই নকল করার
করছে।

বিখ্যাত উইলিয়াম জেমস একবার কিছু লোকের কথা বলেছিলেন যারা নিজে
চিনতে পারে না। তাঁর মতে সাধারণ মানুষের মধ্যে মাত্র শতকরা দশ ভাগই নিজে
মানসিক শক্তির উজ্জীবন ঘটাতে পারে। তিনি লিখেছিলেন, 'আমাদের যা হওয়া উ
সে সম্পর্কে আমরা অর্ধ জাগরিত। আমরা আমাদের শারীরিক আর মানসিক ক্ষম
সামান্য অংশই কেবল কাজে লাগাতে পারি। ভালো করে বলতে গেলে একজন ম
নিজের খোলসের মধ্যেই থেকে যায়। তার বহু ধরণের চাপা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও
তার অনেকটাই কাজে লাগাতে পারে না।'

আমার বা আপনার এই ক্ষমতা আছে তাই আমরা অন্য লোকের মত নই এ
ভেবে আর এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করা উচিত নয়। এ পৃথিবীতে আপনারও
নতুনত্ব আছে। আজ পর্যন্ত, সময়ের আদিকাল থেকে ঠিক আপনার মত কেউ জ
নি, আর আগামী হাজার হাজার বছরেও ঠিক আপনার মতই আর কেউ কখনই জন্ম
না। আধুনিক জীবন বিজ্ঞান থেকে জানা যায় আপনি হলেন আপনার বাবা
মায়ের প্রত্যেকের দেওয়া চব্বিশটি করে ক্রোমোসোম থেকে জন্ম নেওয়া একজন।
চব্বিশটি আর চব্বিশটি অর্থাৎ আটচল্লিশটি ক্রোমোসোমই জানিয়ে দিচ্ছে আপনি
তাই! আমরাম শিনফিল্ড বলেছেন, 'প্রতিটি ক্রোমোসোমে কুড়ি থেকে একশটা প
জিন থাকতে পারে—আর একটা মাত্র জিনই কোন কোন ক্ষেত্রে একজনের সারা জী
ধারাই বদলে দিতে পারে।' সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা 'বেশ ভীতিকর আর অ
কিছু' দিয়েই তৈরি।

আপনার জন্মের সময় এটা কোটি কোটি বারের মধ্যে একবারও জানা সম্ভব ছিলে
ঠিক আপনারই জন্ম হবে! অন্যভাবে বললে আপনার যদি কোটি কোটি ভাই
থাকতো তাহলেও আপনি হতেন তাদের চেয়ে আলাদা। এটাকে কি আন্দাজ
ভাবছেন? না, এটা বিজ্ঞানসম্মত সত্য। এ সম্পর্কে সত্যিই যদি কিছু জা
আগ্রহী হন তাহলে লাইব্রেরীতে গিয়ে আমরাম শিনফিল্ডের 'আপনি ও বংশধারা'
পড়ে ফেলুন।

আমি এই আপনার নিজের মত হয়ে ওঠা নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলে যেতে
কারণ এ ব্যাপারে আমার আগ্রহ অপরিসীম। কি নিয়ে কথা বলছি আমি বেশ
জানি। এটা আমি লাভ করেছি বেশ তিক্ত আর ব্যয়বহুল অভিজ্ঞতার মধ্য দি

উদাহরণ হিসেবে বলছি : আমি যখন প্রথম মিসৌরীর শস্যক্ষেত্র থেকে নিউইয়র্কে আসি, আমি আমেরিকান অ্যাকাডেমী অব ড্রামাটিক আর্টসে ভর্তি হই। আমার ইচ্ছে ছিলো অভিনেতা হওয়া। ব্যাপারটা আমার মনে হয়েছিলো দারুণ একটা কিছু আবিষ্কার করেছি। এটা আমার কাছে সাফল্যের সহজ পথ বলেই মনে হয়েছিলো—কেমন সহজ সরল ব্যাপার। আমি বুঝতেই পারিনি এমন একটা পথ উচ্চাকাঙ্ক্ষী হাজার হাজার মানুষ কেন আগেই আবিষ্কার করতে পারেনি। ব্যাপারটা এই রকম : আমার কাজ হবে সেকালের সব বিখ্যাত অভিনেতা কেমন করে কাজ করতেন সেটা শেখা—যেমন জন ড্রু, ওয়াল্টার হ্যাম্পডেন আরও অনেকে কেমন করে খ্যাতির শিখরে ওঠেন। এরপর আমি তাঁদের প্রত্যেকের সেরা ব্যাপারগুলো নকল করবো আর তার ফলে তাঁদের সকলের কৃতিত্ব জড়িয়ে আমি হয়ে উঠবো দারুণ খ্যাতিমান দক্ষ শিল্পী। কিন্তু কি বোকার মত ধারণা! কতোখানি অবাস্তব, অসম্ভব! অন্য সব লোককে নকল করতে গিয়ে এইভাবে আমার জীবনের বেশ মূল্যবান কটা বছর আমি নষ্ট করে বসলাম। মিসৌরী এলাকায় আমার মোটা মাথায় এটা ঢুকলোনা, আমায়—আমার মতই হতে হবে, আর আমার পক্ষে অন্য কেউ হয়ে ওঠা সম্ভব হবে না।

ওই দুঃখজনক অভিজ্ঞতা থেকে আমার চিরকালীন একটা শিক্ষা হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু তা হলো না। অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে হলো না। আমি নেহাতই আকাট ছিলাম। আমাকে আবার গোড়া থেকেই শিখতে হলো। বেশ ক'বছর পরে আমি ব্যবসাদারদের জন্য একখানা বক্তৃতা দেওয়ার বই লিখতে আরম্ভ করেছিলাম, আমি ভেবেছিলাম এমন বই আগে আর কেউ লেখেননি যাতে সব থাকবে। বইটা লেখার সময় আমার সেই আগেকার বোকার মত ধারণা ছিলো, সেই অভিনেতা হওয়ার ধারণা—আমি এমন বই লিখতে চাইছি যে সব ধারণা আগে বহু লেখকই তাদের বইতে লিখে গেছেন। অতএব আমি কি করলাম? আমি বেশ কিছু বই জোগাড় করে ফেললাম জনগনের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার উপর লেখা, তারপর একবছর ধরে সব কিছু আমার বইয়ের পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার মাথায় জাগলো আমি আবার সেই বোকার মত কাজ করতে চলেছি। অন্য সব মানুষের ধারণা মেশানো আমার লেখাটা এমনই একটা খিঁচুড়ির মত ব্যাপার আর সেটা এমনই মূল্যহীন, নীরস যে কোন ব্যবসাদার মানুষই তাতে চোখ বোলাতেও চাইবেন না। অতএব আমি সব কিছু বাজে কাগজের ঝুড়িতেই ফেলে দিয়ে আবার গোড়া থেকেই সুরু করলাম। এবারে নিজেই নিজেকে বললাম : 'তোমাকে ডেল কার্নেগী হতে হবে, তার সব ত্রুটি আর যত কম ক্ষমতাই থাকনা কেন। তুমি সম্ভবতঃ অন্য কেউ হয়ে উঠতে পারবে না।' অতএব আমি অন্য কারো মিশেল না হতে চেয়ে জামার হাতা গুটিয়ে প্রথমেই যা করা উচিত ছিলো তাই করতে লেগে গেলাম।

আমার নিজের দেখা অভিজ্ঞতা, দেখাশোনা আর বক্তৃতা এবং বক্তৃতা শিক্ষক হিসেবে যে ধারণা আর অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল তাই সম্বল করেই একটা বই লিখতে আরম্ভ

করলাম। আমি সারা জীবন ধরে যা শিখলাম—আমার মনে হয় স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে যা শিখেছিলেন তাই (আমি অবশ্য সেই ওয়াল্টার র‍্যালের কথা বলছি না যিনি রাণীর যেতে সুবিধে হবে বলে নিজের কোট কাদায় বিছিয়ে দেন। আমি বলছি ১৯০৪ সালের কাছাকাছি অক্সফোর্ডের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের কথা।) তিনি বলেছিলেন, 'শেকস্‌পীয়ারের মত কোন বই আমি লিখতে পারিনা তবে আমি নিজের যোগ্য বই লিখতে পারি।'

নিজের মত হোন। প্রয়াত জর্জ গার্সউইনকে আরভিং বার্লিন যে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন সেই ভাবেই কাজ করুন। বার্লিন আর গার্সউইনের যখন প্রথম দেখা হয়, তখন আরভিং বার্লিন বিরাট খ্যাতিমান মানুষ আর গার্সউইন জীবন সংগ্রামরত টিন প্যানআলিতে সপ্তাহে মাত্র পঁয়ত্রিশ ডলার উপার্জনকারী এক তরুণ গীতিকার। বার্লিন গার্সউইনের দক্ষতা লক্ষ্য করে তাঁকে তাঁর সঙ্গীত সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করার জন্য প্রায় ওর তখনকার মাইনের তিন গুণ বেশী দিতে চাইলেন। তাসত্ত্বেও বার্লিন ওকে উপদেশ দিয়ে বললেন, 'তুমি কাজটা নিওনা। যদি এটা নাও, তুমি হয়ত দ্বিতীয় শ্রেণীর এক বার্লিন হয়ে উঠবে। কিন্তু তুমি যদি নিজের মত হতে চাও তাহলে তুমি কোনদিন হয়তো প্রথম শ্রেণীর গার্সউইন হতে পারবে।'

গার্সউইন ওই সতর্কতার কথা মেনে নিয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে সে সময়কার একজন বিখ্যাত আমেরিকান সঙ্গীত রচয়িতা করে গড়ে তুলেছিলো।

চার্লি চ্যাপলিন, উইল রোজর্স, মেরী মার্গারেট ম্যাকব্রাইড, জিন অট্রি আর এই রকম লক্ষ লক্ষ মানুষকে আমি এই পরিচ্ছেদে যে শিক্ষা আপনাদের মাথায় ঢোকাতে চাইছি, ঠিক সেই ভাবেই শিখতে হয়েছিলো। তাদের সকলকেই কঠিন পথে সব শিখতে হয়—যেভাবে আমাকেও হয়।

চার্লি চ্যাপলিন যখন প্রথম ছবি বানাতে আরম্ভ করেন, ছবির পরিচালক তাঁকে সেযুগের একজন বিখ্যাত জার্মান হাস্যরসিককে নকল করার কথা বলেন। নিজের মত অভিনয় না করা পর্যন্ত চ্যাপলিন প্রায় দাঁড়াতেই পারেন নি। বব হোপেরও একই রকম অভিজ্ঞতা হয়—তিনি বহুবছর নাচগানের অভিনয় করেও কোথাও পৌঁছতে পারেন নি—শেষ পর্যন্ত সব ঝেড়ে ফেলে নিজের মত হয়ে ওঠার পরেই তাঁর খ্যাতি আসে। উইল রোজার্সেরও অভিজ্ঞতা একই রকম—বহুবছর ঘসার পরেই তাঁর আত্মদর্শন ঘটে, তিনি বোঝেন তার মধ্যে অদ্ভুত হাস্যরসের ভান্ডার রয়েছে।

মেরী মার্গারেট ম্যাকব্রাইড যখন প্রথম বেতারে যোগ দেন তিনি এক আইরিশ কমেডিয়ান হতে চেয়ে ব্যর্থ হন। তারপর যখন তিনি নিজে যা অর্থাৎ মিসৌরীর এব সাধারণ গ্রাম্য মেয়ে বলে পরিচিতি রাখেন—তিনি হয়ে ওঠেন নিউইয়র্কের অন্যতম জনপ্রিয় এক বেতার শিল্পী।

জিন অট্রি তাঁর টেক্সাস কথার ভঙ্গী পাল্টানোর জন্য চেষ্টা করে শহুরে ছেলের মত পোশাকও পরতে সুরু করে। সে দাবী করতে আরম্ভ করেছিলো যে নিউইয়র্ক থেকেই এসেছে। ব্যাপারটা দেখে সবাই আড়ালে হাসাহাসি করতে সুরু করে দেয়। কিন্তু শে

পর্যন্ত জিন অট্রি তার ব্যাঞ্জো বাজিয়ে কাউবয়দের গান গাইতে আরম্ভ করার পরেই সে হয়ে ওঠে চলচ্চিত্র আর বেতারে অত্যন্ত জনপ্রিয় এক কাউবয়।

আপনি এবং এ দুনিয়া একটা নতুন কিছুই। এটা ভেবেই খুশী হয়ে উঠুন আর প্রকৃতি যা আপনাকে দিয়েছে তাই যতোটা পারেন কাজে লাগান। বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় সমস্ত শিল্প কর্মই আত্মজীবনী মূলক। আপনার নিজের মতই আপনি গাইতে পারেন আর নিজের মত আঁকতে পারেন। আপনাকে হতে হবে আপনার অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিকতা আর বংশধারা আপনাকে যা দিয়েছে। খারাপই হোক আর ভালোই হোক আপনার নিজের বাগানের পরিচর্যা আপনাকেই করতে হবে। ভালো বা মন্দ যাই হোক আপনার জীবনের সঙ্গীত ব্যাঞ্জনা আপনাকেই বাজিয়ে যেতে হবে।

এমারসন তাঁর 'আত্ম নির্ভরতা' নামের প্রবন্ধে যেমন লিখেছিলেন : 'প্রত্যেক মানুষের শিক্ষাজীবনে একটা সময় আসে যখন তার বোধ জাগে, ঈর্ষা হলো অজ্ঞতা, নকল করা হলো আত্মহত্যা, আর তাকে ভালো বা মন্দ হোক এ শিক্ষা গ্রহণ করতেই হবে। সমস্ত পৃথিবী যদিও উদারতায় ভরা তবুও গড়ে ওঠার জন্য যে শস্যের প্রয়োজন সেই শস্যের জন্য পরিশ্রম করা চাইই, চাই চাষ করা। তার মধ্যে যে শক্তি আছে তা প্রকৃতিতে নতুন আর সে নিজে জানতে না চাইলে বা চেষ্টা না করলে সেও সেটা বুঝতে পারবে না।'

এমার্সন এই ভাবেই তাঁর কথা বলে গেছেন। এছাড়াও ঠিক এমন কথাই আবার কবিতায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন কবি ডগলাস ম্যালচ।

তাঁর কবিতার মূল কথা হলো এই রকম :

'তুমি যদি পাহাড়ের বুকে দেবদারু না হতে পারো,
তবে হয়ে উঠো উপত্যকায় কোন ঝোপ।
তুমি ঝোপও যদি না হতে পারো,
তবে হয়ে উঠো এক মুঠো ঘাস।
যদি দলপতি না হতে পারো
হয়ে উঠো কিছু সেনা।
যদি রাজপথ না হতে পারো
হতে চেও কোন সরু পথ।

আসলে মূল কথাটি হলো আমাদের সকলেরই নিজের মত কিছু করার রয়েছে সেটাকেই কাজে লাগানো চাই।

আমাদের মনকে তৈরী করে চিন্তাভাবনা ছেড়ে শান্তির পথ আবিষ্কার করতে হলে এই নিয়মটা মেনে চলা চাই :

'অন্যকে নকল করবেন না। নিজেদের আবিষ্কার করে আসুন নিজেদের মতই হয়ে উঠি।'

। সতেরো ।

লেবু থাকলে সরবৎ তৈরী করুন

এই বইটি লেখার সময় একদিন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রবার্ট মেনার্ড হাচিন্স এর কাছে জানতে চেয়েছিলাম তিনি কিভাবে দুশ্চিন্তা দূর করেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি সব সময় প্রয়াত জুলিয়াস রোজেন ওয়ালডের উপদেশ মেনে চলি। তিনি ছিলেন একটি কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট। তাঁর উপদেশ হলো : তোমার কাছে লেবু থাকলে সরবৎ তৈরী করো।'

একজন বড় শিক্ষাবিদ এই রকমই করেন। আর মূর্খরা করে ঠিক তার উল্টো। সে যদি দেখে ভাগ্য তার হাতে একটা লেবু দিয়েছে তাতে সে হতাশায় বলে, 'আমি হেরে গেলাম। আমার ভাগ্যই খারাপ আর আশা নেই।' এরপর সে সারা পৃথিবীকে ঘৃণা করে নিজেকে করুণা করতে আরম্ভ করে। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান কেউ ওই লেবু পেলে বলবে : 'এই দুর্ভাগ্য থেকে কি শিক্ষা নেব? কিভাবে অবস্থাটা বদলানো যায়? কি করে লেবুটাকে সরবৎ বানাতে পারবো?'

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ অ্যালফ্রেড অ্যাডলার সারা জীবন ধরে মানুষ আর তাদের অন্তরের শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা করে বলেন, 'মানুষের আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য হলো তারা বিয়োগকে যোগে রূপান্তরিত করতে পারে।'

এবার আমার পরিচিত এক মহিলার কৌতুহলোদ্দীপক গল্প শোনাই, তিনি ঠিক তাই করেছিলেন। ভদ্রমহিলার নাম থেলমা টমসন থাকেন নিউ ইয়র্কে। তিনি বলেছেন 'যুদ্ধের সময় আমার স্বামী ছিলেন ক্যালিফোর্ণিয়ার মোজাভে মরুভূমিতে এক শিক্ষণ শিবিরে। আমি তাঁর কাছাকাছি থাকবো বলে যাই। জায়গাটা আমার দারুণ খারাপ লাগে। জীবনে এত খারাপ আগে কখনও লাগেনি। স্বামী যখন শিক্ষার জন্য চলে যেতেন আমি একা পড়ে থাকতাম। অসহ্য গরম—প্রায় ১২৫ ডিগ্রী তাপে ফণিমনসার ঝোপের আড়ালে বসে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। কথা বলার কেউ নেই, শুধু মেক্সিকান আর ইন্ডিয়ান ছাড়া, আর তারাও একবর্ণ ইংরাজী জানেনা। সারাক্ষণ বাতাস বইছে আর শ্বাস টানলেই শুধু বালি আর বালি।

'এমন দুরবস্থায় পড়েছিলাম যে নিজের জন্যই কষ্ট হত। তাই বাবা মাকে চিঠি লিখলাম। তাতে লিখলাম আমার আর একমুহূর্তও সহ্য হচ্ছেনা বরং এর চেয়ে জেলে থাকাই ভালো। আমার বাবা উত্তরে দুটো মাত্র লাইন লিখেছিলেন—সেই দুটো লাইন সারা জীবন আমার মনে থাকবে—দুটো লাইন আমার জীবন যাত্রা বদলে দেয় :

'দুজন মানুষ কারাগারের জানালা দিকে তাকিয়েছিলো,
একজনের চোখে পড়ত কাদা, অন্যজন দেখতো তারা।'

'বারবার লাইন দুটো পড়লাম। নিজের প্রতি ব্যবহারে আমার লজ্জা হলো। আমি

ঠিক করে ফেললাম আমার এই অবস্থায় যা ভালো তাই খুঁজে নেব। আমি আকাশের তারা দেখব।

'আমি স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলাম, তাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেলাম। আমি তাদের বোনা আর মৃৎশিল্পে আগ্রহ দেখানোয় তারা তাদের প্রিয় জিনিসগুলো আমাকে উপহার দিয়ে দিলো, এগুলোই তারা টুরিষ্টদের কাছে বিক্রি করেনি। আমি ক্যাকটাস, ইয়ুক্কাস আর যোশুবা গাছের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমি প্রেইরী কুকুরদের বিষয় জানলাম, মরুভূমির সূর্যাস্ত একদৃষ্টে লক্ষ্য করতাম আর সমুদ্রের ঝিনুক কুড়োতাম। এই মরুভূমি লক্ষকোটি বছর আগে সমুদ্রের তলায় ছিলো।

'আমার মধ্যে এমন পরিবর্তনের কারণ কি? মোজাভে মরুভূমি তো বদলে যায়নি। রেড ইন্ডিয়ানরাও বদলায়নি, কিন্তু আমি বদলে গেছি। আমার মনের ভাব বদল ঘটেছে। আর এর সাহায্যেই আমার যন্ত্রণাকাতর মন বদলে যায় জীবনের এক শ্রেষ্ঠ অ্যাডভেঞ্চারে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। এই নতুন জগত আবিষ্কার করে আমার মধ্যে নতুন এক উত্তেজনার জন্ম হল। এতই উত্তেজনা জাগল যে একটা বই লিখে ফেললাম—একটা উপন্যাস। বইটি ছাপা হল 'ব্রাইট র‍্যাম্পার্টস্' নামে...আমি জেলের জানালা দিয়ে কাদার বদলে তারা খুঁজে পেলাম।'

থেলমা টমসন আপনি যা আবিষ্কার করেন সেটা গ্রীকরা যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পাঁচশ বছর আগেই আবিষ্কার করে: 'সবচেয়ে ভালো জিনিসই সবচেয়ে কঠিন'।

হ্যারী এমার্সন ফসডিক এটারই পুনরাবৃত্তি করেন বিংশ শতাব্দীতে: 'সুখ শুধু আনন্দের নয়; এ হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জয়লাভ।' হ্যাঁ, সে জয় আসে কোন কিছু চেষ্টা করে পাওয়ায়। লেবুকে সরবতে পরিণত করার মধ্য দিয়ে এ রকম আনন্দ হয়।

আমি একবার ফ্লোরিডার একজন সুখী খামার মালিকের সঙ্গে দেখা করি, লোকটি বিষময় লেবুকে সরবতে পরিণত করে। প্রথম যখন সে খামারটা পায় তার ভাল লাগেনি। জমিটা এতই খারাপ ছিল যে, তাতে ফলচাষ দূরের কথা শুকর পালনও করতে পারত না। জমিটায় কেবল ছিল র‍্যাটল সাপ আর ঝোপের মত ওক গাছ। তারপরেই তার মাথায় একটা মতলব গজালো। সে তার খামারকে লাভজনক করে তুলবে—এই সব র‍্যাটল সাপ নিয়েই কাজ সুরু করবে। সকলে অবাক হলো, সে তখন র‍্যাটল সাপের মাংস টিন বোঝাই করে চালান আরম্ভ করল। কবছর আগে ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলাম যে তার র‍্যাটল সাপ দেখতে বছরে কুড়ি হাজার লোক ভিড় জমাচ্ছে। ওর ব্যবসা ফুলে উঠেছে। দেখলাম তার খামারে গবেষণাগারের জন্য র‍্যাটল সাপের বিষ বের করা হচ্ছে, সাপের চামড়া প্রচুর দামে বিক্রি হচ্ছে মেয়েদের জুতো আর ব্যাগ তৈরির জন্য। দেখলাম সারা বিশ্বে বোতলভরা সাপের মাংস চালান যাচ্ছে। আমি এখানকার একটা ছবিওয়ালা কার্ড কিনে ডাকঘর থেকে পাঠিয়ে দিলাম। ডাকঘরের নাম এখন বদলে রাখা হয়েছে র‍্যাটল সাপ ডাকঘর, ফ্লোরিডা। এটা করা

হয়েছে এমন একজন লোককে সম্মান জানাতে, যে বিষাক্ত লেবুকে মিষ্টি সরবতে পরিণত করেছে।

আমি এই দেশটা জুড়ে বহুবার ঘুরেছি। তখন আমি দেখেছি অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ কি ভাবে বিয়োগকে যোগে পরিণত করেছেন, অর্থাৎ ক্ষতি থেকে লাভ করেছেন।

'ভগবানের বিরুদ্ধে বারোজন' গ্রন্থের লেখক উইলিয়াম বলিথো কথাটা এইভাবে বলেছেন : 'জীবনে সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় হলো লাভের উপর নির্ভর না করা। যে কোন বোকাই এটা পারে। সবচেয়ে জরুরী হলো ক্ষতি থেকে লাভ করা। এর জন্য চাই বুদ্ধি—এতেই একজন কেরানী আর বোকার তফাতটুকু বোঝা যায়।'

বলিথো কথাটা বলেছিলেন এক দুর্ঘটনায় একটা পা হারানোর পর। কিন্তু আমি একজনকে জানি যিনি দুটো পা হারিয়ে বিয়োগকে যোগে পরিণত করেন। ভদ্রলোকের নাম বেন ফর্চুন। তাঁর সঙ্গে আমার জর্জিয়ার আটলাণ্টায় দেখা হয়। এলিভেটরে উঠতেই হাসিখুশি দুপা হারানো লোকটিকে দেখি। তিনি সেখানে একটা হুইল চেয়ারে বসেছিলেন। এলিভেটরে থামতেই তিনি নম্রভাবে জানতে চাইলেন আমি একটু পাশে সরে যাবো কিনা যাতে চেয়ারটা নিয়ে যেতে পারেন। 'আপনার অসুবিধা করার জন্য মাপ চাইছি', ভদ্রলোক হৃদয় গলানো হাসি হেসে বললেন।

আমি এলিভেটর ছেড়ে নিজের ঘরে এসে ওই হাসিখুশি মানুষটির কথা ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোককে খুঁজে বের করে তাঁর জীবনের কাহিনী বলতে অনুরোধ করলাম।

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, 'এটা ঘটে ১৯২৯ সালে। আমি একরাশ বাদাম কাঠ কেটে ফোর্ড গাড়িতে করে আসছিলাম। আচমকা মোড় ফেরার সময় একটা কাঠ সামনে এসে পড়ল। গাড়িখানা সঙ্গে সঙ্গে সোজা সামনে ছুটে গিয়ে একটা গাছে ধাক্কা খায় আমার মেরুদণ্ডে আঘাত লাগে আর পা দুটো অসাড় হয়ে যায়।

'এটা যখন ঘটে তখন আমার বয়স চব্বিশ আর তারপর একপা ও আমি হাঁটতে পারিনি।'

চব্বিশ বছরে বিকলাঙ্গ সারা জীবনেরই জন্য। আমি ভদ্রলোককে প্রশ্ন করেছিলাম এত সাহসের সঙ্গে ব্যাপারটা তিনি কিভাবে নিলেন। তিনি বললেন, 'আমি নিইনি।' তিনি বলেন রাগে দুঃখে ফেটে পড়েন তিনি, বিদ্রোহ করেন। কিন্তু সময় কেটে চললে তিনি বুঝেছিলেন ঐ বিদ্রোহে কোন লাভ হবেনা শুধু তিক্ততাই বাড়বে। তাছাড়া তিনি আরও বলেছিলেন, 'আমি বুঝলাম লোকেরা যখন আমার প্রতি ভদ্র ব্যবহার করে, তখন আমিও তাদের প্রতি ভদ্র হব।'

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম এত বছর পরে তার কি মনে হয়না তাঁর পা হারানো দুর্ভাগ্যের কারণ। 'না,' তিনি বলেন, 'ঘটনাটা যে ঘটেছিল তার জন্য আমি খুশি।' তিনি আমাকে জানান প্রাথমিক আঘাত আর শোক কাটিয়ে ওঠার পর তিনি এক নতুন জীবন কাটাতে আরম্ভ করেন। ভাল সাহিত্যে তাঁর আগ্রহ জাগল। চোদ্দ বছরে তিনি

প্রায় চোদ্দশ বই পড়ে ফেলেন আর ওই সব বই তাঁর জীবনকে নতুন দিগন্তে পৌঁছে দেয় আর মানসিক ভাবে শক্তিশালী করে তোলো তিনি ভাল সঙ্গীতে আকৃষ্ট হন আর সিম্ফনি আগ্রহের সঙ্গে শুনতে আরম্ভ করেন, অথচ আগে যা তাঁকে বিরক্ত করত। সবচেয়ে বড় জিনিস হল তিনি চিন্তা করার প্রচুর সময় পেলেন। এই প্রথম তিনি পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে জীবন সম্বন্ধে অবহিত হলেন। তিনি বুঝলেন আগে যে সব জিনিসে আগ্রহ প্রকাশ করতেন তার কোনই দাম নেই।

পড়ায় আগ্রহের জন্য তিনি রাজনীতিতে আগ্রহী হলেন, জনসাধারণ সম্পর্কেও আগ্রহী হলেন আর হুইল চেয়ারে বসেই বক্তৃতা দিতে সুরু করলেন। তিনি জনগণ সম্পর্কে জানতে আরম্ভ করলেন আর জনগণও তাই তাঁকে জানতে চাইল। আর আজ বেন ফর্টসন এখনও হুইল চেয়ারেই আছেন—তিনি জর্জিয়ার সেক্রেটারি অব স্টেট।

গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে নিউ ইয়র্কে বয়স্ক শিক্ষার ক্লাস নিয়ে আমি আবিষ্কার করেছি যে অনেক বয়স্কর-ই ক্ষোভ তাঁরা কলেজী শিক্ষা পাননি। তাঁদের ধারণা কলেজী শিক্ষা না পেলে বিরাট ক্ষতি হয়। আমি জানি এই ধারণা ঠিক নয়, কারণ এমন হাজার হাজার মানুষ আছেন যাঁরা যথেষ্ট উন্নতি করলেও উঁচু স্কুলেরও গণ্ডী পার হননি। আমি এমন একজনের কথা জানি যিনি প্রাথমিক স্কুলও পেরোন নি এবং চরম দারিদ্রের মধ্যে লালিত হন। তাঁর বাবার মৃত্যুর পরে কবর দেবার জন্য বাবার বন্ধুরা চাঁদা করে কফিন জোগাড় করেছিলেন। সংসার পরিচালনার জন্য তাঁর মা এক ছাতা তৈরীর কারখানায় কাজ করতেন আর রোজ দশ ঘণ্টা ধরে রাত এগারোটা পর্যন্ত কাজ করতেন।

ছেলেটি ওই পরিবেশে মানুষ হয়ে চার্চের ক্লাবে সৌখীন নাট্যকে দলে যোগ দেয়। নাটক করতে তার এতই ভাল লাগল যে তিনি বক্তৃতা দানে আগ্রহী হলেন—এর ফলে তাঁর রাজনীতিতে হাতেখড়ি হল। ত্রিশ বছর বয়স হতে তিনি নিউইয়র্কের বিধান সভায় নির্বাচিত হলেন। তিনি আমায় বলেছিলেন, ব্যাপারটা তাঁর বোধগম্যই হতোনা। হিসেবের বিল নিয়ে তিনি প্রচুর লেখাপড়া করতেন। কিন্তু সেগুলো পড়ে তার অর্থ বুঝে ওঠা তার পক্ষে খুবই কষ্ট্য সাধ্য ছিল। কোন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার আগে তিনি নির্বাচিত হলেন স্টেট ব্যাঙ্কিং কমিশনে। অথচ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারনাই এর আগে ছিল না। এসবের জন্যই তিনি রোজ ষোল ঘণ্টা পড়াশোনা করে নিজের জ্ঞান বাড়াতে সচেষ্ট হলেন। তিনি বলেছিলেন প্রতি মুহূর্তে তখন আমার এত খারাপ লাগত যে পদত্যাগ করবার কথা প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলাম কিন্তু মায়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হবে, এই ভেবে তা করতে পারিনি। এই করে তিনি লেবুকে লেমনেডে পরিণত করলেন। এরই ফলে দেশের চারদিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো, তিনি হয়ে উঠলেন একজন জাতীয় বীরের মত। নিউ ইয়র্ক টাইমস তাঁকে নিউ ইয়র্কের 'সবচেয়ে প্রিয় নাগরিক' আখ্যা দেয়।

আমি অল স্মিথ সম্বন্ধে বলছি।

দশ বছর পরে অল স্মিথ রাজনীতির আত্ম-শিক্ষা নেবার পর নিউইয়র্কের সবসেরা

সরকারী বিশেষজ্ঞ হয়ে পড়েন। তিনি চারবার নিউইয়র্কের গভর্ণর হন এ একটা রেকর্ড। ১৯২৮ সালে তিনি ডেমোক্র্যাটিক দলের হয়ে প্রেসিডেণ্ট পদে প্রার্থী হন। কলম্বিয়া এবং হার্ভার্ড সহ ছটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানীয় ডক্টরেট ডিগ্রী দেয়, অথচ যিনি কোনদিন স্কুলের গণ্ডী পার হয়নি।

অল স্মিথ আমাকে বলেছিলেন, তিনি যদি রোজ ষোল ঘণ্টা খেটে তাঁর বিয়োগকে যোগে পরিণত না করতেন তাহলে কিছুই ঘটতো না।

শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে নীটশের মত হল, যে কেবল অভাবকে সহ্য করা নয় তাকে ভালবাসারও ক্ষমতা থাকা চাই।

বিখ্যাত কৃতী মানুষদের জীবনী পড়ে আমি এটাই বুঝেছি যে যারা জীবনে বাধা পেয়েছেন ততই তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন সে বাধা কাটিয়ে জীবনে উন্নতি করতে। উইলিয়াম জেম্‌স যেমন বলেছিলেন: 'আমাদের অক্ষমতাই আমাদের অভাবিতভাবে সাহায্য করে।'

হ্যাঁ, এটা খুবই সম্ভব কারণ হয়তো, মিলটন অন্ধ হয়ে যান বলেই উচ্চশ্রেণীর কাব্য রচনা করেছিলেন আর বিঠোফেন বধির ছিলেন বলেই এতো ভালো সঙ্গীত রচনা করতে পেরেছিলেন।

হেলেন কেলারের অন্ধত্ব আর বধিরত্বই তাকে এত উন্নতিতে সাহায্য করে। চেইকোভস্কি যদি হতাশা না হতেন যদি না তার জীবন করুণ বিবাহের জন্য নষ্ট না হত তা হলে কখনই তিনি 'করুণ সিম্ফনি' সৃষ্টি করতে পারতেন না।

ডস্টয়ভস্কি আর টলস্টয় জীবন যন্ত্রণা ভোগ না করলে কখনই তাঁদের অমর উপন্যাস রচনা করতে পারতেন না।

পৃথিবীতে জীবনধারার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রবক্তা বলেছিলেন—'আমি যদি ওই রকম পঙ্গু না হতাম,' 'তাহলে যা করেছি তত কাজ করতে পারতাম না।' এ হল চার্লস ডারউইনের স্বীকারোক্তি। তাঁর অশক্ততাই আশ্চর্যজনক ভাবে তাকে ওই কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

যেদিন চার্লস্ ডারউইন ইংল্যাণ্ডে জন্ম নেন ঠিক তখনই আমেরিকার কেনটাকীতে এক কাঠের কেবিনে এক শিশু জন্ম নেয়। তার অক্ষমতাও তাকে সহায়তা করেছিল। তিনি হলেন লিঙ্কন—আব্রাহাম লিঙ্কন। ইনি যদি অভিজাত বংশে জন্ম নিয়ে হার্ভার্ডে শিক্ষা নিয়ে আইন পাশ করে সুখী বিবাহিত জীবন যাপন করতেন, তাহলে গেটিসবার্গে তিনি যে চমৎকার বক্তৃতা দেন তা তিনি দিতে পারতেন না, বা তাঁর দ্বিতীয় অভিষেকের সময় যে আশ্চর্য কবিতা উচ্চারণ করেন তা করতে পারতেন না। যা ছিল কোন শাসকের শ্রেষ্ঠ উক্তি: 'কারও প্রতি নাহি মোর ঘৃণা, শুধু আছে দয়া আর স্নেহ…।'

হ্যারী এমার্সন ফস্‌ডিক তাঁর 'পাওয়ার টু সী ইট থ্রু' গ্রন্থে বলেছেন 'একটি স্ক্যাণ্ডীনেভীয় প্রবচন আছে যেটা আমাদের জীবন সঙ্কেত হতে পারে। 'উত্তুরে হাওয়া ভাইকিংদের সৃষ্টি করেছে।' কথাটার অর্থ হল কোথায় কবে শোনা গেছে আরাম

আর নিশ্চিন্ততা মানুষকে সুখী আর ভালো করতে পেরেছে? ঠিক এর উল্টোটাই যে সব লোক সহজে সন্তুষ্ট হয় না। তারা নরম গদীতে শুয়েও খুঁত খুঁত করে। ইতিহাসেও দেখা যায় লোকেরা চরিত্রবান হয়েছে, সুখী হয়েছে তখনই তারা নিজের দায়িত্ব নিতে পেরেছে। উত্তুরে হাওয়াই তাই বারবার ভাইকিংদের সৃষ্টি করেছে।'

ধরুন আমরা হতাশ হয়ে যদি ভাবি আমাদের লেবু দিয়ে সরবত বানানোর আশা নেই—তাহলে আমাদের চেষ্টা করা উচিত দুটো কারণে। যে দুটি কারণে আমাদের লাভই হবে, ক্ষতির কিছু নেই।

এক নম্বর কারণ: আমরা সাফল্য পেতে পারি।

দু নম্বর কারণ: যদি আমরা সফল নাও হই, আমাদের বিয়োগকে যোগে পরিণত করার চেষ্টাই আমাদের সামনে তাকাতে সাহায্য করবে। তাই এটা আমাদের অতীত নিয়ে দুঃখ বা অনুতাপ করতে ব্যস্ত রাখবে না।

পৃথিবীর বিখ্যাত ওলিবুল নামে বেহালাবাদক প্যারীতে তাঁর বাজনা শোনাবার সময় বেহালার একটা তার ছিঁড়ে যায়। কিন্তু ওলিবুল তিনটি তারেই বাজনা শেষ করেন। হ্যারী এমার্সন ফসডিক তাই ঠিকই বলেছেন: 'এই হল জীবন। বেহালার একটা তার ছিঁড়ে গেলেও তিনটি তারেই বাজাবে।'

এ শুধু জীবন নয়। এ জীবনেরও বেশি। এ হল বিজয়ী জীবন।

আমার ক্ষমতা থাকলে আমি উইলিয়াম বোলিথোর এই কথাটা ব্রোঞ্জে বাঁধিয়ে দেশের প্রতিটি জায়গায় ঝুলিয়ে দিতাম।

'জীবনের উদ্দেশ্য কেবল লাভ নিয়ে নয়। যে কোন বোকাই তা পারে। আসল প্রয়োজন ক্ষতি থেকে লাভ করা…।'

অতএব সুখ আর সমৃদ্ধি পেতে হলে ৬ নম্বর নিয়ম হল:

'ভাগ্য কোন লেবু হাতে দিলে তা দিয়ে সরবত বানান।'

॥ আঠারো ॥

চোদ্দদিনে মন ভালো করুন

এ বইটা যখন লেখা সুরু করি তখন আমি সবচেয়ে প্রেরণাদায়ক আর উপকারে লাগে এমন সত্যিকার একটা কাহিনীর জন্য দশ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করি। কাহিনীর বিষয় ছিল : 'কি করে দুশ্চিন্তা দূর করেছি।'

বিচারক ছিলেন তিনজন নামকরা লোক : ইষ্টার্ণ এয়ার লাইনসের প্রেসিডেণ্ট এডি রিকেনবেকার, লিঙ্কন মেমোরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ডঃ ম্যাকক্লেল্যাণ্ড আর বেতার বিশেষজ্ঞ ভি ক্যাল্টেনবর্ণ। যাই হোক আমরা এমন দুটো সত্য কাহিনী পেলাম যে, কোনটা শ্রেষ্ঠ তা বিচার করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত পুরস্কার দুজনকে ভাগ করে দেওয়া হল। প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত একটি কাহিনী ছিল সি. আর. বার্টনের, যিনি মোটরগাড়ি বিক্রীর প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। কাহিনীটি এই রকম :

'আমার ন'বছর বয়সে আমি মাকে হারাই আর বারো বছর বয়সে বাবাকে', মিঃ বার্টন লেখেন, 'আমার বাবা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান আর মা স্রেফ উনিশ বছর আগে বাড়ি থেকে চলে যান, আর কখনও তাঁকে দেখিনি। আমার ছোট্ট যে বোন দুটিকে তিনি নিয়ে যান তাদেরও আর দেখিনি। সাত বছর কাটার আগে মা কোন চিঠিও পর্যন্ত লেখেন নি। বাবা, মা চলে যাওয়ার তিন বছর পরে দুর্ঘটনায় মারা যান। তিনি তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে মিসোরীতে একটা কাফে খুলেছিলেন। বাবা ব্যবসার কাজে বাইরে গেলে তাঁর বন্ধু সব বেচে দিয়ে টাকা কড়ি সহ পালিয়ে যায়। এক বন্ধুর তার পেয়ে তাড়াহুড়ো করে আসতে গিয়ে গাড়ির দুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যু ঘটে। বাবার তিনজন বৃদ্ধা, রুগ্ন আর গরীব বোন, তিনটে শিশুর ভার নেন। কেউ আমায় আর আমার ছোট ভাইকে রাখল না। আমরা শহরের দয়ায় নির্ভর করে বেঁচে রইলাম। আমাদের অনাথ বলা হবে ভেবে দারুন ভয় পেতাম। হলও তাই। এক দরিদ্র পরিবারে আমরা থাকতাম, সেই লোকটির চাকরি গেল, ফলে তার পক্ষে আর খাওয়ানো সম্ভব হল না। এরপর মিঃ আর মিসেস লফটিন এগারো মাইল দূরে তাঁদের খামারে নিয়ে গেলেন। বৃদ্ধ আমায় এক শর্তে নিয়ে যান। তা হল : আমি যতদিন খুশী সেথানে থাকতে পারি, কিন্তু কোনদিন মিথ্যে বলব না। চুরি করব না। যা বলা হবে তাই করব। আমি বর্ণে বর্ণে তা মেনে চললাম। এ আমার কাছে বাইবেলের মত পবিত্র ছিল। এরপর স্কুলে গেলাম আর বাড়ি এসে অঝোরে কাঁদলাম। অন্য ছেলে মেয়েরা আমার নাক দেখে তামাশা করত আর মিচকে অনাথ বলে ক্ষেপাতো। মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে মারামারি করতে ইচ্ছে হত। মিঃ লফটিন একদিন বললেন, মারামারি সবাই করতে পারে। তা না করে ফিরে আসাই সাহসের কাজ। কথাটা মনে রেখ। কিন্তু একদিন একজনকে শিক্ষা দেওয়ার জন বেশ পিটলাম। ঐদিন একটি ছেলে

মুরগীর নাড়িভুঁড়ি আমার মুখে ছুঁড়ে মেরেছিল তাই তাকে উচিত শিক্ষা দিয়েছিলাম। এর ফলে দু একজনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বও হল।

একদিন মিসেস লফটিন বললেন, 'আমি যদি লোকের কাজ করি, উপকার করি তাহলে তারা আর বিরক্ত করবে না বন্ধুত্ব করবে।' আমি তাই করতে লাগলাম আর পড়াশোনায় মন দিলাম ফলে পরীক্ষায় প্রথমও হলাম। কেউ আমায় দেখে ঈর্ষা করেনি।

আমি বহু ছেলেকে তাদের লেখাপড়ায় সাহায্য করতাম। আমি বিতর্কের কিছু বিষয় ছেলেদের খাতায় লিখে দিতাম। একটি ছেলে যাকে আমি সাহায্য করতাম সে বাড়ীতে তার মাকে একথা বলতে লজ্জাবোধ করতো। সে তার মাকে বলতো পোশাম শিকার করতে যাচ্ছে। তারপর আমি একটি ছেলেকে তার বইয়ের সমালোচনা এবং সন্ধ্যায় একটি মেয়েকে অঙ্ক শেখাতাম। অনেকেই তাই আমার কাছে আসত।

এরপর আমাদের পাড়ায় মৃত্যু হানা দিল। দুই বয়স্ক কৃষক মারা গেল আর এক মহিলার স্বামী তাকে ত্যাগ করে গেল। চারটি পরিবারে আমিই একমাত্র পুরুষ তাই সব দায়িত্ব আমাকেই নিতে হল। আমি তাদের সাহায্য করলাম। কেউ আর আমায় গাল দেয় না সবাই আমার বন্ধু হল। আমি যখন নৌবাহিনী থেকে ফিরলাম দুশরও বেশি লোক আমায় দেখতে এল, তাদের অনেকেই আশি মাইল দূর থেকে এসেছিল। আমার প্রতি তাদের ভালবাসা ছিল অন্তরের। অন্যকে সাহায্য করেছি বলে আমার দুশ্চিন্তা ছিলো না। আমায় গত তেরো বছর কেউ আর অনাথ বলেনি।

সি. আর. বার্টনের প্রশংসা করাই উচিত। কি করে বন্ধুত্ব করতে হয় তিনি জানেন। আ। এও জানেন কিভাবে দুশ্চিন্তা কাটিয়ে জীবনকে উপভোগ করতে হয়। ঠিক এমনটাই জানতেন ওয়াশিংটনের ডঃ ফ্রাঙ্ক লুপ। তিনি প্রায় তেইশ বছর ধরে বাতের অসুখের ফলে চলৎশক্তি হীন। সীয়াটল স্টারের স্টুয়ার্ট হোয়াইট হাউস আমায় লেখেন: 'আমি ডঃ লুপকে বহুবার দেখেছি। তাঁর মত এমন নিঃস্বার্থ মানুষ আর দেখিনি। তাঁর মত জীবন উপভোগ করতেও কাউকে দেখিনি।'

একজন চলৎশক্তিহীন মানুষ কিভাবে জীবন উপভোগ করলেন? তিনি কি সব সময় অনুযোগ আর সমালোচনা—করতেন? —নাকি চিৎকার করে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন? এটাও না। প্রিন্স অব ওয়েলসের মত তাঁর জীবনের ব্রত ছিল: 'ইখ্ ডিয়েন'—'আমি সেবা করি': তিনি অন্যসব চলৎশক্তিহীন মানুষের ঠিকানা জোগাড় করে প্রেরণা দিয়ে চিঠি লিখতেন—এতে তাঁর প্রচুর আনন্দ হত। এইভাবে তিনি একটা লেখার ক্লাবই গড়ে তোলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত একটা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন—তার নাম দেন 'বন্ধ হয়ে থাকাদের সমাজ'।

তিনি বিছানায় শুয়ে বছরে গড়পড়তা চোদ্দশ চিঠি লিখতেন। তিনি হাজার হাজার পঙ্গুকে রেডিও আর বই পাঠাতেন।

ডঃ লুপ আর অন্যান্যদের মধ্যে তফাৎ কি? এটাই যে ডঃ লুপের অন্তরে একটা প্রজ্জ্বলিত বাসনা জেগেছিল, একটা উদ্দেশ্য কাজ করত। তিনি জানতেন তার

কাজের মধ্যে রয়েছে একটা মহান উদ্দেশ্য। বার্নার্ড শ বলেছিলেন, 'অনেক আত্ম কেন্দ্রিকই অভিযোগ করে যে সবাই তাকে সুখী করার চেষ্টা করছে না।'

বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক অ্যাডলার, অ্যাডলারের যে চমৎকার বক্তব্য শুনেছিলাম এখানে সেটাই বলতে চাই। তিনি এগুলো তার মনোবিকলনে আক্রান্ত রোগীদের বলতেন 'আপনারা চৌদ্দদিনেই সেরে উঠবেন যদি এই নিয়ম মেনে চলতে পারেন। প্রতিদি ভেবে দেখুন প্রতিদিন কি ভাবে অন্ততঃ একজনকে খুশি করতে পারেন।'

কথাটা এতই অবিশ্বাস্য মনে হয় যে ডঃ অ্যাডলারের বই থেকে কয়েকটা লাইন ন পড়লে বিশ্বাস হবে না। বইটার নাম 'হোয়াট লাইফ সুড মীন টু ইউ।'

বইটির ২৫৮ পৃষ্ঠায় ডঃ অ্যাডলার বলেছেন :

'মনোবিকলন জন্মায় বহুদিন ধরে অন্যের প্রতি রাগ আর বিদ্বেষ পুষে রাখা ফলে। এই রোগ হলে রোগীরা নিজেদের দোষ সম্বন্ধে অপ্রসন্ন বোধ করে আর তাঃ তা করে অন্যের কাছ থেকে যত্ন, দয়া আর সমর্থন আদায় করার জন্য। বিষাদগ্র রোগীরা প্রথমেই এই রকম ভাবে : 'আমার মনে পড়ছে আমি যে কোচটায় শুয়ে থাকি আমার ভাই সেখানে শুয়ে ছিল। আমি এমনই কাঁদলাম যে সে জায়গা ছেড়ে উঠে যায়।'

বিষাদগ্রস্ত রোগীরা প্রায়ই নিজেদের উপর প্রতিশোধ নিতে আত্মহত্যা করতে চায় তাই ডাক্তারের প্রথম চেষ্টা হয় তাদের কোন আত্মহত্যার সুযোগ না দেওয়া। আমি তাদের এ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য বলি : 'যা আপনাদের ভালো লাগে না তা করবে না।' ব্যাপারটা খুবই সামান্য মনে হলেও আমার ধারণা এতে একেবারে রোগের মূলে পৌঁছনো যায়।' কোন বিষাদগ্রস্ত রোগী যা চায় সে যদি তাই করতে পারে তাহলে সে কার উপর রাগ করবে? নিজের উপর তার প্রতিশোধ নেবারই বা দরকার কি 'যদি আপনার থিয়েটার বা ছুটিতে যেতে ইচ্ছে করে তাহলে তাই করবেন' এই হচ্ছে আমার কথা। 'পথে যদি আবার ইচ্ছে না হয় তাহলে বন্ধ করবেন।' এরকম অবস্থা থাকাই সবচেয়ে মজার। নিজের শ্রেষ্ঠ হওয়ার চেষ্টাকে এটা মিটিয়ে দেয়। এই নিয়মা চমৎকার আরাম দেয়। এর ফলে আমার রোগীদের মধ্যে একটাও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেনি।

সাধারণতঃ রোগীরা বলে, 'আমার কিছুই করতে ইচ্ছে করে না'। এর উত্তর আমার ঠিক করা আছে। আমি বলি : 'তাহলে যা ইচ্ছে হয় না তা করবেন না। কখনও সে হয়তো বলে. 'আমার সারাদিন শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।' আমি জা তিনি তা কখনই করবেন না, আবার বাধা দিলে লড়াই সুরু করবেন। আমি ত সব সময় রাজী হয়ে যাই।

এ হল একটা নিয়ম। অনেকে আবার নিজেদের জীবন যাত্রা প্রণালী নি সরাসরি আক্রমণ করে। আমি তাদের বলি, 'আপনারা চৌদ্দ দিনেই রোগ মুক্ত হবে যদি এই নিয়মটা মেনে চলেন। একবার ভেবে দেখুন প্রতিদিন অন্ততঃ একজনকে ভাবে সুখী করতে পারেন।' এতে তাদের কি মনে হয় এক বার ভাবুন। তাদে মনে ভাবনা জাগে, 'কাউকে কি ভাবে জ্বালাই।' এর উত্তরও বেশ মজার। বে

বলে, 'এটা আমার কাছে বেশ সহজ। সারা জীবনই এটা করেছি' আসলে তারা এটা কখনও করেনি। আমি তাদের ভাবতে বলি। তারা তা করেনা। আমি তখন বলি, যখন ঘুম আসবে না তখন ভাববেন অন্যদের কেমন করে খুশি করা যায়, এতে আপনার স্বাস্থ্য ভালো হবে।' পরের দিন দেখা হলে বলি, 'যা বলেছিলাম ভেবে দেখেছেন?' তাদের উত্তর হল: 'গতরাতে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ি।' এসবই করতে হয় ধীরে, কোন রকম শ্রেষ্ঠত্বের ভাব না রেখে।

অন্যেরা বলে, 'আমি কিছুতেই দুশ্চিন্তার জন্য এটা করতে পারিনি।' আমি তাদের বলি, 'দুশ্চিন্তা বন্ধ করবেন না তবে সেই সঙ্গে অন্যদের কথাও ভাববেন।' অনেকে এতে বলে, 'অন্যদের সুখী করব কেন? তারা তো আমাকে সুখী করতে চায় না।' আমি বলি প্রথমে তোমার স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করতে হবে অন্যরা পরে জ্বরে ভুগবে।' এমন কোন রোগী মেলা সত্যিই ভার যে বলে, 'আপনি যা বলেছেন তা নিয়ে ভেবেছি।' শুধু তাদের সামাজিক বোধ জাগ্রত করতে আমার সমস্ত চেষ্টা কাজে লাগাতে চাই। ধর্মেও আছে সবচেয়ে ভালো কাজ হল 'তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো।' যে অন্যদের সম্পর্কে আগ্রহী নয় সে নিজেও কষ্টে পড়ে অন্যকেও কষ্ট দেয়। তাই দরকার সকলের সহযোগিতা করা। মানুষ হিসেবে একজনের কাছে আমাদের দাবী সহযোগিতা, বন্ধুত্ব পূর্ণ ব্যবহার, ভালবাসায় এবং বিয়েতে যাতে সত্যিকার অংশীদার হয়।'

ডঃ অ্যাডলার আমাদের প্রতিদিন একটা ভাল কাজ করতে বলেছেন। কিন্তু ভাল কাজ কী? মহাপুরুষ মহম্মদ বলেছিলেন, 'যে কাজ করে অপরের মুখে হাসি ফোটানো যায় সেটাই ভালো কাজ।'

প্রতিদিন কোন ভাল কাজ করলে যে করে তার উপর এমন চমৎকার প্রতিক্রিয়া হয় কেন? কারণ অপরকে সুখী করতে গিয়ে আমরা নিজেদের কথা ভুলে যাই। সেটাই যে আমাদের সব দুশ্চিন্তা, ভয় আর বিপদের কারণ।

নিউ ইয়র্কের মিসেস ইউলিয়াম টি. মুনকে দুসপ্তাহ ধরে অন্যকে কেমন করে সুখী করা যায় ভাবতে হয়নি। তাঁকে ডঃ অ্যাডলারের মত চৌদ্দ দিন পরিশ্রম করতে হয়নি। তার চেয়ে তাড়াতাড়িই তিনি তা করেন মাত্র দুই অনাথকে সুখী করে।

ঘটনা এই রকমই, যেমন মিসেস মুন আমায় লেখেন: 'পাঁচ বছর আগে ডিসেম্বরের একদিন আত্ম-গ্লানি আর দুঃখ আমায় চেপে ধরে। বহুদিন সুখী বিবাহিত জীবন কাটানোর পর স্বামীকে হারাই। বড়দিনের ছুটি এসে গেলো আমার দুঃখ আরও বেড়ে গেলো। কোনদিন একা বড়দিন কাটাইনি—তাই বড়দিন এগিয়ে এলে ভয়ও বাড়তে লাগলো। বন্ধুরা আমায় তাদের সঙ্গে বড়দিন কাটানোর আহ্বান জানিয়েছিল কিন্তু আমার তা ইচ্ছে হল না। আমি জানতাম তাদের মধ্যে বেমানান হয়ে পড়বো। ক্রমশঃ বড়দিন এগিয়ে এলে আমার আত্মধিক্কার জাগল। এটা সত্যি, অনেক ব্যাপারেই আমার ধন্যবাদ জানাবার ছিল, সকলেরই যা থাকে। বড়দিনের আগের দিন বেলা সাড়ে তিনটের সময় আমি একাকী উদ্দেশ্যহীন ভাবে ফিফ্থ অ্যাভিনিউ বরাবর হাঁটতে শুরু

করলাম, আশা ছিল বিষাদ দূরে হবে। সারা পথ আনন্দমগ্ন মানুষে জমজমাট—আমার মনে অতীতের সুখ স্মৃতি জেগে উঠল। কিছুতেই মানতে পারলাম না একাকী নিঃসঙ্গ ফ্ল্যাটে ফিরে যাব। কি করব বুঝতে পারলাম না, চোখের জলও বাধা মানল না। একঘণ্টা হাঁটার পর একটা বাসে উঠে পড়লাম। হাডসন নদী পার হয়ে বাসটা কোথাও এসে দাঁড়াতে কণ্ডাক্টরকে বলতে শুনলাম, 'শেষ স্টপ, মহাশয়া।' আমি নেমে পড়লাম। এ শহরের নামও জানিনা, তবুও হাঁটতে আরম্ভ করলাম। একটা গির্জার সামনে এসে পড়লাম, সেখানে 'নীরব রাত্রি' সঙ্গীতের মূর্ছনা ভেসে আসছে। গির্জা খালি, একমাত্র অর্গ্যান বাদক বসে অর্গ্যান বাজাচ্ছেন। তাঁর অলক্ষ্যে একটা ঘেরা চেয়ারে বসে পড়লাম। সুন্দর সাজানো খ্রীষ্টমাস ট্রীতে আলো ঝলমল করে যেন আকাশের তারার দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছিল। পরিবেশটা এমনই যে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম বুঝতে পারিনি।

'যখন জেগে উঠলাম কোথায় আছি বুঝতে পারলাম না। দারুণ ভয় হল। সামনে দেখলাম দুটি শিশু সম্ভবতঃ খ্রীষ্টমাস ট্রী দেখতে এসেছিল। একটি মেয়ে আমায় দেখিয়ে বলছিল, 'ওঁকে বোধ হয় সান্টাক্লস নিয়ে এসেছে।' আমি জেগে উঠলে ওরা ভয় পেয়ে গেল। আমি ওদের বললাম ওদের কিছু করব না। ওদের পোশাক ছিল খুবই মলিন। আমি ওদের বাবা মা কোথায় জানতে চাইলাম। ওরা বলল, 'আমাদের কোন বাবা মা নেই।' বুঝলাম ওই দুজন অনাথের অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। ওদের কথা ভেবে আমার নিজের জন্য লজ্জা হল। আমি ওদের খ্রীষ্টমাস ট্রী দেখিয়ে একটা দোকানে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালাম আর কিছু জিনিস কিনে দিলাম। আমার নিঃসঙ্গতা নিমেষে যাদুবলেই দূর হয়ে গেল। ওই দুই অনাথ আমার মনে সুখ এনে দিল যা বহুমাসেও পাইনি। ওদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম আমি কত ভাগ্যবান। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম যে ছোটবয়সে কত আনন্দে বাবা মার কাছে বড়দিনের আনন্দ উপভোগ করেছি। ওই দুই অনাথ আমার জন্য যা করল, ওদের জন্য তার তুলনায় কিছুই আমি দিইনি। আমি দেখলাম সুখ বড় ছোঁয়াচে। দিলেই কিছু পাওয়াও যায়। কাউকে সাহায্য করে আমি শোক আর নিঃসঙ্গতা দূর করেছি। আমি নতুন মানুষ হয়ে উঠেছি—আর তা বরাবরের জন্য।

আমি এমন বহুলোকের গল্প বলতে পারি যাঁরা নিজেদের ভুলে সুখী হয়েছিলেন। এমন গল্পে বহু বই লেখা হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে মার্গারেট টেলার ইয়েটসের কথাই ধরুন তিনি হলেন আমেরিকার নৌবাহিনীর সবচেয়ে জনপ্রিয় মহিলা।

মিসেস ইয়েটস ঔপন্যাসিক, তবে তাঁর রহস্য কাহিনী তাঁর জীবন কাহিনীর চেয়ে বেশী আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। তাঁর জীবনের সেই সত্য কাহিনী যেদিন জাপানীরা পার্ল হারবার আক্রমণ করে। মিসেস ইয়েটস প্রায় একবছর ধরে পঙ্গু হয়ে ছিলেন—হার্ট খারাপের জন্য। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাইশ ঘণ্টাই তিনি শুয়ে কাটাতেন। সবচেয়ে বেশি হাঁটাহাঁটি করতেন তিনি মাত্র দুঘণ্টার জন্য বাগানে গিয়ে, তাও পরিচারিকার কাঁধে ভর দিয়ে। তিনি আমায় বলেছিলেন, তিনি ভাবতেন সারা জীবনটাই তাঁর পঙ্গু হয়ে কাটবে। 'আমি সত্যিই জীবন ফিরে পেতাম না' 'যদি না জাপানীরা পার্ল

হারবার আক্রমণ করত আর আমার মনকে এমনভাবে নাড়া না দিত।'

'এটা যখন ঘটল', মিসেস ইয়েট্স লেখেন : সবকিছুতেই গণ্ডগোল লেগে যায়। একটা বোমা আমার বাড়ির এতই কাছে পড়ে যে ঝাঁকুনিতে বিছানা থেকে ছিটকে যাই। ট্রাকগুলো পাগলের মত ছুটোছুটি করে সেনাবাহিনীর সবার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের একটা স্কুল বাড়িতে নিয়ে আসতে থাকে। রেডক্রস থেকে যাদের বাড়িতে বাড়তি ঘর আছে তাদের সবাইকে রাখতে বলে। আমার বাড়িতে ফোন ছিল, তখনই জেনে নিলাম আমার স্বামী নিরাপদেই আছেন। আমি এরপর ফোন করে সকলকে সান্ত্বনা জানাতে লাগলাম। যে সব মহিলার স্বামী মারা গেছিলেন তাদেরও সান্ত্বনা জানালাম। প্রায় আড়াই হাজার মানুষ মারা গিয়েছিলেন।

'ফোন করতে গিয়ে আমার নিজের কথা ভুলে গেলাম। এতই উত্তেজিত হই যে আমার পঙ্গুত্ব আর রইল না। অপরের জন্যই আমি আবার নিজেকে ফিরে পেলাম আর কখনও শয্যায় পড়ে থাকতে হলনা আমাকে। এখন বুঝি জাপানীরা পার্ল হারবার আক্রমণ না করলে এটা হতোনা, আমি সারাজীবন পঙ্গু হয়েই থাকতাম।

'পার্ল হারবার আক্রমণ আমেরিকার ইতিহাসে বিরাট এক বিয়োগান্ত অধ্যায়, কিন্তু আমার কাছে হয়েছে আশীর্বাদ। ওই প্রচণ্ড প্রয়োজনই আমায় জাগিয়ে তোলে, তাই নিজের কথা ভাববার সুযোগ ছিলোনা।'

মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে যারা সাহায্যের আশায় ছোটেন তাঁদের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশই রোগ মুক্ত হতেন যদি তাঁরা মার্গারেট ইয়েট্সের মত অপরের ভালো করার কথা ভাবতেন। এটা আমার কথা? মোটেই না, ঠিক এই কথাই বলেছেন কার্ল জাঙ্গ, তিনি বলেছিলেন : 'আমার রোগীদের এক তৃতীয়াংশই কোন রোগে ভোগেনা, তারা ভোগে অসাড় উদ্দেশ্যহীনতা আর শূন্যতায়।

আপনি হয়তো বলবেন : 'এ কাহিনী আমার মনে দাগ কাটছে না। আমি নিজেও দুজন অনাথকে নিয়ে সময় কাটাতে পারতাম না পার্ল হারবারে থাকলে মার্গারেট ইয়েট্সের মতই কাজ করতাম। কিন্তু আমার জীবন আলাদা। সাধারণ জীবন আমার। রোজ আটঘণ্টা বাজে কাজ করি। নাটকীয় কিছুই আমার জীবনে ঘটেনা। অন্য লোকের ব্যাপারে আমার আগ্রহ জাগবে কেন? এতে আমার লাভ কি হবে?

প্রশ্নটার যথাযথ জবাব দেবার চেষ্টাই করব। আপনার জীবন যতই একঘেয়ে হোক, রোজই কোন না কোন মানুষের সঙ্গে আপনার দেখা হয়। তাদের ব্যাপারে কি করেন? শুধু কি তাকিয়ে দেখেন না ভাবেন তারা কিভাবে থাকে? যে ডাকপিওন কয়েকশ মাইল হেঁটে আপনার চিঠি বিলি করে একবারও ভেবেছেন কি সে কোথায় থাকে? তার বৌ ছেলেমেয়েদের ছবি কোনকালে দেখতে চেয়েছেন কি? কখনও কি প্রশ্ন করেছেন তার ক্লান্তি আসে কিনা বা কাজ তার একঘেয়ে লাগে কিনা?

মুদীর দোকানের ছেলেটির কথাই ধরুন। তার সম্বন্ধে কখনও ভেবেছেন? আপনার দৈনিক খবর কাগজওয়ালার সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন? কিংবা ঐ যে

ছেলেটি জুতো পালিশ করছে তার কোন খবর ? মানুষ হিসেবে এদের মনে দুঃখ, কষ্ট, এবং যে উচ্চাশার স্বপ্ন দেখে তাদের কথা কোনদিন শুনতে চেয়েছেন কি ? এই রকম কথাই বলছি। পৃথিবীকে ভালোভাবে উন্নতি করতে আপনাকে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল বা সমাজ সংস্কারক হতে হবে না। যে সব মানুষের দেখা পান তাদের দিয়ে কাল থেকে কাজ সুরু করতে পারেন।

এসব করে আপনার কি হবে ? আরও বেশি সুখ পাবেন, পাবেন আত্মগর্ব। অ্যারিস্টটল একেই বলেছিলেন, 'আলোকপ্রাপ্ত স্বার্থপরতা'। জরথ্রুষ্ট বলেছিলেন, 'ভাল কাজ করা কোন কর্তব্য পালন করা নয়। এ হল একটি আনন্দ, এতে আপনার স্বাস্থ্য আর সুখ বেড়ে যাবে।' বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন আরও সরলভাবে বলেছিলেন—'আপনি অন্যের প্রতি ভালো হলে আপনি হবেন সর্বশ্রেষ্ঠ।'

অন্যের কথা ভাবলে আপনার যে কেবল দুশ্চিন্তা দূর হবে তাই নয়, এর ফলে আপনার ঢের বন্ধু হবে আর মজাও পাবেন। কেমন করে ? কথাটা একবার ইয়েলের প্রফেসর উইলিয়াম লিও ফেলপ্সকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি যা বলেছিলেন তা এই-রকম : 'আমি হোটেল, নাপিতের দোকান বা কোন দোকানে যখনই যাদের দেখা পাই তাদের মিষ্টি কথা না বলে যাইনা। আমি এমন ভাবে কথা বলি যাতে তারা বোঝে তারা কোন যন্ত্র নয়। কোন দোকানে গেলে যে মেয়েটি আমায় জিনিস পত্র বিক্রি করে তাকে বলি তার চুল বা চোখ কি সুন্দর। নাপিতকে বলি সারা দিন দাঁড়িয়ে থাকতে তার কষ্ট হয় কিনা। আমি দেখেছি মানুষের নিজেদের সম্পর্কে আগ্রহ দেখালে তাদের মুখ চোখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আমি তাদের সঙ্গে প্রায়ই করমর্দন করি। মনে পড়ছে এক গ্রীষ্মঝরা দিনে আমি নিউ হ্যাভেন রেলপথের ডাইনিং কামরায় মধ্যাহ্ন-ভোজ সারতে যাই। ভিড় উপচে পড়া কামরাটাকে মনে হচ্ছিল যেন আগুনের চুল্লী, কাজকর্মও বেশ ধীর। শেষ পর্যন্ত যখন স্টুয়ার্ড আমার হাতে মেনু তুলে দিল আমি বললাম : 'যে ছেলেরা এই গরমে রান্না করছে তাদের আজ খুবই কষ্ট।' স্টুয়ার্ড চাপা গলায় অভিশাপ বর্ষণ করছিল, ওর গলার স্বর ছিল তিক্ত। প্রথমে ভাবলাম সে ক্রুদ্ধ। আচমকা সে বলল : 'ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। লোকে এখানে এসে কেবল খাদ্য খারাপ এই কথাটাই বলে। তারা ধীর কাজ, দাম আর গরম সম্বন্ধে অভিযোগ জানায়। গত উনিশ বছর ধরে এই অভিযোগ শুনে আসছি আমি, আর আজ আপনিই একমাত্র মানুষ যিনি ফুটন্ত রান্নাঘরের পাচকদের জন্য এ কথা বললেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনার মত আরও যাত্রী যেন আসেন।'

স্টুয়ার্ড অবাক হয়েছিল কারণ আমি ওই রেলপথের রান্নাঘরের নিগ্রো পাচকদের মানুষ বলেই ভেবেছিলাম, তাদের রেলপথের মেশিনের যন্ত্র মাত্র ভাবতে পারিনি। তাদের মানুষ মনে করেছিলাম। মানুষ যা চায় তা হল তাদের একটু মানুষ বলেই ভাবা হোক। রাস্তায় চলার ফাঁকে কারও কোন কুকুর দেখলে তার প্রশংসা করি আমি। তারপর এগিয়ে যাওয়ার পর পিছনে ফিরে তাকালে দেখি লোকটি কুকুরকে আদর জানাচ্ছে।

'একবার ইংল্যান্ডে একজন মেষপালককে দেখি, তার ভাঁড়ার রক্ষক কুকুরটিকে দেখে আমার প্রশংসা বাঁধ মানেনি। আমার প্রশংসায় মেষপালক দারুণ খুশি হয়।' ঐ কুকুর আর তার মেষপালক সম্বন্ধে সামান্য আগ্রহ দেখানোর ফলে আমি ঐ মেষপালককে আনন্দ দিয়েছিলাম এবং নিজেও আনন্দ পেয়েছিলাম।

একবার ভাবতে পারেন যে মানুষ পথ চলতে গিয়ে কুলির করমর্দন করে, পাচককে সহানুভূতি জানায় আর কুকুরের প্রশংসা করে ; তাকে কখনও কোন মনস্তাত্ত্বিকের কাছে যেতে হয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ? কখনই তা বলতে পারবেন না। এক চীনা প্রবাদ আছে : 'হাতে গোলাপ ফুল ধরলে তার কিছু গন্ধ লেগে থাকে।'

বিলি ফেলপসে একথা যে জানতেন তা আর বলতে হয় না।

আপনি যদি পুরুষ হন তাহলে এই অংশটা না পড়তেও পারেন। এতে আপনার আগ্রহ না লাগাই সম্ভব। এতে শোনাব এক অসুখী, দুশ্চিন্তা পীড়িত তরুণীকে কি ভাবে বেশ কজন পুরুষ বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মেয়েটি আজ ঠাকুমা হয়েছে। বেশ কবছর আগে আমি ওই মেয়েটির এবং তার স্বামীর বাড়িতে রাত কাটাই। ওদের শহরে আমি বক্তৃতা দেবার জন্য গিয়েছিলাম, পরদিন সকালে সে আমায় গাড়ি চালিয়ে পঞ্চাশ মাইল দূরে স্টেশনে পৌঁছে দেয়। কথায় কথায় আমি তাকে বন্ধুত্ব অর্জন নিয়ে কথা বললে সে বলে : মিঃ কার্নেগী, আপনাকে এমন কিছু শোনাবো যা আমার স্বামীকেও বলিনি।' সে আমায় জানালো, সে মানুষ হয় ফিলাডেলফিয়ার এক সমাজ সেবার অফিসে। সে বলে : 'আমার শৈশব কাটে চরম দারিদ্র্যে এবং পোশাক ছিল খুব সস্তার। আমার এতে লজ্জার অবধি ছিলনা, তাই কাঁদিতাম। আমার সহকারীকে তাই সবসময় তার নিজের কথা জিজ্ঞাসা করতাম, যাতে সে আমার পোশাকের দিকে না তাকায়। এতে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। আমি ওই তরুণদের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠলাম। আমি চমৎকার শ্রোতা ছিলাম, তারাও তাই খুব খুশি হত। তাই আমি হয়ে উঠলাম সবচেয়ে জনপ্রিয় তরুণী। ওদের তিনজন আমায় বিয়ের প্রস্তাব করল।'

এ কাহিনী শুনে অনেকেই হয়তো বলবেন, 'অন্যের ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া বাজে ব্যাপার ! এসব আমার চলবে না ! আমার টাকা আমার ব্যাগেই রাখব, ইচ্ছেমত সব খরচ করবো—কারও কথায় কান দেব না—!'

তা আপনার অভিমত এ রকম হলে করার কিছু নেই, তবে আপনার কথা যদি ঠিক হয় তাহলে ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত যত দার্শনিক আর শিক্ষাগুরু জন্মেছেন যেমন,—যীশু,কনফুসিয়াস, বুদ্ধ, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, সক্রেটিস, সেন্ট ফ্রান্সিস—সবাই ভুল করেছেন। ধর্মগুরুদের কথা আপনার ভাল না লাগলে আসুন কজন নাস্তিক কি বলেছেন শোনা যাক। প্রথমেই ধরা যাক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এ.ই. হাউসম্যানের কথা। এযুগের তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ১৯৩৬ সালে তিনি কেম্ব্রিজে এক ভাষণ 'অবতার নাম ও প্রকৃতি' নিয়ে বলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন : 'যীশুর এই কথাই সবসেরা : 'সবচেয়ে বড় নীতি তাঁরই আবিষ্কার—

যে জীবন আবিষ্কার করতে পারে, সেই তা হারায়, আর যে আমার জন্য জীবন হারাবে সেই তা খুঁজে পাবে।'

আমার সারা জীবন ধরেই ধর্মপ্রচারকদের একথা বলতে শুনেছি। কিন্তু হাউসম্যানের কথা আলাদা, তিনি ছিলেন ঘোর নাস্তিক আর বাস্তববাদী। একসময় আত্মহত্যার কথাও তিনি ভেবেছিলেন। তিনিই বলেছিলেন: 'যে শুধু নিজের কথা ভাবে সে জীবনে কিছুই পায়না। সে বড় দুঃখী। কিন্তু অন্যের উপকার যে করে সে জীবন পরিপূর্ণ উপভোগ করতে পারে।'

হাউসম্যান যদি আপনার মনে দাগ কাটতে না পারেন তাহলে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আমেরিকান নাস্তিক থিয়োডোর ড্রেইসারের পরামর্শ নিতে পারেন ড্রেইসার সব ধর্মকে বলতেন: 'নিছক রূপকথা আর বোকাদের উদ্ভট কল্পনা। জীবন তাঁর কাছে মূল্যহীন।' এসত্ত্বেও ড্রেইসার যীশুর একটা কথা মানতেন—অপরকে সেবা করা।

অতএব অপরের জীবন যদি আমরা সুখময় করতে চাই, তা হলে কেবল নিজের জন্য নয়, অন্যদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা উচিত। নিজের আনন্দ নির্ভর করে অন্যদের আনন্দের উপর। তাই ড্রেইসারের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা যদি অন্যদের উন্নতির চেষ্টা করি তা এখনই করা উচিত। যদি দুশ্চিন্তা কাটিয়ে শান্তি আহরণ করতে চাই, চাই সুখ, তাহলে সাত নম্বর নিয়ম হলো:

'অপরের প্রতি আগ্রহী হয়ে নিজেকে ভুলে যান। প্রতিদিন অন্ততঃ একজনের মুখে হাসি আর আনন্দ ফুটিয়ে তুলুন।'

॥ উনিশ ॥

আমার বাবা মা কিভাবে দুশ্চিন্তা দূর করেন

আগেই বলেছি আমি মিসোরীর এক খামারে মানুষ হই। সে কালের কৃষকদের মতই আমার বাবা মা খুবই কষ্ট করতেন। মা এক গ্রামে শিক্ষিকার কাজ করতেন আর বাবা প্রচুর খেটে মাসে মাত্র বারো ডলার আয় করতেন। মা শুধু আমাদের পোশাকই বানাতেন না, সাবান তৈরিও করতেন কাপড় কাচবার জন্য।

আমাদের কদাচিৎ নগদ পয়সা থাকতো—একমাত্র বছরে একবার যখন শুয়োর বিক্রি করা হত। আমাদের মাখন আর ডিম বদলে আমরা পেতাম ময়দা, চিনি আর কফি। আমার যখন বারো বছর বয়স তখনও বছরে খরচা করার জন্য পঞ্চাশ সেন্টও পেতাম না। আমার আজও মনে পড়ে একদিন ৪ঠা জুলাই বাবা আমায় খরচ করার জন্য দশ সেন্ট দেন। আমার মনে হয়েছিল যে ভারতবর্ষের সমস্ত সম্পদ হাতে পেয়েছি।

আমি এক মাইল হেঁটে গ্রামের এক কামরার স্কুলে যেতাম। যখন হাঁটতাম তখন হাঁটু অবধি বরফ ঠেলে যেতে হত, তাপমাত্রা শূন্যের আঠাশ ডিগ্রী নিচে। চোদ্দ বছর বয়সের আগে রবার ঢাকা জুতো পাইনি। সারা শীতকালই আমার পায়ের পাতা ঠাণ্ডায় ভিজে থাকতো। ছোটবেলায় ভাবতেই পারিনি কারও শীতকালে পায়ের পাতা শুকনো থাকে।

আমার বাবা মা রোজ ষোল ঘণ্টা খাটতেন, তবু আমাদের দুর্দশা কাটেনি, সব সময় ধারদেনা আর দুশ্চিন্তা ছিল। আমার মনে পড়ে একবার ১০২ নদীর প্রবল বন্যায় আমাদের সব শস্যক্ষেত্র ভাসিয়ে নেয়। বছরের পর বছর শুয়োরগুলো কলেরায় মারা যায়, তাদের পুড়িয়েও ফেলা হয়। সেই গন্ধ এখনও নাকে আসে।

এক বছর বন্যা হলনা, প্রচুর শস্য জন্মালো। আমাদের গোরু বাছুরদের খাইয়ে মোটা করা হল! কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে বছর শস্যের দাম কমে গেল আর আমরা বিক্রি করে পেলাম মাত্র ত্রিশ ডলার। সারা বছরের পরিশ্রমের দাম মাত্র ত্রিশটা ডলার।

সব কাজেই আমাদের ক্ষতি হচ্ছিল। কোন ব্যাপারেই সাফল্য ছিলনা। দশ বছরের হাড়ভাঙা খাটুনির ফল হল আমরা দেনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। যে ব্যাঙ্কে খামার বাঁধা দেওয়া ছিল তারা বাবাকে অপমান করে সেটা নিয়ে নেবে জানালো। বাবার বয়স ছিল সাতচল্লিশ, ত্রিশ বছরের কঠোর পরিশ্রমে তিনি পান শুধু দেনার দায়। বাবা সেটা সহ্য করতে পারেন নি—দুশ্চিন্তায় তাঁর শরীর ভেঙে গেল। খিদে ছিলনা তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গেল, ওজন কমে গেল। বাবা এতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন যে তাঁর আর বাঁচার ইচ্ছে ছিল না। ডাক্তার বললেন বাবা আর ছ'মাসও বাঁচবেন না। বাবা খামারে ঘোড়াদের খাওয়াতে গিয়ে ফিরতে দেরী করলে মা ছুটে যেতেন। মা ভয় পেতেন

হয়তো দেখবেন বাবার নিষ্প্রাণ দেহ পড়ে আছে। বাবা ১০২ নদীর ব্রিজে দাঁড়িয়ে ভাবতেন ঝাঁপিয়ে পড়ে সব জবালা শেষ করে দেবেন কি না।

অনেক বছর পরে বাবা বলেছিলেন তিনি ঝাঁপ দেননি শুধু মার ভগবানে বিশ্বাসের জন্য। মা বলতেন আমরা যদি ভগবানে বিশ্বাস করি তাহলে শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হয়ে যাবে। মা ঠিকই বলেছিলেন, সব শেষ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় মিটে গেল। বাবা এরপরেও বিয়াল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন আর ১৯৪১ সালে ঊননব্বই বছর বয়সে মারা যান।

ওই সমস্ত বছরের কষ্ট আর হৃদয়বেদনায় মা কখনও দুশ্চিন্তা করেন নি। তিনি ভগবানের কাছে সব কষ্টের কথা বলে প্রার্থনা করতেন। প্রতি রাতে শুতে যাওয়ার আগে মা বাইবেল থেকে খানিকটা পড়ে শোনাতেন। মা আর বাবা প্রায়ই যীশুর সান্ত্বনার সেই বাণী পড়তেন : 'আমার পিতার প্রাসাদে অনেক ঘর আছে···সেখানে তোমাদের জন্য ঘর রাখবো···আমি যেখানে থাকবো তোমরাও সেখানে থাকবে।' এরপর আমরা হাঁটু মুড়ে বসে ঈশ্বরের কাছে চাইতাম ভালবাসা আর আশ্রয়।

উইলিয়াম জেমস যখন হার্ভার্ডের প্রফেসর, তিনি বলেছিলেন : 'দুশ্চিন্তার একমাত্র ওষুধ হল ধর্মে বিশ্বাস রাখা।'

এটা আবিষ্কারের জন্য হার্ভার্ডে যাওয়ার দরকার হবে না। আমার মা মিসৌরীর খামারেই তা জানতে পারেন। বন্যা, দেনা বা কষ্ট তার সুখী হাস্যোজ্জ্বল মুখেরভাব নষ্ট করতে পারেনি। আমার এখনও কানে ভেসে আসে মা কাজ করতে করতে এই গানটা গাইছেন :

'ঈশ্বরের কাছ থেকে বর্ষিত হয়ে চলেছে অপরূপ শান্তি,
প্রার্থনা করি চিরকাল যেন আমার শান্তি প্রেমে ডুবে থাকে।'

মা চেয়েছিলেন আমি ধর্মের কাজে আত্মনিয়োগ করি। আমি বিদেশে মিশনারীর কাজ নেব ভেবেও ছিলাম। তারপর কলেজে ঢুকলাম। তারপর আস্তে আস্তে আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন এল। আমি জীববিদ্যা, বিজ্ঞান, দর্শন আর তুলনামূলক ধর্মপুস্তক নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলাম। বাইবেল কিভাবে রচিত হয় তা পড়লাম। আমি বাইবেলের অনেক বিষয়েই প্রশ্ন তুললাম। সেকালের ধর্ম প্রচারকদের কাজকর্মের সম্বন্ধেও এসব প্রশ্ন তুললাম। আমি একটু বিহ্বল হয়ে পড়ি। ওয়াল্ট হুইটম্যানের মতই আমার 'অদ্ভুত সব প্রশ্ন' জেগে উঠল। জীবনের কোন মূল্য আছে বলে মনে হল না। কি বিশ্বাস করা উচিত বুঝতে পারলাম না। প্রার্থনা বন্ধ করে দিলাম। মনে জাগল কোটি কোটি বছর আগের ডাইনোসরদের মতই মানুষের কোন স্বর্গীয় উদ্দেশ্য নেই। ভাবলাম ডাইনোসরদের মত মানুষও একদিন লুপ্ত হবে। আমি জানতাম বিজ্ঞানে আছে সূর্য আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে আসবে এবং তাপ শতকরা দশভাগ কমলেই পৃথিবী থেকে সব প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এসব প্রশ্নের উত্তর জানি বলে প্রচার করব ? না। কোন মানুষই এখনও জীবন রহস্য ব্যাখ্যা করতে পারেনি। আমরা রহস্যেই আবৃত। আমাদের শরীরটাই রহস্য।

বাড়িতে যে বিদ্যুৎ আছে সেটাও তাই। ফাটা দেওয়ালে ফুল ফোটাও তাই। জানালার বাইরে সবুজ ঘাসও তাই। জেনারেল মোটর্স রিসার্চ এর চার্লস্ এফ কেটারিং ঘাস কেন সবুজ জানার জন্য নিজের পকেট থেকে অ্যান্টিয়ক কলেজকে বছরে হাজার ডলার করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'আমরা যদি জানতে পারি ঘাস কি করে সূর্যালোক, জল আর কার্বনডাই-অক্সাইডকে খাদ্য আর শর্করায় পরিণত করে, তাহলে আমরা সভ্যতাকে বদল করতে পারব।'

আপনার গাড়ির ইঞ্জিনের কাজও কম আশ্চর্য নয়। জেনারেল মোটরস্ রিসার্চ ল্যাবরেটরিগুলি কোটি কোটি টাকা খরচ করে জানার চেষ্টা করেছেন সিলিন্ডারে সামান্য এক স্ফুলিঙ্গ কিভাবে মোটর চালায়।

আমাদের শরীর, বিদ্যুৎ, ইঞ্জিন ইত্যাদির রহস্য না জানলেও এসব আমাদের ব্যবহারে বাধা নেই। প্রার্থনা ও ধর্মের রহস্য আমি বুঝিনা বলে তা উপভোগ করতে পারব না এমন কথাও নেই। শেষ পর্যন্ত আমি সান্তায়নের কথার মর্ম অনুধাবন করছি : 'মানুষ জীবন কি জানার জন্য জন্মায়নি, জন্মেছে তা উপভোগ করার জন্য।'

আমি বোধহয় ধর্মের ব্যাপারে কথা বলছি মনে হবে। আসলে তা নয়। আমি ধর্মের এক নতুন উপলব্ধি লাভ করেছি। গির্জায় যে মতভেদ আছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু ধর্ম আমার কি করতে পারে তা নিয়ে আমার ভাবনা আছে। যেমন ভাবনা আছে বিদ্যুৎ, ভাল খাদ্য নিয়ে। এগুলো আমায় আরও ভাল জীবন যাপনে সাহায্য করে, কিন্তু ধর্ম তার চেয়েও বেশি করে। এ দেয় সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ। এ আমায় সুখী, পূর্ণ জীবন কাটাতে সাহায্য করে। উইলিয়ম জেমসের ভাষায় আমরা যা পাই তাহল 'জীবনের নব আনন্দ···আরও জীবন···আর পরিপূর্ণ জীবন।' এ আমায় দেয় সুস্বাস্থ্য, বিশ্বাস, আশা আর সাহস। জীবনের এক নতুন দিগন্তই আমাদের সামনে খুলে ধরে।

ফ্রান্সিস বেকন ঠিকই বলেছিলেন সাড়ে তিনশ বছর আগে : 'অল্প দর্শনে লোকে নাস্তিক হয়, কিন্তু দর্শনের মধ্যে ঢুকলে তাকে ধার্মিক হতেই হয়।'

আমার মনে পড়ছে মানুষ যখন ধর্ম আর বিজ্ঞান নিয়ে তর্ক করত। নতুন বিজ্ঞান —মনোবিজ্ঞান—যীশু যা শিক্ষা দিয়েছেন তাই শিক্ষা দেয়। কেন? মনস্তাত্ত্বিকরা জানেন প্রার্থনা আর তাঁর ধর্মাকাঙ্ক্ষা সমস্ত রকম দুশ্চিন্তা দূর করে, দূর করে উদ্বেগ, ভয় আর অর্ধেক রোগ। তাঁরা জানেন, যেহেতু তাদেরই ডঃ এ. এ. ব্রিল বলেছেন : 'সত্যিকার যে ধর্মপরায়ণ তার মনরোগ জন্মায় না।'

ধর্ম যদি সত্য না হয়, তাহলে জীবন হয়ে পড়ে অর্থহীন। এটা হাস্যকর হলেও করুণ।

হেনরী ফোর্ডের মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করি। তাঁর সঙ্গে দেখা করার আগে ভেবেছিলাম পৃথিবীর একটি বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্লান্তি তাঁর মধ্যে প্রকাশ পাবে। তাই অবাক হয়ে গেলাম যখন আটাত্তর বছর বয়সেও তাঁকে শান্ত সমাহিত দেখতে পেলাম। তাই যখন জানতে চাইলাম তিনি দুশ্চিন্তা করেন

কি না, তিনি জবাব দিলেন, 'না। আমার মনে হয় ভগবানই সমস্ত কিছু পরিচালনা করছেন আর তাই তিনি আমার কোন পরামর্শ চাননা। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। তাই দুশ্চিন্তার কি প্রয়োজন ?'

আজকের দিনে তাই মনস্তাত্ত্বিকরাও ধর্মপ্রচারক হয়ে পড়ছেন। তারা ধর্মপালন করার কথা পরজীবনের শান্তির জন্য বলেন না বরং বলছেন এ জীবনের নরকাগ্নি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য। সেই নরকাগ্নি হল পাকস্থলীর আলসার, এনজাইনা পেকটোরিস, স্নায়ু ভেঙে পড়া আর পাগল হওয়া।

হ্যাঁ, খ্রীষ্ট ধর্ম অত্যন্ত উৎসাহ ব্যঞ্জক সাম্প্রদায়িক কাজ। যীশু বলেছেন : 'আমি এসেছি এইজন্যই যে তোমরা আরও জীবন লাভ করতে পারো।' যীশু তাঁর আমলে ধর্মের সূক্ষ্ম নিয়ম কানুন সম্বন্ধে প্রতিবাদ জানাতেন। তিনি ছিলেন এক বিদ্রোহী। তিনি এক নতুন ধর্ম সৃষ্টি করেন—যে ধর্ম পৃথিবীকে বদলে দিতেই চেয়েছিল। তাই তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। তিনি বলেছিলেন ধর্ম মানুষেরই জন্য ধর্মই মানুষ নয়। ছুটি মানুষের জন্য—ছুটির জন্য মানুষ নয়। তিনি ভয়ের বিরুদ্ধে যত কথা বলেছিলেন পাপের জন্য ততটা নয়। যীশু তাঁর শিষ্যদের আনন্দ করতে বলতেন। তিনি এই শিক্ষাই দিতেন।

যীশু বলতেন ধর্মের দুটো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে : 'মন প্রাণ, ঢেলে ভগবানকে ভালোবাসো আর পড়শীকে নিজের মত মনে করো।'

আধুনিক মনস্তত্ত্বের জনক উইলিয়াম জেমস তার বন্ধু প্রফেসর টমাস ডেভিডসনকে লিখেছিলেন, ভগবানকে বাদ দিয়ে আমার চলা অসম্ভব হয়ে পড়ছে।'

বইটির গোড়ায় দুটি গল্পের কথা বলেছিলাম। একটি আগে বলেছি। এবার দ্বিতীয়টি বলছি। একজন মহিলার কাহিনী এটি, যিনি 'ভগবানকে বাদ দিয়ে কিছুতেই চলতে পারেন নি।'

আমি মহিলাটির নাম বলছি মেরী কুশম্যান, যদিও এটা তাঁর আসল নাম নয়। এটা তাঁর পরিবারের পরিচয় গোপন রাখার জন্যই মাত্র। তবে কাহিনীটি সত্য। সেটা এই রকম :

তিনি লিখেছিলন---'অর্থনৈতিক ডামাডোলের সময় আমার স্বামীর সাপ্তাহিক আয় ছিল মাত্র আঠারো ডলার'। 'মাঝে মাঝে তাও জুটত না কারণ তিনি অসুস্থ থাকতেন। মাঝে মাঝে নানা ব্যাধি আসত, মামপস, পীতজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি। যে বাড়িটা নিজেদের হাতে তৈরী করি সেটাও শেষ পর্যন্ত চলে যায়। মুদীর দোকানে আমাদের দেনা ছিল পঞ্চাশ ডলার। পাঁচটা সন্তানকে খাওয়াতেও হত। পড়শীদের জামা কাপড় ইস্ত্রী করতাম আমি আর পুরনো জামা কাপড় কিনে ছেলেমেয়েদের ব্যবহারের মত করে নিতাম। দুশ্চিন্তায় আমার অসুখ করে। একদিন যে মুদীর কাছে আমাদের ধার ছিল পঞ্চাশ ডলার সে অভিযোগ করল আমাদের এগারো বছরের ছেলে কয়েকটা পেন্সিল চুরি করেছে। ছেলে আমার কেঁদে সব কথা বলল। আমি জানতাম আমার ছেলে সৎ আর নম্র সে কখনই পেন্সিল চুরি করেনি। ব্যাপারটায় আমি ভেঙে পড়লাম। কত যে

কষ্ট আমরা সহ্য করেছি তা ভাবলাম—ভবিষ্যতের কোন আশাই আমাদের রইল না। এরপর সাময়িক ভাবেই বোধ হয় আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। আমি কাপড় কাচা কল বন্ধ করে পাঁচ বছরের মেয়েকে নিয়ে ঘরের জানালা দরজা সব বন্ধ করে গ্যাস চালিয়ে দিলাম কিন্তু আগুন ধরালাম না। বাচ্চা মেয়েটি আমায় বলল, 'মা তুমি এরকম করছ কেন।' আমি বললাম হাওয়া আসছে, তাই।' মেয়েকে ঘুমুতে চেষ্টা করতে বললে সে বলল, 'কী আশ্চর্য, আমরা তো একটু আগেই ঘুম থেকে উঠলাম।' আমি বললাম, 'তা হোক আরও একটু ঘুমোবো।' একথা বলে হিটার থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাসের শব্দ শুনতে লাগলাম। গ্যাসের গন্ধ জীবনে ভুলবো না···

আচমকা আমার মনে হল গান শুনতে পেলাম। মন দিয়ে শুনতে চাইলাম। রান্নাঘরে রেডিওটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। এখন তাতে কিছু আসে যায় না। আচমকা কানে এল কে যেন প্রার্থনা গাইছে, সেই সঙ্গীতের মর্মার্থ হল এই: 'প্রভু যীশু আমাদের কত বড় বন্ধু, তাঁর কাছে কেন আমরা আমাদের দুঃখ বেদনার কথা জানাইনা। ঈশ্বরের কাছে এই কষ্টের কথা বলিনা বলেই আমরা যন্ত্রণা পাই।'

'ওই গান শুনে আমি বুঝলাম কত বড় ভুল করেছি। আমি একাকী দুঃখ বহন করতে চেয়েছি। ভগবানকে প্রার্থনার মধ্যে সব জানাই নি। লাফিয়ে উঠে গ্যাস বন্ধ করে জানালা দরজা খুলে দিলাম।

'আমি সারাদিন কাঁদলাম আর প্রার্থনা করলাম। একমাত্র সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানাই নি—বরং ভগবানের যে আশীর্বাদ পেয়েছি তার জন্যে ধন্যবাদ জানালাম: আমার পাঁচটি স্বাস্থ্যবান ছেলেমেয়ে পেয়েছি বলে। আমি ভগবানের কাছে শপথ করলাম জীবনে কখনও অকৃতজ্ঞ হব না। সে প্রতিজ্ঞা আমি রেখেছি।

'আমাদের বাড়ি হারাবার পর একটা স্কুল বাড়িতে মাসে পাঁচ ডলার ভাড়ায় থাকতে পেলাম। তবুও ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। এই কারণেই যে অন্ততঃ এ জায়গায় শুকনো আর গরম থাকা যায়। আরও ধন্যবাদ দিলাম এজন্য যে, সব কিছু এর চাইতে আরও খারাপ হয়নি। আমার মনে হয় ভগবান আমার কথা শুনেছিলেন। কারণ একটু একটু করে অবস্থা ভালো হতে লাগলো—রাতারাতি অবশ্য নয়, তবে অবস্থার উন্নতি হলে কিছু টাকা জমালাম। আমি একটা কাজও পেলাম। আমার ছেলেও কাজ পেয়ে গেল। আজ আমার ছেলেমেয়েরা সবাই বড়, তারা বিয়েও করেছে। আমার তিনজন সুন্দর নাতি নাতনী আছে। আজ ভাবি সেই ভয়ানক গ্যাস খোলার কথা, হায়! যদি সময় মত না উঠে পড়তাম? তাহলে কত আনন্দময় মুহূর্তই না হারাতাম! কেউ আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে শুনলেই তাই বলি, কখনও একাজ করবেন না। কখনও না। যে অন্ধকার মুহূর্ত আমাদের জীবনে আসে, তা ক্ষণিকের—এরপরেই রয়েছে ভালো সময়···।'

আমেরিকায় গড়ে পঁয়ত্রিশ মিনিটে একজন আত্মহত্যা করে। একশ কুড়ি সেকেণ্ডে গড়ে একজন পাগলও হয়। এই সব আত্মহত্যা আর উন্মাদ হওয়ার ঘটনা অনেকটাই কমত, যদি এই সব মানুষ ধর্ম আর ঈশ্বরের স্মরণ নিত।

জীবিত মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে ডঃ কার্ল জাঙ্গ অতি সুনামের অধিকারী। তিনি তাঁর 'আত্মার সন্ধানে মানুষ' বইতে লিখেছিলেন : 'গত ত্রিশ বছরে পৃথিবীর সব সভ্যদেশের বহু মানুষ আমার পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। আমি শত শত রোগীর চিকিৎসা করেছি আমার পঁয়ত্রিশ বছর উর্ধের রোগীদের সবাইকার একটাই প্রয়োজন দেখেছি—জীবনে কোন ধর্ম খুঁজে পাওয়া। এটা নির্ভয়েই বলতে পারি তাদের প্রত্যেকেই অসুস্থ হয় প্রাণময় ধর্মের কাছ থেকে তারা যা পেতেন তা হারিয়েছেন বলে, ওদের মধ্যে যাঁরা ধর্মে বিশ্বাস ফিরে পাননি তাঁরা সুস্থও হননি।' এই কারণেই কার্ল জাঙ্গের লেখাটি বারবার পড়া দরকার।

উইলিয়াম জেমসও ঠিক এই কথাই বলে গেছেন : বিশ্বাস এমন একটা শক্তি যার উপর নির্ভর করেই মানুষ বেঁচে থাকে, আর এর অনুপস্থিতি মানেই ধ্বংস অনিবার্য।'

বুদ্ধের পর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা মহাত্মা গান্ধীও প্রার্থনার শক্তিতে উজ্জীবিত না হলে ঢের আগেই ভেঙে পড়তেন। একথা কি করে জেনেছি? গান্ধী নিজেই কথাটা বলেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'প্রার্থনা ছাড়া অনেক আগেই আমি পাগল হয়ে যেতাম!'

হাজার হাজার মানুষের কথাও তাই। আমার বাবা, যার কথা আগেই বলেছি—তিনি আমার মার প্রার্থনা আর বিশ্বাস ছাড়া হয়তো জলে ডুবে আত্মহত্যাই করে বসতেন। আমাদের পাগলাগারদগুলোর হাজার হাজার নিপীড়িত মানুষ যদি একাই তাদের ভার বহন না করে বড় শক্তির কাছে প্রার্থনা করতো তাহলে তাদের আত্মা শান্তি পেত।

আমরা যখন কষ্টে পড়ি তখন ভগবানের স্মরণ নিই। যে বিপদে পড়ে সে আর নাস্তিক থাকে না। কিন্তু বিপদে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি কেন? আমরা নিজেদের শক্তি রোজই বাড়াব না কেন? শুধু রবিবারের জন্যই অপেক্ষা করব কেন? বহুকাল ধরেই আমি শনি বা রবিবার ছাড়া ফাঁকা গির্জায় গিয়েছি। যখন খুব তাড়াহুড়োর ব্যাপার করি তখনই নিজেকে বলতে চাই : 'এক মিনিট দাঁড়াও, ডেল কার্নেগী। এত তাড়াহুড়ো কেন? ক্ষুদ্র মানুষ, তোমার ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা দরকার।' এরকম অবস্থায় আমি প্রথম যে গির্জা পাই তাতেই প্রবেশ করি। যদিও আমি প্রটেস্টান্ট ধর্মে বিশ্বাসী, তবুও আমি ফিফ্থ এ্যাভিনিউর রোমান ক্যাথলিক চার্চে ঢুকে পড়ি মনে করি আর মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে আমার আয়ু সীমাবদ্ধ; কিন্তু সমস্ত চার্চের আধ্যাত্মিক সত্য চিরকালীন। সেখানে চোখ বন্ধ করে বসে আমি প্রার্থনা করতে থাকি। এর ফলে আমার ক্ষমতা আর মূল্যবোধ ফিরে পাই। আপনাকেও এরকম করার পরামর্শ দিতে পারি।'

এ বই লেখার সময় গত ছ'বছর ধরে আমি অসংখ্য উদাহরণ জোগাড় করেছি। স্ত্রী পুরুষরা কি ভাবে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তাদের ভয় আর উৎকণ্ঠা দূর করেছেন। এখানে একজন বই বিক্রেতা জন আর, অ্যান্টনীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাব। তিনি

সেটা আমাকে বলেছিলেন।

'বাইশ বছর আগে আমি আমার আইন ব্যবসার প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে এক আমেরিকান আইন বই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের বিক্রেতা হই। আমার বিশেষত্ব ছিল নিতান্ত দরকারী আইনের বই আইনজ্ঞদের বিক্রী করা।

'আমি বেশ দক্ষই ছিলাম। সব কায়দা কানুনই আমার জানা ছিল। আইনজ্ঞের কাছে যাওয়ার আগে আমি তাঁর আয়, কাজ কর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে জেনে নিতাম। সাক্ষাতের সময় ওই খবর গুলোই কাজে লাগাতাম। তবুও কোথাও একটা গোলমাল হত, আমি অর্ডার পাচ্ছিলাম না।

'খুবই হতাশ হয়ে পড়লাম। দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে নামলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের খরচও উঠতো না। একটা ভয় আমায় চেপে ধরল। লোকের কাছে যেতেই ভয় লাগত। ভয়টা এমনই হল যে কারও কাছেই হাজির হতে পারতাম না, ঘুরে চলে আসতাম।

'আমার ম্যানেজার আমাকে তিরস্কার করে জানালেন বিক্রী না বাড়াতে পারলে আগাম টাকা বন্ধ করে দেবেন। বাড়িতে আমার স্ত্রী তিনটি সন্তানকে মানুষ করতে এবং মুদীর টাকা মেটানোর জন্য আরও টাকা চাইতে লাগলেন। দুশ্চিন্তা আমায় চেপে ধরল। ক্রমেই মরীয়া হয়ে উঠলাম। কি করব বুঝতে পারলাম না। আমি একেবারে ভেঙে পড়লাম। হোটেলের বিল মেটাবার ক্ষমতাও আমার ছিলনা। বাড়িতে ফেরার গাড়ি ভাড়াও আমার ছিল না—নৈশভোজ হিসেবে খেলাম মাত্র একগ্লাস দুধ। সম্পূর্ণ পরাজিত এক মানুষই ছিলাম আমি। হতাশা আর দুঃখে ভেঙে পড়ে বুঝলাম মানুষ কেন জানালা দিয়ে লাফিয়ে আত্মহত্যা করে। সাহস থাকলে আমিও হয়তো তাই করতাম। অবাক হয়ে কেবল ভাবতাম এ জীবনের উদ্দেশ্য কি!

'আর কারও কাছে যাওয়ার উপায় ছিলোনা বলে ভগবানের কাছেই আত্মসমর্পন করলাম। আমি প্রার্থনা সুরু করলাম। আমি সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করে চাইলাম আলোক আর পথের নির্দেশ—কি করে এই অন্ধকারময় দিন পার হব। আমি ভগবানের কাছে চাইলাম আরও বইয়ের অর্ডার যাতে স্ত্রী পুত্রকে খাওয়াতে পারি। প্রার্থনার পর চোখ খুলতেই দেখলাম একখণ্ড বাইবেল টেবিলে রাখা আছে। বইটা খুলে আমি যীশুর অমর বাণী দেখতে পেলাম যা দিয়ে তিনি হাজার হাজার দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত মানুষকে পথ দেখিয়েছেন যুগে যুগে। যার সাহায্যে তিনি তাঁর শিষ্যদের দুশ্চিন্তা দূর করতে উপদেশ দান করতেন:

'জীবন সম্পর্কে চিন্তা কোরনা কি খাবে বা পান করবে ভেবোনা, কি পরবে তাও ভেবোনা। খাদ্য আর পোশাকের চেয়েও কি জীবন বেশি নয়?...প্রথমেই ঈশ্বরের রাজত্বের কথা ভাবো আর তার ন্যায় বিচার...।'

'প্রার্থনা করতে করতে একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটে গেল—আমার সব উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা কেটে গেল। সব দুশ্চিন্তা কেটে গিয়ে মন এক অদ্ভুত আশা আর জয়ের আনন্দে ভরে উঠল।'

'আমি আবার সুখী হয়ে উঠলাম। খাওয়ার পয়সা না থাকলেও বিছানায় শুয়ে গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়লাম। এমন বহুদিন ঘুমাইনি।

'পরদিন সকালে আনন্দে কাজে যাওয়ার তর সইছিল না। মনে সাহস নিয়ে বৃষ্টিস্নাত সকালে এগিয়ে গেলাম। ক্রেতার অফিসে বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গীতেই সটান ঢুকলাম, তারপর হাসিমুখে বললাম, সুপ্রভাত, মিঃ স্মিথ! আমি আমেরিকান ল বুক কোম্পানীর জন আর. অ্যান্টনী।'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ,' তিনিও হেসে বললেন হাত বাড়িয়ে। 'আপনাকে দেখে খুশি হলাম। বসুন।'

'সারা সপ্তাহে যা ব্যবসা করেছি ওইদিন তার চেয়েও বেশি করলাম। ওইদিন সন্ধ্যায় একজন বিজয়ী বীরের মতই হোটেলে ফিরলাম। নিজেকে নতুন বলেই মনে হতে লাগল। সত্যিই নতুন মানুষ হয়ে উঠলাম, মনটাও বদলে গেল। ওইদিন থেকে আমার বিক্রীও দারুণ বেড়ে গেল।

'আমার যেন ওইদিন থেকে নবজন্ম হল। ভগবানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নতুন করে স্থাপিত হল। সাধারণ একজন মানুষকে পরাজিত করা যায় কিন্তু ভগবানের আশ্রিত কাউকে হারানো অসম্ভব। এটা আমার জীবনেই সত্য প্রমাণিত।

'চাইলেই আপনি তা পাবেন; খুঁজলেই তা পাবেন, ডাকুন দরজা খুলে যাবে।'

ইলিনয়ের মিসেস এল. জি. বীয়ার্ডের জীবনে যখন বিষাদের ছায়া নেমে আসে তিনি আবিষ্কার করেন ভগবানের এই আরাধনাতেই পাওয়া যায় শান্তি: হে ভগবান, আমার নয়, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'

আমার সামনেই তাঁর চিঠি রয়েছে। তিনি লিখেছিলেন: 'একদিন সন্ধ্যায় আমাদের টেলিফোন বেজে ওঠে। চোদ্দবার বাজার আগে ওটা ধরার সাহস পাইনি। আমি জানতাম ওটা হাসপাতাল থেকে আসছিল। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে ছিলাম। আমার ভয় হচ্ছিল আমাদের ছোট্ট ছেলেটি মারা যাচ্ছে। ওর মেনিনজাইটিস হয়। ওকে পেনিসিলিন দেওয়া হয়েছিল আর তাতে জ্বর ওঠানামা করছিল। ডাক্তার ভয় পাচ্ছিলেন রোগ মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়েছে ফলে মস্তিষ্কে টিউমার হয়ে মৃত্যুও ঘটতে পারে। ফোন পেয়ে তাই প্রচণ্ড ভয় হল। হাসপাতাল থেকে ডাক্তার কথা বলতে চান।'

'আমার স্বামী এবং আমার মানসিক যন্ত্রণার কিছুটা আন্দাজ নিশ্চয় আপনারা করে নিতে পারছেন। আমরা হতাশায় ভেঙে পড়ে ভাবছিলাম, আর কি আমাদের সন্তানকে কোলে নিতে পারব? যখন ডাক্তারের ঘরে ঢুকলাম তাঁর মুখ ভার দেখে ভয়ে আমার বুক কেঁপে গেল। তাঁর কথায় আরও ভয় পেলাম। আমাদের যে রোগ তাতে প্রতি চারজনে একজন বাঁচে। তাই অন্য ডাক্তার ডাকতে হলে ডাকতে পারি।

'বাড়ি ফেরার পথে আমার স্বামী স্টিয়ারিং হুইলে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। গাড়ি থামিয়ে সব চিন্তা করে আমরা একটা গির্জায় ঢুকলাম। একটা আসনে বসে কাতর প্রার্থনা সুরু করলাম কান্নায় ভেঙে পড়ে: 'হে ভগবান আমার নয়, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'

'কথাটা উচ্চারণ করেই ভালো বোধ করলাম। মনে আচমকা শান্তি নেমে এল।

বাড়ি ফিরেও একই কথা বলে চললাম : 'হে ভগবান, আমার নয় আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' এরপর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম। কদিন পরে ডাক্তার জানালেন ববির বিপদ কেটে গেছে। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ আজ আমাদের ববি সুন্দর স্বাস্থ্যবান চার বছরের ছেলে।'

আমি অনেককেই জানি যাঁরা ভাবেন ধর্ম হল মেয়েমানুষ, শিশুদের আর ধর্ম প্রচারকদের জন্য। তারা অহঙ্কার করেন 'পুরুষ' মানুষের মতই তারা নিজেদের সামলাতে পারেন।

তারা হয়ত আশ্চর্য হবেন এটা জেনে যে পৃথিবীর বহু বিখ্যাত 'পুরুষ' মানুষ সব সময় প্রার্থনা করে থাকেন। যেমন, বিখ্যাত পুরুষ জ্যাক ডেম্পসী আমায় বলেছেন প্রতিটি লড়াইয়ের আগে প্রার্থনা করে থাকেন। তিনি ঈশ্বরকে প্রার্থনা না জানিয়ে কখনও আহার্য গ্রহণ করতেন না। আরও তিনি জানিয়েছেন প্রার্থনা করার মধ্য দিয়েই লড়াই করার প্রেরণা তিনি পেতেন।

পুরুষ কনি-ম্যাক বলেছেন প্রার্থনা না করে তিনি শুতে যেতেন না। এই রকম এডি রিকেনবেকারও আমায় বলেছেন প্রার্থনা ছাড়া কোন কাজই তিনি করতেন না। 'পুরুষ মানুষ' এডওয়ার্ড আর স্টেটিনিয়াম, পূর্বতন সেক্রেটারী অফ স্টেট বলেছেন তিনি জ্ঞান ও পথ প্রদর্শনের জন্য দিবারাত্রি প্রার্থনা করতেন।

'পুরুষ মানুষ' আইসেনহাওয়ার যখন ইংল্যাণ্ডে বিটিশ ও আমেরিকান সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নেওয়ার জন্য যান, তখন প্লেনে সঙ্গে নিয়েছিলেন—একখানা বাইবেল।

'পুরুষ মানুষ' জেনারেল মার্ক ক্লার্ক আমাকে বলেছিলেন যুদ্ধের সময় তিনি রোজই হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনা করতেন। এই রকমই করতেন জেনারেল চিয়াং কাইশেক আর জেনারেল মণ্টগোমারী—'এল অ্যালামিনের মণ্টি'। ট্রাফলগারের যুদ্ধে লর্ড নেলসন ঠিক এমনই করতেন। এই ভাবেই করেছিলেন জেনারেল ওয়াশিংটন, রবার্ট ই. লী. স্টোনওয়াল, জ্যাকসন এবং আরও অসংখ্য বিখ্যাত সেনাপতিরা।

এই সব 'পুরুষরা' উইলিয়াম জেমসের কথার সারমর্ম আবিষ্কার করেছিলেন : 'ঈশ্বর আর আমাদের কাজ একই সঙ্গে, আর এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে আমরা তার অনুগত থাকলেই আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়।'

বহু পুরুষই আজ বেশি করে ধর্মের দিকে ঝুঁকছেন। তেমনই ঝুঁকছেন বিজ্ঞানীরাও। যেমন ধরুন বিজ্ঞানী ডঃ অ্যালেক্সী ক্যারেলের কথা। যিনি 'ম্যান দি আননোন' বইটি লেখেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষার বস্তু নোবেল পুরস্কারও লাভ করেন। ডঃ ক্যারেল রিডার্স ডাইজেস্টে এক প্রবন্ধে লেখেন : 'প্রার্থনার মধ্য দিয়েই একজন মানুষ বিরাট শক্তি তৈরি করতে পারে। এ এমন এক শক্তি যা মহাজাগতিক শক্তির মতই বাস্তব। একজন চিকিৎসক হিসেবে আমরা দেখেছি যখন অন্য সব চিকিৎসা ব্যর্থ হয় তখন প্রার্থনার শক্তিই সব কিছু ঠিক করে দেয়···প্রার্থনা রেডিয়ামের মতই আলোকময়, স্বতনিঃসরিত এক শক্তি···। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মানুষ তাদের সীমিত শক্তি

দিয়ে অসীম শক্তিকে ডেকে তাদের শক্তি বাড়ায়। যখন আমরা প্রার্থনা করি তখন অসীম শক্তি বা বিশ্ব নিয়ন্ত্রক তারই সঙ্গে মিলিত হই। আমরা প্রার্থনা করি যেন ওই শক্তির কিছুটা আমরা পাই।···আমরা যখন ভগবানকে একাগ্রতায় প্রার্থনা জানাই তখন আমরা দেহ মনকে আরও ভাল করে তুলি। এটা কখনই হয় না যে কেউ এক মুহূর্ত প্রার্থনা করলেন অথচ কোন ভালো ফল পেলেন না।'

অ্যাডমিরাল বার্ড জানেন 'আমাদের বিশ্ব নিয়ন্ত্রক শক্তির সঙ্গে সংযোগ কথাটার অর্থ কি?' এটা করার ক্ষমতাই তাঁকে তাঁর জীবনের কঠিনতম পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করে। তিনি 'একাকী' নামে লেখা বইতে সেকথা বলেছেন। ১৯৩৪ সালে তিনি পাঁচ মাস দক্ষিণ মেরুর বরফ স্তূপে ডুবে থাকা একটা তাঁবুতে বন ব্যারিয়ারে বাস করেছিলেন। ৭৮ ডিগ্রী দ্রাঘিমায় তিনিই ছিলেন একমাত্র জীবিত প্রাণী। তাঁর ছাউনির উপর বয়ে যেত তুষার ঝড়—ঠাণ্ডা সেখানে শূন্যের ৮২ ডিগ্রীর নিচে। সমস্ত সময় ঘিরে থাকতো অন্ধকার। আচমকা একদিন তিনি সভয়ে আবিষ্কার করলেন তাঁর স্টোভ থেকে কার্বন মনক্সাইড বেরিয়ে তাঁকে তিলে তিলে মারতে চলেছে। তিনি কি করতে পারেন? কাছাকাছি সাহায্য রয়েছে ১২৩ মাইল দূরে—কয়েক মাসেও হয়তো তারা আসতে পারবে না। তিনি স্টোভ সারাতে চেষ্টা করলেন কিন্তু তবু গ্যাস বেরোতে লাগল। তাতে মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। খেতে পারতেন না, ঘুমোতে পারতেন না। তিনি এতই দুর্বল হয়ে পড়লেন যে ব্যাঙ্ক ছেড়ে বেরোতে পারতেন না। তাঁর প্রায়ই ভয় হত সকাল অবধি হয়তো বাঁচবেন না। তিনি নিশ্চিত ছিলেন এই কেবিনেই তাঁর মৃত্যু ঘটবে আর অনন্ত তুষার তাকে ঢেকে রাখবে।

তাঁর জীবন রক্ষা হল কিভাবে? হতাশার মাঝখানে একদিন তিনি তাঁর ডায়েরি নিয়ে তাঁর জীবনদর্শন লিখতে চাইলেন। তিনি লিখলেন, 'মানুষ পৃথিবীতে একা নয়। তিনি ভাবছিলেন মাথার উপরের রাশি রাশি তারার কথা, আর সূর্যের কথা যা মেরুকেও আলোকিত করে। তাই তিনি লেখেন- 'আমি একা নই।'

তিনি যে একা নন এই চিন্তাটাই রিচার্ড বার্ডকে বাঁচিয়ে দেয়। তিনি তাই লিখেছিলেন, 'আমি জানি এর ফলেই আমি রক্ষা পাই। খুব কম লোকেই তাঁদের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করেন। মানুষের মধ্যে এমন বহু শক্তির কুয়ো আছে যা ব্যবহৃত হয় না। অ্যাডমিরাল বার্ড সেই কুয়োই ব্যবহার করেন শক্তির জন্য—ভগবানের দিকে ফিরে প্রার্থনা করে।

ইলিনয়ের শস্যক্ষেত্রে ঠিক এটাই বার্ডের মতই আবিষ্কার করেন গ্লেন এ আর্নল্ড তিনি একজন বীমার দালাল। তিনি আমায় লিখেছিলেন, 'আট বছর আগে আমি আমার বাইরের দরজায় তালা লাগিয়ে বেরোই—ভেবেছিলাম সেটাই আমার শেষ যাওয়া। তারপর গাড়িতে উঠে নদীর দিকে চললাম। আমি এক ব্যর্থ মানুষ। গত এক মাসে সারা পৃথিবীই যেন আমার ঘাড়ে ভেঙে পড়েছিল। আমার বৈদ্যুতিক জিনিসের ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যায়। বাড়িতে আমার মা মৃত্যু শয্যায়। আমার স্ত্রী সন্তান সম্ভবা। ডাক্তারের পাওনা ক্রমেই বেড়েই চলেছে। আমাদের নিজস্ব গাড়ী

আসবাব পত্র ইত্যাদি যা কিছু ছিল তা বাঁধা দিয়েছিলাম। বীমার পলিসি থেকেও ধার নিলাম এরপর সব আশাই শেষ। আমার আর সহ্য হল না—তাই ঠিক করলাম গাড়িতে চড়ে নদীর জলেই সব দুঃখ শেষ করে দেব। 'কিছুক্ষণ গ্রাম্য পথে ঘুরলাম তারপর এক জায়গায় শিশুর মত কান্নায় ভেঙে পড়লাম। তারপরেই ভাবতে বসলাম। সত্যিই আমার অবস্থা কতটা খারাপ? আরও খারাপ তো হতে পারতো। সত্যিই কি আশাহীন? এ অবস্থা ভালো করতে আর কি করতে পারি?

তখনই ঠিক করলাম সমস্ত কিছু ভগবানের কাছে নিবেদন করব আর তাঁরই সাহায্য চাইব। আমি প্রার্থনা করতে লাগলাম। এমনভাবে প্রার্থনা করতে লাগলাম যেন এর উপরেই আমার জীবন নির্ভর করছে। হঠাৎই মনে অদ্ভুত শান্তি নেমে এল, গত এক মাসে যা ছিল না। কতঘণ্টা সেখানে ছিলাম জানিনা—তারপর বাড়ি ফিরে শিশুর মত ঘুমোলাম।

'পরদিন আত্মবিশ্বাস নিয়েই জেগে উঠলাম। আর কিছুতেই আমার ভয় নেই আমি পথ প্রদর্শনের জন্য ভগবানের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি। এরপর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে যে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকানে চাকরির আবেদন করেছি সেখানে ঢুকলাম। আমি, জানতাম চাকরিটা পাবই। পেলামও। যুদ্ধের সময়, ওই ব্যবসা নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাই করলাম। তারপর বীমার কাজ নিলাম—ভগবান তখনও আমার পরিচালক। আমার সব দেনা শোধ করেছি, তিন সন্তানসহ আমার সুখের সংসার এখন। আমার নিজের বাড়ি হয়েছে, নতুন গাড়িও হয়েছে আর আছে পঁচিশ হাজার ডলারের বীমা।

'পেছন দিকে তাকালে এখন ভাবি সর্বস্ব হারিয়েছিলাম সেটা বোধহয় ভাগ্যের জন্যই—কারণ নদীর দিকে গিয়ে ভগবানের উপর নির্ভর করতে শিখেছিলাম। আজ আমার শান্তি আর আত্মবিশ্বাস এতখানি যা কখনও পাব তা ভাবিনি।'

ধর্মে বিশ্বাস কি করে এমন প্রশান্তি আর শক্তি আনতে পারে? এর উত্তর উইলিয়াম জেমসই দিয়েছেন: 'উপরের ঝড়, ঢেউ সমুদ্রের তলায় পৌঁছয় না। যিনি বিশাল এবং চিরন্তন সত্য উপলব্ধি করেন তাঁর কাছে প্রতিটি সময়ের রূপান্তর প্রধান হয়ে উঠতে পারে না। প্রকৃত ধার্মিক অবিচল থাকেন আর শান্তভাবেই নিজের কাজ করে চলেন।'

আমরা যদি উদ্বিগ্ন আর চিন্তান্বিত হই, তাহলে ভগবানের দিকে ফিরি না কেন? ইমানুয়েল কাণ্ট যেমন বলেছেন: 'ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখুন—এ বিশ্বাস আমাদের প্রয়োজন। আসুন না বিশ্বচালক শক্তিতেই নিজেকে যুক্ত করি।'

আপনি যদি স্বাভাবিকভাবে ধার্মিক নাও হন—যদি সন্দেহবাদীও হন, তাহলেও প্রার্থনা আপনাকে প্রভূত শক্তি দেবে—কারণ প্রার্থনা হল পরীক্ষিত সত্য। পরীক্ষিত সত্য মানে কি? যা বলতে চাই তা হল এই: 'প্রার্থনা মানুষের তিনটি মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন মেটাতে পারে, তাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করুন চাই না করুন।' সে তিনটি হল এই:

১। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমাদের যা যন্ত্রণা তা কথায় প্রকাশ করা যায়। কারণ

স্পষ্ট না হলে এর সমাধান করা কঠিন। প্রার্থনা এমনই করতে হবে যাতে আমাদের সমস্যা যেন কাগজে লেখার মতই হয়। ভগবানের কাছেও সাহায্য চাইলে তা কথায় প্রকাশ করা প্রয়োজন।

২। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা ভাবতে পারি সমস্যাটি আমার একার নয়, তা ভাগ করে নিতে পারি। আমাদের মধ্যে অনেকেই এমন দৃঢ়চিত্ত নই যে নিজেদের সমস্যার ভার একাকী বহন করতে পারব। আবার কখনও এমন সমস্যা ঘটে যা নিজেদের একান্ত আপনার জন বা আত্মীয়দেরও বলা যায় না। এক্ষেত্রে উত্তর হল প্রার্থনা। যে কোন মনস্তাত্ত্বিকই বলবেন সমস্যায় কণ্টকিত হয়ে আমরা শক্ত হয়ে পড়লে সে কথা কাউকে বললে ফল ভালোই হয়। যখন তা কাউকে বলতে পারি না তখনই বলা যায় ভগবানকে।

৩। প্রার্থনা কাজ করতেও সাহায্য করে। কাজে নামার এটাই প্রথম ভাগ। আমার সন্দেহ আছে কেউ কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করলে তার পূরণ হয় না। ডঃ অ্যালেক্সি ক্যারেল সে কথাই বলেছেন, 'সবচেয়ে বড় শক্তি প্রার্থনার কালেই সৃষ্টি হয়।' অতএব তাই করুন না কেন? ভগবানই বলুন, আল্লাই বলুন বা যে কোন শক্তিই বলুন —নাম নিয়ে কলহ করে কি লাভ? যতক্ষণ ওই রহস্যময় শক্তি আমাদের সাহায্য করে?

এবার বইটা বন্ধ করে শোবার ঘরে হাঁটু মুড়ে ভগবানের কাছে নিজের মন মেলে ধরুন না কেন? যদি সব বিশ্বাস হারিয়ে থাকেন, তাহলে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে সেটা ফিরে পেতে চান না কেন? সাতশো বছর আগে আসিসির সাধু ফ্রান্সিস লিখেছিলেন: 'হে ঈশ্বর, আমাকে শান্তির কাজে নিয়োজিত করুন। যেখানে ঘৃণা আছে, সেখানে আমায় ভালোবাসার বীজ বপন করতে দিন। যেখানে আঘাত আছে, সেখানে মার্জনা করতে দিন। যেখানে সন্দেহ, সেখানে দিন বিশ্বাস। যেখানে হতাশা, সেখানে আসুক আশা। যেখানে অন্ধকার, সেখানে আসুক আলোক। হে পবিত্র প্রভু, আমি সান্ত্বনা চাই না—সান্ত্বনা দিতে চাই—ভালোবাসা চাই না, ভালোবাসতে চাই—ক্ষমা করলেই যেহেতু ক্ষমা পাওয়া যায়, তাই মৃত্যুর মধ্যেই ফিরে পাই অনন্ত জীবন।'

॥ কুড়ি ॥

মনে রাখবেন মরা কুকুরকে কেউ লাথি মারে না

১৯২৯ সালে এমন একটা ব্যাপার ঘটে যার ফলে শিক্ষাবিদ মহলে বেশ একটা জাতীয় আলোড়ন ঘটে যায়। সারা আমেরিকার শিক্ষিত মানুষ ব্যাপারটা দেখার জন্যেই ছুটে যান শিকাগোয়। কয়েক বছর আগে রবার্ট হাচিনসন নামে এক তরুণ ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়েছিলেন। এই সময় তিনি ওয়েটার, কাঠুরে, শিক্ষক, কাপড়ের ফেরিওয়ালা হিসেবেই কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন। এরপর এখন মাত্র আট বছর পরে, তাঁকেই আমেরিকার চতুর্থ অর্থশালী বিশ্ববিদ্যালয় শিকাগোর প্রেসিডেণ্ট পদে বরণ করা হয়েছিলো। তাঁর বয়স? মাত্র ত্রিশ। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। অন্যান্য শিক্ষাবিদরা মাথা ঝাঁকাতে চাইলেন। পাহাড় গড়িয়ে পড়া পাথরের স্রোতের মতই সমালোচনার ঝড় বয়ে গেলো। সকলে নানা ভাবে তাঁর সমালোচনা করে বলতে লাগলেন 'সে এ নয়' 'তা নয়' এইসব—তাঁর বয়স বড় কম, অভিজ্ঞতা নেই—শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর ধারণা বাঁকা পথে চলে। এমন কি খবরের কাগজগুলো পর্যন্ত সকলের সুরে সুর মেলালো।

তাঁকে যেদিন প্রেসিডেণ্ট পদে বরণ করা হয় সেদিনই হাচিনসনের বাবা রবার্ট মেসার্ড হাচিনসনকে তাঁর এক বন্ধু বললেন, 'আজ সকালে খবরের কাগজের সম্পাদকীয়-তে তোমার ছেলের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার দেখে আমার অত্যন্ত খারাপ লেগেছে।'

'হ্যাঁ', হাচিনসনের বাবা জবাব দিলেন খুবই কড়া সমালোচনা, তবে মনে রেখো, কেউ মরা কুকুরকে লাথি মারে না।'

কথাটা সত্যি। কুকুর যতো নামী হয়, ততই আবার লোকে তাকে লাথি মেরে মানসিক আনন্দ পায়। প্রিন্স অব ওয়েলস, যিনি পরে অষ্টম এডোয়ার্ড হন (এখন ডিউক অব উইণ্ডসর) বেশ ভালো রকম লাথি হজম করার কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তখন ডেভিনসায়ারে ডার্টমুখ কলেজে শিক্ষা নিচ্ছিলেন। এই কলেজ আনাপলিনের নৌ অ্যাকাডেমীরই সমতুল্য। প্রিন্সের বয়স তখন প্রায় চৌদ্দ। একদিন জনৈক নৌ-অফিসার তাঁকে কাঁদতে দেখে তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। প্রথমে প্রিন্স কথাটা বলতে চাননি, পরে সত্যি কথাটা বলে ফেললেন। তাঁকে নৌ-শিক্ষার্থীরা লাথি মেরেছিলো। কলেজের কমোডোর সমস্ত ছেলেদের ডাকলেন। তারপর তাদের তিনি বললেন যে প্রিন্স কোন অভিযোগ করেন নি, তাসত্ত্বেও তিনি জানতে চান তাঁকে এরকম কড়া ব্যবহারের জন্য বেছে নেওয়া হলো কেন?

অনেক চ্যাঁচামেচি, হম্বিতম্বি আর মেঝেয় পা ঠোকার পর শিক্ষার্থীরা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলো যে তারা বড় হয়ে যখন রাজার নৌবাহিনীতে কমান্ডার আর ক্যাপ্টেন হবে তখন তাদের একথা বলতে পারলে বড় আনন্দ হবে যে তারা একদিন রাজাকে লাথি মেরেছিলো।

তাই মনে রাখবেন আপনাকে কেউ যখন লাথি মারে বা আপনার সমালোচনা করা হয় তখন সেই লোকটির মনে দারুণ শ্রেষ্ঠত্ব বোধ জাগে। এথেকে প্রায়ই বোঝা যায় আপনি এমন কিছু ভালো কাজ করতে পেরেছেন যা নজরে পড়ার মতই। বহু লোকই তাদের চেয়ে যাঁরা বেশি শিক্ষিত বা জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাঁদের নিন্দা করে বেশ বন্য আনন্দ অনুভব করেন। উদাহরণ হিসেবে বলছি, আমি যখন এই পরিচ্ছেদটা লিখছিলাম তখন একজন মহিলার কাছ থেকে স্যালভেশান আর্মির জেনারেল উইলিয়াম বুথের নিন্দা করা একখানা চিঠি পাই। আমি জেনারেল বুথের সম্পর্কে প্রশংসা করে একটা বেতার ভাষণ দিয়েছিলাম। এই কারণেই মহিলা আমায় চিঠিটা লেখেন, তিনি ঐ চিঠিতে লিখেছিলেন জেনারেল বুথ গরীব মানুষদের সাহায্যের নাম করে আশি লক্ষ ডলার তুলে সেটা তছরুপ করেছেন। এ অভিযোগ অবশ্য একেবারেই অযৌক্তিক, অসম্ভব। কিন্তু মহিলাটি তো সত্য অন্বেষণ করতে চাননি। এর আসল কারণ তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ একজন মানুষকে নিন্দা করার মধ্য দিয়ে তিনি ওই বন্য আনন্দ উপভোগ করতে চাইছিলেন। আমি চিঠিটা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালাম ভাগ্যিস ওই মহিলার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। তাঁর চিঠিতে জেনারেল বুথ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতে পারিনি বটে তবে মহিলা সম্পর্কে অনেক কথাই জেনেছি। বহু বছর আগে সোপেন হাওয়ার বলেছিলেন: 'নোংরা মানুষেরা বিখ্যাত মানুষদের ভুল আর বোকামিতে আনন্দ বোধ করে।'

কেউ অবশ্য ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টকে নোংরা মানুষ বলে ভাববেন না, তাসত্বেও ইয়েলের একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট টিমোথি ডোয়াইট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন এমন একজনকে আক্রমণ করে অপার আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। ইয়েলের সেই প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন সবাইকে সতর্ক করে যে, ওই লোকটা দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে 'আমাদের বৌ মেয়েদের আইনের মধ্য দিয়ে বারবনিতায় পরিণত হতে হবে, তারা অপমানিত হবে, খারাপ হয়ে যাবে, সাধুতা আর কমনীয়তা চলে যাবে—এবং ঈশ্বর আর মানুষ অসন্তুষ্ট হবেন।'

এটা অনেকটা হিটলারকে নিন্দে করার মতই শোনাচ্ছে, তাই না? কিন্তু তা নয়। এটা ছিলো টমাস জেফারসনকে লক্ষ্য করে বলা। কোন্ টমাস জেফারসন? নিশ্চয়ই সেই অমর টমাস জেফারসন সম্পর্কে নয় যিনি স্বাধীনতার সনদ রচনা করেন এবং যিনি ছিলেন গণতন্ত্রের পূজারী? হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, তিনিই সেই মানুষ।

আপনার ধারণা আছে কোন আমেরিকানকে 'ভণ্ড', 'প্রতারক' আর 'প্রায় খুনের মত' বলে নিন্দে করা হয়েছিলো ? খবরের কাগজের এক কার্টুনে তাকে গিলোটিনের তলায় দেখানো হয়—বিরাট এক ছুরির আঘাতে পরক্ষণেই তার গলা দ্বিখণ্ডিত করা হবে। জনসাধারণ তাকে দেখে হিস হিস করেছে, বিদ্রূপ করেছে তিনি যখন রাস্তায় ঘোড়ায় চড়ে যান। তিনি কে ছিলেন ? জর্জ ওয়াশিংটন।

তবে এব্যাপার ঘটেছিলো বহু বছর আগে। কে জানে মানুষের চরিত্র হয়তো তারপর অনেকটাই বদলে গেছে। আসুন দেখাই যাক। অ্যাডমিরাল পিয়েরীর ব্যাপারটাই ধরা যাক সেই দেশ আবিষ্কারক যিনি ১৯০৯ সালের ৬ই এপ্রিল কুকুরে টানা শ্লেজ গাড়িতে চড়ে উত্তর মেরু পেঁাছে দুনিয়ায় তাক লাগিয়ে দেন। যে গৌরব অর্জন করার জন্য পৃথিবীর বহু সাহসী মানুষ অনাহারে থেকে, নানা কষ্ট সহ্য করে ঠাণ্ডায় প্রায় মারা গিয়ে বহু শতাব্দী ধরেই চেষ্টা করেছে। পিয়েরী নিজেও প্রায় ঠাণ্ডায় মারা যেতেই বসেছিলেন। তাঁর পায়ের আটটা আঙুল ঠাণ্ডায় এমন ভাবে জমে গিয়েছিলো যে সেগুলো কেটে ফেলতে হয়। দারুণ দুর্বিপাকে পড়ে তাঁর এমন অবস্থা হয় যে তিনি ভেবেছিলেন হয়তো পাগল হয়ে যাবেন। তাঁর উপরের নৌ-অফিসাররা ওয়াশিংটনে বসে ঈর্ষায় জ্বলছিলেন কারণ লোকেরা পিয়েরীকে এতো প্রশংসা আর প্রচার করছিলো। তারপর সেই লোকেরা তাঁর নামে দোষারোপ করতে আরম্ভ করলো তিনি নাকি বৈজ্ঞানিক অভিযানের জন্য টাকা আদায় করে সেই টাকায় 'মেরু প্রদেশে স্ফূর্তি করে কাটাচ্ছেন'। এমন ধরণের কথা হয়তো তারা বিশ্বাসও করতে সুরু করেছিলো, কারণ আপনি যা বিশ্বাস করতে চান সেটা বিশ্বাস না করা প্রায় অসম্ভব কাজ। পিয়েরীকে হীন প্রতিপন্ন করতে আর তাঁকে দাবিয়ে রাখতে চক্রান্তটা এমনই ভয়ানক হয়ে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেণ্ট ম্যাকিনলের এক সরাসরি আদেশের বলেই পিয়েরীকে মেরু অঞ্চলে তার কাজ চালিয়ে যেতে সুযোগ দেয়।

পিয়েরীর পিছনে এমন করে কেউ লাগতো, তিনি যদি নৌ-বিভাগের একজন কর্মচারি হয়ে নিউইয়র্কের অফিসে ডেস্কে বসে কাজ করতেন ? না। যেহেতু তিনি এমন কোন নামী মানুষ হতেন না যে, তাকে দেখে লোক ঈর্ষাপরায়ণ হবে।

অ্যাডমিরাল পিয়েরীর চেয়ে জেনারেল গ্র্যাণ্টের অভিজ্ঞতা আরও খারাপ। ১৮৬২ সালে জেনারেল গ্র্যাণ্ট উত্তরাঞ্চলের পক্ষে সবচেয়ে কার্যকরী যুদ্ধে জয়লাভ করেন—যে জয় একটা অপরাহ্নেই সংঘটিত হয়—যে জয় রাতারাতি জেনারেল গ্র্যাণ্টকে জাতীয় বীরের আসনে বসিয়ে দেয়—যে জয়ের সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় বহুদূরের ইউরোপেও। এমন জয় যে এর জন্যে গীর্জার ঘণ্টা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুরণন তুলে, আর মেইন নদীর তীর থেকে মিসিসিপির তীর বরাবর আগুন জ্বালিয়ে প্রায় উৎসব পালন করা হতে থাকে। তা সত্ত্বেও মাত্র এই বিরাট জয়লাভ করার ছ' সপ্তাহ পরে —গ্র্যাণ্ট, যিনি উত্তরাঞ্চলের বীর—তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁর সেনাবাহিনীকে তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। তিনি অপমান আর হতাশায় আকুল কান্নায়

ভেঙে পড়েন।

জেনারেল ইউ এস. গ্র্যাণ্টকে তাঁর বিজয় গর্বের মুহূর্তে গ্রেপ্তার করা হলো কেন? বেশির ভাগ কারণ হলো তিনি তাঁর অহঙ্কারী উপর ওয়ালাদের ঈর্ষার শিকার হন বলেই।

আমরা যদি অন্যায় সমালোচনার ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার ফাঁদে পা রাখতে যাই তাহলে নিচের কার্যকর নিয়মটা মেনে চলা উচিত:

মনে রাখবেন অন্যায় সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রেই আড়াল করা প্রশংসাই। মনে রাখবেন মরা কুকুরকে কেউ লাথি মারে না।'

॥ একুশ ॥

এটা করুন—সমালোচনা আপনাকে স্পর্শ করবে না

আমি একবার মেজর জেনারেল স্মেডলি বাটলারের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। নানা বিশেষণেই তিনি ভূষিত হন। তাঁর কথা শুনেছেন তো? তিনি ছিলেন আমেরিকার নৌবাহিনীর ইতিহাসে সবচেয়ে খ্যাতনামা আর জাঁকজমকপূর্ণ সেনাপতি।

তিনি আমায় বলেছিলেন যে তাঁর যখন বয়স কম ছিলো খুব জনপ্রিয় হবার দারুণ চেষ্টা করতেন আর প্রত্যেকের উপর প্রভাব বিস্তারের আগ্রহ পোষণ করতেন। তখনকার দিনে সামান্য সমালোচনাও আঘাত লাগতো আর হুল ফোটাতে চাইতো। তবে তিনি স্বীকার করেন যে নৌ-বাহিনীতে ত্রিশ বছর কাটানোর ফলে তাঁর চামড়া বেশ পুরু হয়ে উঠেছিলো। তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে অপমান করে, নিন্দা করা হয়েছিলো আর হলদে কুকুর, সাপ এবং অন্যান্য জানোয়ারের সঙ্গে তুলনাও করা হয়। বিশেষজ্ঞরা আমায় নিন্দা করেন। ইংরাজী ভাষায় যতোরকম ছাপার অযোগ্য খারাপ কথা আছে সবই আমায় বলা হয়। এতে আমি ভাবনায় পড়ি ভাবছেন? ফুঃ! এখন কেউ আমাকে গাল দিতে চাইলেও আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখিনা কে কথাটা বলেছে।'

তীক্ষ্ম-দৃষ্টিসম্পন্ন বাটলার হয়তো সমালোচনা গ্রাহ্য করতেন না, তবে একটা কথা নিশ্চিত, আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষই ছোটোখাটো মন্তব্য আর ব্যঙ্গ বিদ্রূপে বড় বেশি রকম বিচলিত বোধ করি। আমার বেশ ক'বছর আগেকার কথাটা মনে পড়ছে যখন নিউ ইয়র্ক সানের একজন রিপোর্টার আমার বয়স্ক শিক্ষার ক্লাসে এসে সব দেখে কাগজে ব্যঙ্গ করে জঘন্য সব কথা লেখেন। আমি কি ক্ষেপে গিয়েছিলাম? আমি ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত অপমান বলেই ভেবেছিলাম। আমি টেলিফোন করে সানের কার্যকরী কমিটির চেয়ারম্যান গিল হাজেসকে প্রায় দাবী জানাই তিনি যেন সব ঘটনার বর্ণনা দিয়ে একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন—আর মস্করা না করেন। আমি মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি এই অপরাধের উপযুক্ত শাস্তিদান করবোই।

আজ অবশ্য আমি আমার সেদিনের কাজের জন্য লজ্জাবোধ করি। এখন বুঝতে পারি ওই কাগজ যারা কেনে তারা ওই প্রবন্ধটা হয়তো চোখেই দেখেনি। যারা কাগজ পড়েছে তাদেরও অর্ধেক বোধহয় ব্যাপারটাকে নির্দোষ আমোদ বলেই ভেবেছিলেন। আবার যে অর্ধেক সেটা পড়ে হেসে মজা পান তারাও আবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তা ভুলেও যান।

এখন বুঝতে পারি মানুষ আমার বা আপনার সম্বন্ধে ভাবে না বা সেটা গ্রাহ্য

করে না। তারা কেবল নিজেদের কথাটাই ভেবে চলে—প্রাতরাশের আগে, প্রাতরাশের পরে, বা মাঝরাতের দশ মিনিট আগে বা ঠিক পরেও। আমার বা আপনার মৃত্যুর খবরের চেয়েও তাদের প্রায় হাজার গুণ বেশি ভাবনা নিজেদের সামান্য মাথা ব্যাথা নিয়ে।

যদি আপনার বা আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা ছড়ানো হয়, ঠাট্টা করা হয় ঠকানো হয়, অথবা পিঠে ছুরি মারা, হয়তো বা আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের প্রতি ছ'জনের মধ্যে একজন যদি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে—তাহলেও যেন আমরা আত্মধিক্কারে অস্থির হয়ে না পড়ি। তার বদলে আসুন আমরা মনে মনে যীশু খৃষ্টের কথাই ভাবি—কারণ তাঁর ভাগ্যে ঠিক এমনটাই ঘটেছিলো। তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের মধ্যে একজন সামান্য টাকার বিনিময়ে—আজকের টাকার হিসেবে মাত্র উনিশ ডলারের ঘুষ নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাঁর বারোজন বন্ধুর মধ্যে আর একজন যীশু বিপদে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ত্যাগ করে তিনবার বলে দেয় সে যীশুকে চেনে না—কথাটা সে শপথ নিয়ে বলে। ঠিক ছ'জনের মধ্যে একজন। ঠিক এই রকম ঘটে যায় যীশুর জীবনেও। আমি বা আপনি এরচেয়ে আর ভালো আশা করি কেমন করে?

বেশ কয়েক বছর আগেই আমি আবিষ্কার করি যে মানুষের অন্যায়ভাবে আমাকে সমালোচনা করা বন্ধ করতে পারিনা বটে—তবে একটা ব্যাপার অবশ্যই বন্ধ করতে পারি, তাহলো অন্যায় সমালোচনা শুনে দুশ্চিন্তা করা। আমি নিশ্চয়ই ঠিক করতে পারি অন্যায় এই নিন্দাবাদে আমি চিন্তায় পড়বো কিনা।

ব্যাপারটা পরিষ্কার করেই বলি। আমি এর মধ্য দিয়ে সবরকম সমালোচনা অগ্রাহ্য করার কথা বলছিনা। একেবারেই না। আমি শুধু অন্যায় সমালোচনা অগ্রাহ্য করতে বলছি। আমি একবার এলিনর রুজভেল্টের কাছে জানতে চেয়েছিলাম অন্যায় সমালোচনার তিনি কিভাবে মোকাবিলা করেন। আর ঈশ্বর জানেন এমন জিনিস তাঁকে কতো সহ্য করতে হতো। হোয়াইট হাউসে যত মহিলা বাস করেছেন তার মধ্যে তাঁরই বোধ হয় সবার চেয়ে বেশি বন্ধু আর সাংঘাতিক রকম শত্রু ছিলো।

তিনি আমায় বলেন অল্পবয়সে তিনি সাংঘাতিক রকমের লাজুক মেয়ে ছিলেন। তাঁর খালি ভয় হতো লোকে কি বলবে। সমালোচনা সম্বন্ধে তাঁর এমনই ভয় ছিলো যে একদিন তিনি তাঁর কাকিমা, থিয়োডোর রুজভেল্টের বোনের কাছে এব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। তিনি যা জানতে চেয়েছিলেন সেটা এই রকম: 'কাকিমা, আমি যা কাজ করতে যাই খালি ভয় হয় লোকে কি বলবে।'

তাঁর কাকিমা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন: 'লোকে কি বলবে তা নিয়ে মোটেও ভাববে না, যতক্ষণ তুমি জানো যে তুমি ঠিক পথেই আছো।' এলিনর রুজভেল্ট আমায় বলেছেন যে ওই পরামর্শই তাঁর পরবর্তী হোয়াইট হাউসের জীবনে একেবারে একটা শক্ত ভিত হয়ে দাঁড়ায়। তিনি আমাকে আরও বলেছিলেন সমালোচনায় কান না দেওয়ার একটা পথ হলো চীনা মাটির মূর্তি যেমন আলমারীর তাকে চুপচাপ

দাঁড়িয়ে থাকে সেই ভাবে থাকা। তাঁর পরামর্শ ছিলো এইরকম: 'নিজের মনে যা ঠিক বলে মনে হয় তাই করবে—কারণ তোমার সমালোচনা করা হবেই। কাজ করলেও লোকে তোমার সমালোচনা করবে—আবার না করলেও তাই।'

প্রয়াত ম্যাথুসি ব্রাস ছিলেন ওয়াল স্ট্রীটের আমেরিকান ইণ্টার ন্যাশনাল কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট। আমি তাঁকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম তিনি কোনদিন সমালোচনায় চিন্তিত হতেন কিনা। তিনি জবাব দেন: 'হ্যাঁ, ছোটবেলায় আমি এ ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর ছিলাম। তখন ভাবতাম আমার প্রতিষ্ঠানের সব কর্মচারিই মনে করুক আমি একদম ঠিক মানুষ। তারা না ভাবলেই আমার দুশ্চিন্তা হতো। কোন মানুষ আমার বিরুদ্ধে গেলেই আমি তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতাম, কিন্তু তাতে আবার আর একজন ক্ষেপে যেতো। এতে বুঝলাম যতই একজনকে সন্তুষ্ট করতে চাইবো ততই অন্যের অসন্তোষ বাড়বে। আমি শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করলাম যে আমি যতই মনের অসন্তোষ দূর করে কাউকে সুখী করার চেষ্টা করলাম, ততই আমি নিশ্চিন্ত হলাম আমি শত্রু সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছি। তাই নিজেকেই শেষ অবধি বললাম: 'তুমি যদি সাধারণের মাথার উপর মাথা তুলে থাকার চেষ্টা করো ততই সমালোচনার সামনে পড়তে হবে। অতএব সমালোচনায় অভ্যস্ত হতে থাকো।' এটা আমাকে দারুণ সাহায্য করেছে। এরপর থেকে যতোটা ভালো হওয়া যায়, তাই হতে চেষ্টা করলাম এবং তারপরেই আমি আমার পুরনো ছাতাটা মাথায় মেলে ধরবো তাহলে সমালোচনার বৃষ্টিধারায় আর শরীর ভিজবে না।'

জেমস্ টেলর এ ব্যাপারে আর একটু এগিয়ে ছিলেন। তিনি সমালোচনার ধারায় অবগাহন করতেন আর প্রকাশ্যে হেসে সব উড়িয়ে দিতেন। তিনি প্রত্যেক রবিবারের বিকেলে বেতারে নিউ ইয়র্কের সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার সঙ্গীত-বিরামের উপর নানা রকম কথিকা প্রচার করতেন। এক মহিলা তাঁকে চিঠি লিখে 'চোর, বিশ্বাসঘাতক, সাপ আর নানা সম্বোধনে ভূষিত করেন। মিঃ টেলর তাঁর 'অব মেন অ্যাণ্ড মিউজিক' গ্রন্থে বলেছেন: 'আমার সন্দেহ ভদ্রমহিলা আমার বক্তৃতা পছন্দ করতেন না।' মিঃ টেলর পরের রবিবার বেতার ভাষণের সময় চিঠিটার উল্লেখ করলেন আর আবার সেই মহিলার কাছ থেকে চিঠি পেলেন 'চোর', 'সাপ', বিশ্বাসঘাতক' বলে। যিনি সমালোচনাকে এমন ভাবে নিতে পারেন তাঁকে প্রশংসা না করে সত্যিই পারা যায়না। আমাদের চোখে পড়ে তাঁর প্রশান্তি, অবিচলিত মনোভাব আর তাঁর হাস্যরসবোধ।

চার্লস্ শোয়াব যখন প্রিন্সটনে ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিতেন তখন তিনি স্বীকার করেছিলেন যে জীবনে তিনি যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করেন সেটা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর ইস্পাত কারখানার একজন বৃদ্ধ জার্মানের কাছে। এই বৃদ্ধ জার্মানের সাথে তাঁর সহকর্মীদের যুদ্ধের আমলের কিছু কথাবার্তা নিয়ে তর্কাতর্কি বেধে যায়। অন্য কর্মীরা তাঁকে রাগে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এরপর যখন সে আমার কাছে আসে, শোয়াব লিখেছিলেন, 'তার সারা গায়ে কাদা আর জল মাখামাখি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কি এমন বলেছে যাতে তাঁকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে ওরা? সে জবাব

দিয়েছিলো : 'আমি কেবল হেসেছিলাম।'

মিঃ শোয়াব স্বীকার করেছেন যে তিনিও ওই বৃদ্ধ জার্মানের নীতিই গ্রহণ করেছেন—শুধু হেসে ফেলা।

এই নীতি বিশেষ করেই ভালো, যখন আপনি অন্যায় সমালোচনার শিকার হবেন। যে আপনার কথায় জবাব দেয় তার কথার উত্তর আপনি দিতে পারেন, কিন্তু যে কেবল হাসে, তাকে কি জবাব দেবেন?

লিঙ্কন বোধ হয় ভেঙে পড়তেন, গৃহযুদ্ধের সময়কার প্রচণ্ড চাপের সময় তাঁকে যে রকম বিষাক্ত সমালোচনা করা হতো তার যদি উত্তর দিতে হতো। এটা যে চরম বোকামি তা তিনি শিখেছিলেন। তাঁর সমালোচকদের তিনি কি ভাবে মোকাবিলা করতেন তার বর্ণনা, সাহিত্যের দুনিয়ায় একরকম রত্নের মতই হয়ে আছে। জেনারেল ম্যাক আর্থার যুদ্ধের সময় এটা তাঁর সদর দপ্তরের ডেস্কে সাজিয়ে রাখতেন। উইনস্টন চার্চিল এটা তার চার্টওয়েলের পাঠকক্ষে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতেন। এটা ছিলো এই রকম: 'আমাকে আক্রমণ করে যা লেখা হয় সেগুলো যদি আমি পড়ার চেষ্টা করি, উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা তাহলে এজায়গাটা বন্ধ করেই দেওয়া উচিত আমার অন্য কাজের জন্য। আমি সবচেয়ে ভালো কাজটি করার কৌশল আয়ত্ত করেছি আর তাই করে চলেছি—সবচেয়ে ভালো কাজ, আর আমি এই ভাবেই শেষ পর্যন্ত কাজ করে যাওয়ার আশা রাখি। যদি শেষ পর্যন্ত আমি সঠিক বলেই প্রমাণিত হতে পারি তাহলে আমার বিরুদ্ধে যা বলা হবে তাতে কিছুই যায় আসে না। শেষে যদি আমি ভুল বলে প্রমাণিত হই তাহলে দশজন দেবদূতের সাক্ষ্যতেও আমি ঠিক প্রমাণিত হলে কিছু তারতম্য হবেনা।'

আপনি বা আমি যখন অন্যায় সমালোচনার মুখোমুখি হব তখন এই নীতিটা মনে রাখা উচিত:

'সবচেয়ে ভালো যা করা সম্ভব করুন তারপর আপনার পুরানো ছাতার নিচে আশ্রয় নিয়ে সমালোচনা বৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষা করুন।'

॥ বাইশ ॥

যে যে বোকামি করেছি

আমার ফাইলপত্র রাখার আলমারীতে আমার 'দোষ আর বোকামি' করার সব ফিরিস্তি রাখা আছে। যে সব বোকামি করেছি তাই ওতে লিখে রেখেছি। এগুলি কখনও আমার সেক্রেটারী টাইপ করেছে, আর যেগুলো বলা বড়ই লজ্জার সেগুলো আমি নিজের হাতে লিখেছি। পনেরো বছর আগে ডেল কার্নেগীর বোকামিগুলো আজও মনে পড়ে। আমার সমস্ত বোকামির ফিরিস্তি দিলে আমার আলমারীতে তার স্থান হতোনা। ত্রিশ শতাব্দী আগে রাজা সল যা বলে গেছেন আমি সেটাই বলতে পারি: 'আমি বোকামি আর প্রচুর ভুল করেছি।'

আমার ভুলের ফিরিস্তিগুলো মাঝে মাঝেই পড়ি আমি. যাতে আমার সমস্যার সমাধান করতে পারি।

আমার সব ঝামেলার জন্য আগে আমি অন্য সকলকে দোষী করতাম, কিন্তু যত বয়স হয়েছে, জ্ঞান লাভ হয়েছে, আমি অনুধাবন করেছি সব দোষ আমার নিজেরই। বহু লোকই বয়স বাড়লে সেটা বুঝেছেন। যেমন নেপোলিয়ান সেণ্ট হেলেনায় বলেছিলেন, 'আমার পতনের জন্য অন্য কেউ নয় আমি নিজেই দায়ী। আমিই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু—আমার এই দুর্ভাগ্যের কারণ আমিই!'

আমি একজনের কথা শোনাব যিনি আত্মসমালোচনার শিল্পীই বলা যায়। তাঁর নাম এইচ. পি. হাওয়েল। ১৯৪৪ সালে তাঁর মৃত্যু সংবাদ বিদ্যুতের মতই ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি ছিলেন অর্থনীতির এক দিকপাল। অল্পস্বল্প শিক্ষাতেই তিনি বড় হন—সামান্য কেরানীর চাকরি করার পর একদিন হয়ে ওঠেন ইস্পাত শিল্পের বড় ম্যানেজার। তিনি ক্রমশঃ উন্নতি করেছিলেন। তাঁর সাফল্যের কারণ সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, বহু বছর ধরেই আমি একখানা ডায়েরী রেখেছি যাতে থাকত কার কার সাথে দেখা হয়েছে। আমার বাড়ির লোকেরা শনিবার আমার জন্য কোন কাজ রাখত না, কারণ তারা জানত আমি শনিবার রাত্রে ভাবতে বসি সারা সপ্তাহ কি করেছি। ডিনারের পর আমি খাতাখানা খুলে বসি তারপর সোমবার সকাল থেকে কার কার সঙ্গে দেখা হয়েছে ভাবতে থাকি। নিজেকে জিজ্ঞাসা করি: 'সারা সপ্তাহে কি কি ভুল করেছি? কোনটা ঠিক করেছি? আর কি করলে তা আরও ভালো হত? এ থেকে কি অভিজ্ঞতা লাভ করলাম? মাঝে মাঝে দেখেছি ওই সাপ্তাহিক সমালোচনায় বেশ অসুখী হতে হয়। মাঝে মাঝে নিজের বোকামিতে নিজেই অবাক হই। অবশ্য ক্রমে বোকামির মাত্রা কমে এসেছিল। এই আত্মবিশ্লেষণ আমায় সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে।

খুব সম্ভব হাওয়েল এই কৌশল বেন ফ্রাঙ্কলিনের কাছ থেকে ধার করেছিলেন। ফ্রাঙ্কলিন শুধু শনিবারের সন্ধ্যের জন্য অপেক্ষা করতেন না। তিনি প্রতি রাত্রেই নিজেকে বেশ চাপকানি দিতেন। তিনি আবিষ্কার করেন তাঁর তিনটে মারাত্মক দোষ আছে। এক, সময় নষ্ট করা, দুই, সামান্য ব্যাপারে ঝামেলা করা, আর তিন, লোকের সঙ্গে তর্ক করা। বুদ্ধিমান বেন ফ্রাঙ্কলিন বুঝেছিলেন ওই ব্যাপারগুলো দূর করতে না পারলে বেশি এগোতে পারবেন না। তাই সপ্তাহের প্রতিদিন তিনি এই দোষ সংশোধনের চেষ্টা করতেন আর লিখে রাখতেন লড়াইয়ে কে জিতল। পরের সপ্তাহে অন্য দোষ নিয়ে একই রকম করতেন তিনি। ফ্রাঙ্কলিন এইভাবে দুবছর নিজের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যান।

আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই এদেশে তিনি হয়ে ওঠেন সবচেয়ে প্রিয় আর ক্ষমতাবান মানুষ।

এলবার্ট হাবার্ড বলেছিলেন: ‘‘প্রত্যেক মানুষই দৈনিক অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্য হয়ে যায় নেহাত বোকা।’

সাধারণ মানুষ সামান্য সমালোচনাতেই ক্ষেপে ওঠে, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যাঁরা তার সমালোচনা করে তাদের কাছ থেকে কারণ জানতে চান। ওয়াল্ট হুইটম্যান এ সম্পর্কে বলেছেন: ‘আপনি কি শুধু আপনার একান্ত অনুগতদের কথাই শুনেছেন? যারা আপনার অনুগত নয়, যাদের সরিয়ে দিয়েছেন, আপনার বিরুদ্ধবাদী করে তুলেছেন; তাদের কথাটায় কখনও কান দিয়েছেন?

শত্রুরা আমাদের সমালোচনা করার আগে আসুন আমরা নিজেদের সমালোচনা করি। আসুন আমরা নিজেদের সবচেয়ে বড় সমালোচক হয়ে উঠি। আমাদের শত্রুরা কিছু বলার আগে আসুন নিজেদের ত্রুটি সংশোধন করি। ঠিক তাই করেন চার্লস ডারউইন। পনেরো বছর তিনি আত্মসমালোচনা করেন। ব্যাপারটা এই রকম: ডারউইন যখন তাঁর অমর সাহিত্য কর্ম ‘অরিজিন অব স্পেসিস’-এর পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন, তিনি বুঝেছিলেন বইটি সারা দুনিয়া তোলপাড় করে সেকালের ধর্ম আর বুদ্ধিবৃত্তির জগতকে নাড়া দেবে। তাই তিনি নিজেই নিজের সমালোচক হয়ে আরও পনেরো বছর ধরে তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম, উপসংহার ইত্যাদি যাচাই করলেন।

কেউ যদি আপনাকে নিরেট বোকা বলে বসে তাহলে কি করবেন?—রেগে যাবেন? পাত্তা দেবেন না? লিঙ্কন যা করেন তা এই: লিঙ্কনের সামরিক সেক্রেটারি এডোয়ার্ড স্ট্যানটন লিঙ্কনকে একবার ‘নিরেট বোকা’ বলেন। স্ট্যানটন ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যেহেতু লিঙ্কন স্ট্যানটনের কাজে মাথা গলাচ্ছিলেন। একজন স্বার্থপর রাজনীতিককে সন্তুষ্ট করার জন্য লিঙ্কন একবার কিন্তু সেনা-রেজিমেণ্ট অন্যত্র সরানোর আদেশ দেন। স্ট্যানটন শুধু যে লিঙ্কনের আদেশই অমান্য করলেন তা নয় বললেন লিঙ্কন একটা ‘নিরেট বোকা’। এর ফলে কি হল? লিঙ্কনকে তখন স্ট্যানটন কি বলেছেন জানানো হল। লিঙ্কন শান্তভাবে বললেন: ‘যদি স্ট্যানটন বলে থাকে আমি নিরেট বোকা, আমি নিশ্চয়ই তাই, কারণ ও বড় একটা ভুল করে না।

আমি নিজেই একবার বুঝে নিতে চাই।

লিঙ্কন স্ট্যানটনের সঙ্গে দেখা করলেন। স্ট্যানটন তাঁকে বুঝিয়ে দেন আদেশটা যথার্থ হয়নি। লিঙ্কন তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। লিঙ্কন যখন দেখতেন সমালোচনাটা সাহায্যকারী তখন তিনি তা আন্তরিক ভাবে বরণ করে নিতেন।

আমার বা আপনারও এরকম সমালোচনা গ্রহন করা দরকার, চারবারের মধ্যে তিনবার আমরা সঠিক হলেও যেমন একবার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা। ঠিক এই রকমই ভাবতেন থিয়োডোর রুজভেল্ট যখন হোয়াইট হাউসে ছিলেন। বর্তমানের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ আইনষ্টাইনও স্বীকার করেছেন শতকরা নিরানব্বই ভাগই তিনি ভুল করতেন।

লা রোচেনফুকো বলেছিলেন, 'আমাদের শত্রুদের মতামতই আমাদের সম্পর্কে নিজেদের মতের চেয়ে নির্ভুল হয়।'

আমি জানি কথাটা হয়তো সত্যি, তবুও কেউ আমার সমালোচনা সুরু করলেই নিজেকে লক্ষ্য না করেই আমি আপনা থেকে নিজেকে রক্ষায় ব্যস্ত হই—এমন কি তারা কি বলবে কণামাত্রও না জেনে। যতবার এরকম করি ততবারই নিজের উপর বিরক্ত হই। আমরা সবাই সমালোচনা অপছন্দ করি আর প্রশংসা শুনলে বিগলিত হই—একবারও ভাবিনা সমালোচনা বা প্রশংসা কোনটা আমাদের প্রাপ্য। আমরা যুক্তির সন্তান নই, আমরা আবেগের সন্তান। আমাদের ছোট্ট যুক্তির নৌকো যেন ভয়াল ঝড়ের মাঝখানে উত্তাল তরঙ্গে আছাড় খাচ্ছে।

কখনও যদি শুনি কেউ আমাদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলছে তাহলে স্বপক্ষে কিছু না বলাই ভালো। প্রত্যেক বোকাই তাই করে। আসুন আমরা কিছু নতুন বুদ্ধির প্রকাশ দেখাই। আমাদের সমালোচকদের গোল্লায় পাঠানোর একমাত্র উপায় হল একথাই বলা : 'আমার সমালোচক যদি আমার সমস্ত ত্রুটির কথা জানতেন তাহলে আরও জোর সমালোচনা করতে পারতেন।

এর আগে আমি বলেছি অন্যায় সমালোচনা করলে কি করা উচিত। তবে আর একটা উপায় আছে : যখন অন্যায় সমালোচনা শুনে আপনার ক্রোধ জন্মাবে তখন একটু থেমে বলুন না : 'এক মিনিট···আমি আদৌ সর্বদোষ মুক্ত নই। আইনস্টাইন যদি স্বীকার করতে পারেন তিনি শতকরা নিরানব্বইটি ভুল করেন, তাহলে আমি অন্ততঃ ওই সংখ্যার শতকরা আশিভাগ ভুল করি। তাই এ সমালোচনা হয়তো আমার প্রাপ্য। সমালোচনা আমার পাওনা হলে সমালোচককে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

পেপসোডেণ্ট টুথপেস্ট কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট চার্লস্ লাকম্যান বেতার প্রোগ্রামে বব হোপকে নিয়োগ করতে বছরে দশলক্ষ ডলার ব্যয় করেন। ওই প্রোগ্রামের প্রশংসা তিনি আদৌ দেখেন না বরং এর সমালোচনা দেখতে চান। তিনি জানতেন তা থেকে তিনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন।

ফোর্ড কোম্পানী তাদের পরিচালনার ত্রুটি জানার জন্য এতই উদগ্রীব যে তারা কর্মচারিদের কাছ থেকে সমালোচনা করতে আহ্বান করেন।

আমি একজন সাবান বিক্রেতার কথা জানি যিনি সমালোচনা চাইতেন। প্রথমে

যখন তিনি কলগেটের হয়ে সাবান বিক্রি করতেন খুব ধীরেই অর্ডার পেতেন। তাঁর দুশ্চিন্তা হল চাকরিটা থাকবে কি না। তিনি যখন দেখলেন সাবান বা তার দামে কোন গোলমাল নেই তখন বুঝলেন গোলমাল তাঁর নিজেকে নিয়ে। তিনি যখন কোন জায়গায় সাবান বিক্রি করতে পারতেন না তখন বেরিয়ে এসে ভাবতেন কেন তিনি পারলেন না। তাঁর কথাবার্তা কি এলোমেলো? নাকি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন? কখনও তিনি ব্যবসায়ীদের কাছে ফিরে গিয়ে বলতেন, 'আমি সাবান বিক্রি করতে আসিনি। আমি এসেছি আপনার সমালোচনা আর উপদেশ শুনতে। কয়েক মিনিট আগে যে সাবান বিক্রি করতে আসি তখন কি ভুল করেছি আপনি আমার চেয়ে ঢের অভিজ্ঞ আর সফলতা লাভ করেছেন। দয়া করে সমালোচনা করুন। আমি অকপট সমালোচনা চাই। কোন ঢাকাঢুকির দরকার নেই।'

এই রকম ভঙ্গী করায় তিনি বহু বন্ধু আর কার্যকর উপদেশ পেয়েছেন। জানেন কি আজ তিনি কি হয়েছেন? তিনি আজ পামঅলিভ-কলগেট-পীট সাবান প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট—এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাবান প্রতিষ্ঠান। তাঁর নাম ই. এইচ লিটল। গতবছর আমেরিকায় তাঁর চেয়ে মাত্র চৌদ্দ জনের আয় বেশি ছিল—প্রায় আড়াই লক্ষ ডলার!

এইচ. পি. হাওয়েল, বেন ফ্রাঙ্কলিন বা ই. এইচ. লিটল যা করেছেন তা করতে বড় হওয়া দরকার। কিন্তু এখন যখন অন্য কেউ এদিকে তাকাচ্ছে না, তখন একটু আয়নার দিকে তাকান না কেন, আর নিজেকে প্রশ্ন করুন আপনি ওই রকম কি না!

সমালোচনার জন্য দুশ্চিন্তা ত্যাগ করার তিন নম্বর উপায় হল তাই:

'আসুন আমাদের বোকামিগুলো লিখে রাখি আর নিজেদের সমালোচনা করি যখন ত্রুটিহীন হতে পারব না তখন আসুন সত্যিকার সমালোচনাই চাই।'

॥ তেইশ ॥

অবসাদ দূর করার উপায়

দুশ্চিন্তা দূর করার সম্বন্ধে বইয়ে অবসাদ দূর করার কথা লিখতে চাইছি কেন? ব্যাপারটা খুবই সরল : কারণ অবসাদ অনেক ক্ষেত্রেই দুশ্চিন্তা আনে—অন্ততঃ দুশ্চিন্তা প্রবণ করে তুলতে পারে। যে কোন ডাক্তারি ছাত্রই বলবে অবসাদ যে কোন রকম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়—আবার যেকোনো মনস্তাত্ত্বিকও বলবেন অবসাদ ভয় আর দুশ্চিন্তার আবেগ দূর করার ক্ষমতাও কমিয়ে আনে। তাই অবসাদ দূর করতে পারলে দুশ্চিন্তা দূর করা সম্ভব হতে পারে।

'দূর করা সম্ভব হতে পারে' বললাম? কথাটা নরম করেই বললাম। ডঃ জ্যাকবসন আর একটু এগিয়েছেন এবং তিনি দুখানা বইও লিখেছেন বিশ্রাম সম্পর্কে। তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল ফিজিওলজির ডিরেক্টর। ডাক্তারি ক্ষেত্রে বিশ্রাম নিয়ে তিনি ঢের পরীক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন পরিপূর্ণ বিশ্রামের সময় স্নায়বিক বা আবেগজনিত অবস্থা মোটেই থাকতে পারেনা। অন্যভাবে বললে বলা যায় : 'আপনি বিশ্রাম করতে থাকলে কিছুতেই দুশ্চিন্তা করতে পারবেন না।

তাই অবসাদ আর দুশ্চিন্তা কাটানোর ক্ষেত্রে নিয়ম হল : 'ঘন ঘন বিশ্রাম নিন। ক্লান্ত হওয়ার আগেই বিশ্রাম করুন।'

এটা এত জরুরী কেন? কারণ অবসাদ অত্যন্ত দ্রুত ছড়ায়। আমেরিকার সেনাবিভাগ তরুণ সেনাদের ঘন ঘন পরীক্ষা করে আবিষ্কার করেছেন যে, কাজ করার ফাঁকে ঘণ্টায় তারা যদি দশ মিনিট জিরিয়ে নেয় তাহলে তারা আরও ভালো ভাবে কাজ করতে পারে। তাই সামরিক দপ্তর তাদের বিশ্রাম করতে বাধ্য করে। আপনার হৃৎপিণ্ডও ওই রকম। আপনার হৃৎপিণ্ড প্রতিদিন যে পরিমাণ রক্ত পাম্প করে তাই দিয়ে একটা রেলের গাড়ি বোঝাই করা যায়। এর ফলে যে শক্তির উৎপাদন হয় তা দিয়ে পঁচিশ চল্লিশ মণ কয়লা তিন ফুট উঁচু করে জমা করা চলে। এরকম কাজ সে পঞ্চাশ, সত্তর বা নব্বই বছর ধরে করে চলতে পারে। হৃৎপিণ্ড কিভাবে তা সহ্য করে? হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের ডঃ ওয়াল্টার বি. ক্যানন বলেন : 'বেশির ভাগ লোকেরই ধারণা হৃৎপিণ্ড সারাক্ষণই কাজ করে চলে। আসলে প্রতিবার সঙ্কোচনের সময় বিশ্রাম ঘটে। মিনিটে মাত্র সত্তর বার ধুক ধুক পুক করে আর হৃৎপিণ্ড চব্বিশ ঘণ্টায় পনেরো ঘণ্টা বিশ্রাম নেয়।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উইনস্টন চার্চিল সত্তর বছর বয়সে রোজ প্রায় ষোল ঘণ্টা কাজ করতে পারতেন, বছরের পর বছর ধরে সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। এ এক অবিস্মরণীয় ব্যাপার। এর গোপন রহস্য কি? তিনি রোজ সকালে এগারোটা পর্যন্ত বিছানায় বসে কাজ করতেন, রিপোর্ট পড়তেন,

আদেশ দিতেন, টেলিফোন করতেন আর জরুরী সভাও করতেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পর তিনি একঘণ্টা ঘুমোতেন। সন্ধ্যাবেলাতেও তিনি দু ঘণ্টা ঘুমোতেন আটটায় ডিনার খেয়ে। তাঁকে অবসাদ দূর করতে হত না। তিনি অবসাদ আসতেই দিতেন না। যেহেতু তিনি অনবরত বিশ্রাম নিতেন, তাই ক্লান্ত না হয়ে কাজ করতেও পারতেন।

প্রথম জন. ডি. রকফেলার দুটো বিচিত্র রেকর্ড করেন। ওই সময়ে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টাকা রোজগার করেন এবং আটানব্বই বছর বয়স অবধি বেঁচে ছিলেন। এসব কি ভাবে করেন তিনি? প্রধান কারণ অবশ্য তিনি দীর্ঘকাল বাঁচবেন মনস্থ করেন উত্তরাধিকার সূত্রে। আর একটা কারণ প্রতিদিন দুপুরে অফিসে আধঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতেন। তিনি আরাম কেদারায় যখন শুয়ে থাকতেন তখন স্বয়ং আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ডাকলেও ফোন ধরতেন না।

'কেন ক্লান্ত হন' নামের এক চমৎকার গ্রন্থে ড্যানিয়েল ডব্লিউ জোসেলিন বলেছেন: 'বিশ্রাম কোন অর্থহীন কাজ নয়, বিশ্রাম মানে মেরামত করা।' বিশ্রামের মেরামত করার শক্তি এতই বেশি যে এমন কি পাঁচ মিনিটে ঘুমও অবসাদ দূর করতে পারে। বিখ্যাত বেসবল খেলোয়াড় কনি ম্যাক বলেছেন বিকেলে একটু ঘুমিয়ে না নিলে তিনি খেলতেই পারতেন না।

এলিনর রুজভেল্টকে যখন প্রশ্ন করেছি তিনি হোয়াইট হাউসে থাকার সময় বারো বছর কি ভাবে ক্লান্ত না হয়ে কাজ করতেন, তিনি বলেছিলেন কোন সভা বা বক্তৃতা দেবার আগে তিনি চেয়ারে বসে বিশ মিনিট চোখ বুজে বিশ্রাম নিতেন।

আমি একবার হলিউডের চিত্রাভিনেতা জীন অট্রির সাজঘরে গিয়েছিলাম। তাঁর ঘরে একখানা স্প্রিংয়ের খাট দেখেছিলাম। জীন অট্রি আমায় বলেন, 'প্রতিদিন বিকেলে ওটায় শুয়ে কাজের ফাঁকে আমি একঘণ্টা ঘুমিয়ে নিই। হলিউডে যখন ছবি করি আরাম কেদারায় শুয়ে দশ মিনিট করে বার তিনেক ঘুমোই। এতে প্রচুর উৎসাহ পাই।'

এডিসনও বলেছিলেন তাঁর অদ্ভুত শক্তি আর সহ্যশক্তির মূলে রয়েছে যখন তখন ঘুমিয়ে নেবার ক্ষমতা।

আমি হেনরী ফোর্ডকে তাঁর আশি বছরের জন্মদিনের সময় একবার দেখেছিলাম। আমি অবাক হয়ে যাই তাঁর সুন্দর সজীব চেহারা আর প্রফুল্লতা দেখে। আমি তাঁকে তাঁর রহস্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'আমি বসার সুযোগ পেলে দাঁড়াই না, শোবার সুযোগ পেলে বসিনা।'

আধুনিক শিক্ষার গুরু হোরেসমান বৃদ্ধ বয়সে তাই করতেন। অ্যাণ্টিয়ক কলেজের প্রেসিডেণ্ট হয়ে তিনি একটা কোচে শুয়েই ছাত্রদের সাক্ষাৎকার নিতেন।

আমি হলিউডের একজন চিত্র পরিচালককে এই রকম বিশ্রাম করতে বলেছিলাম। তিনি স্বীকার করেছেন ব্যাপারটা অলৌকিক কাজ দিয়েছে। আমি জ্যাক চার্টকের কথা বলছি। তিনি আমায় বলেছিলেন এর আগে তিনি প্রচুর টনিক, পিল, ইত্যাদি খেয়েছেন কিন্তু কিছুই উপকার পাননি। আমি তাঁকে বলেছিলাম প্রতিদিন ছুটি নিতে। তিনি

জানতে চান কি ভাবে ? প্রতিদিন অফিসে কিছুক্ষণ টানটান হয়ে বিশ্রাম নিতে।

দু বছর পরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি বলেন আমার একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটে গেছে। ডাক্তাররা অন্ততঃ তাই বলেছিলেন। তিনি তাঁর ঘরে যখন তখন টানটান হয়ে শুয়ে পড়েন, তাতে তিনি খুবই ভালো বোধ করেন। এখন তিনি দু'ঘণ্টা বেশি পরিশ্রম করেও শ্রান্ত হন না।

আপনার ক্ষেত্রে এটা কি রকম হতে পারে ? আপনার পক্ষে যদি দুপুরে ঘুমোন সম্ভব না হয় তাহলে সন্ধ্যায় খাওয়ার আগে তা করতে পারেন। দুপুরে খাওয়ার পর কিছু সময় ঘুমোলে ক্লান্তি কেটে যায়। শহুরে মানুষদের এটাই করা উচিত। জেনারেল জর্জ মার্শাল তাই করতেন। সেনাবাহিনী পরিচালনার ফাঁকে তিনি দুপুরে ঘুমিয়ে নিতেন। রাত্রে আট ঘণ্টা ঘুমিয়ে যে বিশ্রাম মেলে তার চেয়ে বিশ্রাম পাওয়া যায় খাওয়ার আগে একঘণ্টা আর রাত্রে ছ'ঘণ্টা ঘুমোলে।

একজন শারীরিক পরিশ্রমকারী অনেক বেশি কাজ করতে পারে সে যদি কাজের ফাঁকে কিছু বিশ্রাম নেয়।

বেথলেহেম ইস্পাত কোম্পানীর ফ্রেডরিক টেলার ব্যাপারটা প্রমাণ করে দেখান। তিনি দেখেন মজুররা রোজ ১২½ টন লোহা বোঝাই করতে পারে। অথচ তারাই আবার পারে ৪৭ টন বোঝাই করতে যদি উপযুক্ত বিশ্রাম পায়।

টেলর বিশেষ একজন মজুরকে বেছে নিয়ে স্টপ ওয়াচ দিয়ে পরীক্ষা চালান। ওই লোকটিকে লোহা তোলার ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম করতে দেওয়া হয়। তাতে দেখা যায় যে ১২½ টনের জায়গায় ৪৭ টন তুলতে পেরেছে।

তাই আবার বলি : সেনাবাহিনী যা করে আপনিও তাই করুন। প্রায়ই বিশ্রাম নিন। আপনার হৃৎপিণ্ডের মত পরিশ্রান্ত হওয়ার আগেই বিশ্রাম করুন। আপনার জীবনে তাহলে প্রতিদিন বেশি সময় পাবেন।

॥ চব্বিশ ॥

আপনার ক্লান্তির কারণ ও তার প্রতিকার

একটা আশ্চর্যজনক আর উল্লেখজনক ব্যাপার জানাচ্ছি—শুধুমাত্র মানসিক পরিশ্রম আপনাকে ক্লান্ত করতে পারে না। শুনলে অসম্ভব বলেই মনে হবে। তবে কয়েক বছর আগে বিজ্ঞানীরা বের করতে চেষ্টা করছিলেন মানুষের মস্তিষ্ক পরিশ্রান্ত না হয়ে কতখানি কাজ করে যেতে পারে—যার বৈজ্ঞানিক নাম হলো অবসাদ বা ক্লান্তি। এই সব বিজ্ঞানীরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করেছেন যে সতেজ মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচলের সময় কোন অবসাদের চিহ্ন দেখা যায় না। আপনি যদি কোন রোজ খেটে খাওয়া শ্রমিকের শিরা থেকে এক ফোঁটা রক্ত তার কর্মরত অবস্থায় বের করে আনেন, তাহলে দেখতে পাবেন সে রক্ত প্রচুর ক্লান্তিময় টক্সিনে ভর্তি। কিন্তু আপনি যদি অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের মস্তিষ্কের এক ফোঁটা রক্ত নিতেন তাহলে দেখতে পেতেন তাতে কিন্তু ক্লান্তির সেই টক্সিনের ছিঁটে ফোঁটাও নেই।

মস্তিষ্কের কথা বলতে গেলে দেখা যাবে মস্তিষ্ক কাজ সুরু করায় গোড়াতেও যেরকম চলে আট বা বারো ঘণ্টা পরেও সেই রকমই কর্মক্ষম থাকে। মস্তিষ্ক হলো সম্পূর্ণ ভাবে ক্লান্তি বিহীন কিছু। তাহলে আপনার ক্লান্তির কারণ কি?

মনোবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে আমাদের অবসাদ বা ক্লান্তির প্রধান উৎস হলো আমাদের মানসিক আর আবেগময় ব্যবহার। ইংল্যাণ্ডের অনেক খ্যাতনামা মনো-সমীক্ষক জে. এ. হ্যাডফিল্ড তাঁর 'সাইকোলজি অব পাওয়ার' নামক গ্রন্থে বলেছেন: 'যে ক্লান্তিতে আমরা বেশির ভাগ ভুগি তার বেশির ভাগই জন্ম নেয় মন থেকে। আসলে শুধুমাত্র দৈহিক কারণে অবসাদ প্রায় দেখাই যায় না।

আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন মনোবিজ্ঞানী ডঃ এ. এ. ব্রিল আরও একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মত হলো: 'যাঁরা বসে কাজ করে থাকেন তাদের মত সুস্থ মানুষের শতকরা একশ ভাগ অবসাদের কারণ হলো মনস্তাত্ত্বিক কারণ, এর মানে হলো আবেগ জনিত কারণ।'

কি ধরনের আবেগ জনিত কারণে (বা বসে থাকা) কর্মী ক্লান্ত হয়ে থাকেন? আনন্দের আতিশয্যে? মনের খুশিতে? না! কখনোও তা নয়! একঘেঁয়েমি, বিরক্তি, যোগ্য সমাদরের অভাব, তুচ্ছতাবোধ, তাড়াহুড়ো, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা—এই গুলোই সেই আবেগজনিত কারণ, যাতে বসে কাজ করা মানুষ অবসাদগ্রস্ত হয়—এবং এরফলেই সে মাথার যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে। হ্যাঁ, জেনে রাখুন আমরা ক্লান্ত হই কারণ আমাদের আবেগই আমাদের শরীরে স্নায়বিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

মেট্রোপলিটান জীবন বীমা কোম্পানী অবসাদের উপর একটা পুস্তিকায় বলেছিলেন এই কটি কথা : কঠিন পরিশ্রম কখনই কদাচিৎ ক্লান্তি বা অবসাদ আনতে পারে, যে অবসাদ ভালো নিদ্রা বা বিশ্রামে দূর হয় না···দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ আর আবেগজনিত গণ্ডগোলই ক্লান্তি বা অবসাদের প্রধান তিনটি কারণ। যখন শারীরিক বা মানসিক কাজের ফলেই এটা হয় তখন এদেরই দোষের কারণ বলা হয়···মনে রাখবেন টান টান কোন মাংসপেশীই হলো কার্যকর মাংসপেশী। অতএব সহজ হয়ে উঠুন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য শক্তি জমিয়ে রাখুন।'

এবারে যেমন অবস্থায় আছেন সেই অবস্থায় থেকে, আপনি নিজেকে একবার পরীক্ষা করে নিন। এই লাইনগুলো পড়তে বইটার দিকে ভ্রূকুটি করছেন না তো? দুচোখের মাঝখানে কোন মানসিক চাপ বোধ করছেন না তো? আপনার চেয়ারে বেশ আরাম করে বসে আছেন তো? নাকি কাঁধ কুঁচকে রয়েছেন? আপনার মুখের পেশীগুলি কি টান টান হয়ে আছে? এই মুহূর্তে যদি আপনার সারা শরীরটা তুলোর পুতুলের মত সরল আর ঢিলেঢালা না থাকে, তাহলে কোন সন্দেহ নেই এই মুহূর্তে আপনি স্নায়বিক উত্তেজনা আর পেশীর উত্তেজনায় আক্রান্ত। আপনি স্নায়বিক অবসাদ তৈরি করে চলেছেন।

মানসিক কাজ করতে গিয়ে আমরা কেন এই অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা তৈরি করি? জোসেলিন বলেন : 'আমি লক্ষ্য করেছি যে প্রধান বাধা হলো সার্বজনীন এই বিশ্বাস যে কঠিন কাজ করার জন্য চাই চেষ্টার এক চিন্তা, না হলে কাজটি ঠিকমতো হতে চায় না।' আর এই কারণেই আমরা মনোযোগ দেওয়ার সময় ভ্রূ কুঁচকে তাকাই। আমরা কাঁধ সংকুচিত করি। আমরা আমাদের পেশীকে আমাদের চেষ্টার মধ্যে গতি আনতে বলি, কিন্তু এসব আমাদের মস্তিষ্ককে কোনভাবেই তার কাজে সাহায্য করে না।

এখানে আশ্চর্যজনক আর বিয়োগান্ত একটা সত্য উধৃত করছি : কোটি কোটি মানুষ যারা তাদের টাকা নষ্ট করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনা তারাই আবার উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্য দিয়ে সেই টাকা আর তাদের শক্তি নাবিকদের মত উন্মত্ততার মধ্য দিয়ে উড়িয়ে চলে।

এই স্নায়বিক অবসাদের উত্তর কি রকম? বিশ্রাম! বিশ্রাম! বিশ্রাম! কাজ করে চলার অবসরে বিশ্রাম গ্রহণ করার কৌশল আয়ত্ত করুন।

ব্যাপারটা সহজ! মোটেই না। এটা করতে গেলে আপনাকে হয়তো আপনার সারা জীবনের অভ্যাসকে উল্টোপথে চালনা করতে হতে পারে। তবে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে, কারণ এর ফলে আপনার জীবনে হয়তো বা বিপ্লব ঘটে যেতে পারে। উইলিয়াম জেমস তার 'দি গসপেল অব রিল্যাক্সেশান' প্রবন্ধে বলেছেন : আমেরিকান জীবনে মাত্রাতিরিক্ত উদ্বেগ, ঝাঁকুনি আর সন্ত্রস্ততা এবং তারই সঙ্গে প্রকাশের ব্যথা আর তীব্রতা···এর মূলে হলো আর কিছুই না—খারাপ অভ্যাস।'

উদ্বেগ একটা অভ্যাস। বিশ্রামও একটা অভ্যাস। খারাপ অভ্যাস যেমন দূরে করা যায়, ভাল অভ্যাস তেমন গড়ে তোলাও সম্ভব।

আপনি বিশ্রাম নেন কেমন করে? আপনার মন থেকেই সুরু করেন না স্নায়ু দিয়ে সুরু করেন? আসলে এ দুটোর কোনটা দিয়ে তা করেন না। সবসময়েই আপনি আপনার পেশীকে বিশ্রাম দিতে সুরু করুন।

আসুন একটু চেষ্টা করে দেখি। কি করে এটা হয় দেখাতে গেলে আসুন আপনার চোখ দিয়েই সুরু করা যাক। এই অংশটা ভাল করে পড়ুন, তারপর শেষ প্রান্তে পেঁছিনোর পর একটু হেলান দিয়ে বসে চোখ দুটো বন্ধ করে আপনার চোখকে আস্তে আস্তে বলতে থাকুন, 'যেতে দাও, যেতে দাও। জোর করে কিছু দেখবার দরকার নাই, ভ্রুকুটি করো না। যেতে দাও, যেতে দাও।' আরও এক মিনিট আস্তে আস্তে এই রকম করুন…।

আপনি লক্ষ্য করে দেখেছেন কি কয়েক সেকেণ্ড পরেই চোখের পেশীগুলো হুকুম তামিল করতে আরম্ভ করেছে? আপনার কি মনে হয় নি যেন কোন হাতের স্পর্শে আপনার অবসাদ দূর হতে আরম্ভ করেছে? যাই হোক, আসল রহস্য হলো ওই একটা মিনিটের মধ্যেই আপনি বিশ্রাম বা বিনোদনের গোপন রহস্যটা জেনে ফেলেছেন। এটাই মূল কথা। এই সকল একই জিনিস আপনি করতে পারেন আপনার চোয়াল দিয়ে, বা মুখের পেশী, ঘাড় বা কাঁধ দিয়ে, মোট কথা সারা শরীর দিয়ে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তুটি হলো ওই চোখ। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এডমণ্ড জ্যাকসন তো এমনকি বলেই ফেলেছেন যে, আপনি যদি চোখের পেশীগুলোকে সম্পূর্ণ নমনীয় করে ফেলতে পারেন তাহলে সমস্ত রকম জ্বালা যন্ত্রণার কথা একেবারেই ভুলে যেতে পারবেন! চোখ যে কোন স্নায়বিক উদ্বেগ দূর করার কাজে এত গুরুত্বপূর্ণ, তার কারণ হলো তারা শরীরের গ্রহণীয় সমস্ত ক্ষমতার এক চতুর্থাংশ খরচ করে ফেলে। আর এই কারণেই বহু মানুষ, যাদের দৃষ্টিশক্তি চমৎকার, তাঁরা চোখের টাটানিতে ভোগেন।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ভিকি ব্রাউন বলেন যে তিনি যখন ছোট ছিলেন তখন কোন এক বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর দেখা হলে তিনি তাঁকে এমন একটা জিনিস শিখিয়ে দেন, যার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তিনি আর শোনেন নি। পড়ে গিয়ে তার হাঁটু ছড়ে গিয়েছিলো আর কব্জিতেও আঘাত লেগেছিলো। বৃদ্ধ লোকটি তাঁকে তুলে ধরেছিলেন, তিনি এককালে সার্কাসের ক্লাউন ছিলেন। তার পোশাকের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বৃদ্ধ বলেছিলেন: পড়ে গিয়ে তোমার আঘাত লাগার কারণ হলো তুমি জানো না কেমন করে নমনীয় হতে হয়। তোমার ভাব দেখাতে হবে যেন তুমি পুরানো দলা পাকানো মোজার মতই নড়বড়ে আর নরম। এসো, তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি কেমন করে সেটা করতে হয়।'

সেই বৃদ্ধ এরপর শিশু ভিকিকে আর অন্যান্য বাচ্চাদের শিখিয়ে দেন কি করে পড়ে যেতে হয় আর কেমন করে গড়িয়ে গিয়ে ডিগবাজি খেতে হয়। বৃদ্ধ বারবার বলেছিলেন, 'একটা কথা সবসময় মনে রাখবে তুমি হচ্ছো পুরনো দলা পাকানো মোজা। তারপরই তোমায় নমনীয় হতে হবে।'

আপনিও যখন তখন যে কোন মুহূর্তেই এই বিশ্রাম নিতে পারেন। শুধু বিশ্রাম নেওয়ার কোন চেষ্টা করবেন না। বিশ্রাম হলো সমস্ত রকম উদ্বেগ আর প্রচেষ্টার

অনুপস্থিতি। সহজভাবে ভাবতে চেয়ে বিশ্রাম নিন। এটা সুরু করবেন আপনার চোখের আর মুখের পেশী নমনীয় করতে চেয়ে, সঙ্গে বার বার বলতে থাকবেন 'সব চলে যাক…চলে যাক,…বিশ্রাম চাই।' আপনার মুখের পেশী বেয়ে অনুরণকে শরীরের অভ্যন্তরে থামতে অনুভব করতে থাকুন। শিশুর মত সব রকম উদ্বেগ মুক্ত বলে নিজেকে ভাবতে থাকুন।

ঠিক এই রকমই করতেন বিখ্যাত গায়িকা গ্যাল্লি কুর্চি। হেলেন জেপসন নামে একজন মহিলা আমায় একবার বলেছিলেন যে তিনি কোন অনুষ্ঠানের ঠিক আগে গ্যাল্লি কুর্চিকে একটা চেয়ারে সমস্ত পেশী এলিয়ে দিয়ে বসে থাকতে দেখেছেন। তাঁর চোয়াল প্রায় মুখে পড়তো তখন। ভারি চমৎকার অভ্যাস এটা—এটা তাঁকে মঞ্চে প্রবেশের আগে সব উদ্বেগ আর স্নায়বিক দুর্বলতা মুক্ত করে দিত, এটা তাঁর অবসাদও দূর করত।

শরীরে শিথিলতা এনে বিশ্রাম করার জন্য নিচের পাঁচটি উপদেশ মেনে চলতে পারেন :

॥ এক ॥ এ বিষয়ে কিছু ভালো বই পড়তে পারেন, যেমন ডঃ ডেভিড হ্যারল্ড ফিঙ্কের 'স্নায়বিক উদ্বেগ থেকে মুক্তি'। এছাড়াও আছে ড্যানিয়েল ডব্লিউ জোসেলিনের লেখা 'কেন ক্লান্ত হন' বইখানা।

॥ দুই ॥ যখন তখন বিশ্রাম নিতে চেষ্টা করুন। পুরনো মোজার মত নিজেকে শিথিল করে ফেলুন। আমি আমার কাজের টেবিলে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য একটা পুরনো মোজা রেখে দিই। এ ছাড়া বিড়ালের কথাটাও মনে রাখবেন। ঘুমন্ত বিড়াল-ছানা কখনও হাতে নিয়ে দেখেছেন? তুলে নিয়ে দেখবেন কেমন ভুলোর বস্তার মত লাগে। ভারতীয় যোগীরাও বলেন বিশ্রামের কৌশল আয়ত্ত করতে হলে বিড়ালের চালচলন লক্ষ্য করবেন। আমি কোনদিন অবসাদে ভেঙে পড়া বিড়াল দেখিনি।

॥ তিন ॥ বেশ আরাম করে বসে যতটা পারেন কাজ করবেন। মনে রাখবেন শরীরে উদ্বেগ থাকলে কাঁধ ব্যাথা হয় আর অবসাদ আসে।

॥ চার ॥ দিনের মধ্যে চার কি পাঁচ বার নিজেকে পরীক্ষা করুন আর নিজেকে প্রশ্ন করুন : 'আমি কি বেশি পরিশ্রম করছি? যে কাজে পেশীর প্রয়োজন নেই তাতে কি তাই কাজে লাগাচ্ছি?' এটা আপনাকে বিশ্রামের কৌশল আয়ত্ত করতে শেখাবে।

॥ পাঁচ ॥ এরপর দিনের শেষে নিজেকে আবার প্রশ্ন করুন : 'আমি কতখানি ক্লান্ত? আমি যদি ক্লান্ত হই সেটা আমার মানসিক কাজের বা পরিশ্রমের জন্য নয়, বরং আমি যেভাবে করেছি সেইজন্যেই। ড্যানিয়েল ডব্লিউ জোসেলিন বলেন : 'আমি দিনের শেষে নিজেকে প্রশ্ন করিনা আমি কতখানি ক্লান্ত বরং জানতে চাই আমি কতটা ক্লান্ত নই। আমি যখন দিনের শেষে কোনভাবে অবসাদগ্রস্ত বলে নিজেকে ভাবি বা কোনরকম বিরক্তি আসে আর বুঝি আমার স্নায়ু ক্লান্ত, তখন বুঝতে পারি ভালোভাবেই কাজটা বেশি করেই করেছি, যোগ্যতারও অভাব ছিলো।' আমেরিকার ব্যবসাদারদের প্রত্যেকে যদি এটা খেয়াল রাখতেন তাহলে হয়তো উচ্চ রক্তচাপের ফলে মৃত্যুর সংখ্যা ঢের কমে আসতো। এছাড়াও স্যানাটোরিয়াম আর উম্মাদাশ্রমে মানুষের সংখ্যাও কম হতো।

॥ পঁচিশ ॥

গৃহকর্ত্রী কিভাবে অবসাদ দূর করবেন

গত শরৎকালে আমার সহকারী বোস্টনে উড়ে গিয়ে বিচিত্র এক ডাক্তারী ক্লাসে যোগ দেয়। ডাক্তারী? বেশ, ভালো কথা। আসলে কিন্তু এটা মনস্তত্ত্বের ক্লাস। এ ক্লাসের উদ্দেশ্য হলো যে সমস্ত মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তাদের চিকিৎসা। বেশির ভাগ রোগী হল এখানে অসুস্থ গৃহকর্ত্রী।

এধরণের দুশ্চিন্তাগ্রস্তদের ক্লাস সুরু হওয়ার গোড়ার কথাটা কি? শুনুন তাহলে ১৯৩০ সালে ডঃ যোশেফ এইচ প্র্যাট—যিনি ডঃ উইলিয়াম অসলারের ছাত্র ছিলেন—লক্ষ্য করেন যে সমস্ত রোগী বোস্টন ডিসপেনসারীতে চিকিৎসার জন্য আসেন তাদের বেশির ভাগেরই কোন শারীরিক বৈষম্য থাকে না। এই সব রোগীদের অনেকেই নানা রকম ব্যথার কথা বলতেন। কেউ বলতেন পাকস্থলীতে ক্যান্সার হয়েছে। কেউ বলতেন পিঠে ব্যথা। অথচ ডাক্তারী পরীক্ষায় কোন রোগই ধরা পড়েনি। বহু প্রাচীন পন্থী ডাক্তারই এসব শুনে বলতেন সব রোগটাই মনের। ডঃ প্র্যাট জানতেন সকলকে রোগের কথা ভুলে বাড়ি যেতে বলা বৃথা। কারণ—ওই গৃহকর্ত্রীরা কেউই অসুস্থ হতে চাননি। রোগের কথা ভোলা সম্ভব হলে তারা নিশ্চয়ই তাই করতেন। অতএব করণীয় কি?

এই জন্যই তিনি ক্লাস আরম্ভ করলেন—সঙ্গে সঙ্গে অনেক ডাক্তারই আবার এতে সন্দেহ প্রকাশ করতে সুরু করলেন অথচ ক্লাসে চমক সৃষ্টি হল। সুরু হওয়ার পর আঠারো বছর কেটে গেলে হাজার হাজার রোগী যাঁরা এখানে এসেছিলেন, তাঁরা আরোগ্য লাভ করেন। বহু রোগী সেরে যাওয়ার পরেও যেন নিয়মিত গির্জায় আসছেন মনে করে এসেছেন। একজনকে জানি যিনি রোগ সারার পর ন'বছর ধরে নিয়মিত এসেছেন। তিনি বলেছেন যে প্রথম যখন আসেন তাঁর ধারণা ছিল কিডনী বা বুকের অসুখে ভুগছিলেন। এতই দুশ্চিন্তা হত তাঁর যে মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য অন্ধও হয়ে যেতেন। অথচ আজ তিনি আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ, বয়স মনে হয় যেন চল্লিশ; কোলে নিদ্রিত নাতি। তিনি বলেছিলেন: 'পারিবারিক ব্যাপারে এত দুশ্চিন্তা করতাম যে মনে হত মরণই ভালো। এখানে এসে দুশ্চিন্তার অসারতা টের পেলাম, তা বন্ধ করতেও শিখলাম। এখন বলতে পারি আমার জীবন সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ।'

ডঃ রোজ হিলফার্ডিং হলেন ওই ক্লাসের ডাক্তারী পরামর্শদাতা। তিনি বলেছেন: 'চট করে দুশ্চিন্তা দূর করার সেরা পথ হল যাকে বিশ্বাস করেন তাকে সমস্যার কথাটা মন খুলে জানানো।' আমরা একে বলি ক্যানারসিস। রোগীরা যখন এখানে আসে, তাদের রোগের কথা পুরোপুরি বলার পরেই তাঁরা শান্ত হন। দুশ্চিন্তা নিয়েই কেবল চিন্তা করে চললে, আর তা মনের মধ্যে চেপে রাখলে প্রচণ্ড স্নায়ুর উপর চাপ পড়ে। আমাদের দুশ্চিন্তা ভাগ করে নেওয়া দরকার। আমাদের মনে হওয়া

দরকার পৃথিবীতে আমার সমস্যা ভাগ করে নেবার লোক আছে।'

আমার সহকারী একবার এক মহিলাকে তাঁর সমস্যার কথা শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে দেখেন। তাঁর পারিবারিক দুশ্চিন্তা ছিল, তিনি যখন কথা বলতে আরম্ভ করেন তখন তাকে মনে হচ্ছিল প্যাঁচ খোলা একখণ্ড স্প্রিং। ক্রমশঃ কথা বলার পর তিনি শান্ত হন। সাক্ষাৎকারের শেষে তাঁকে হাসতেও দেখা যায়। তাঁর সমস্যার কি সমাধান হয়ে গিয়েছিল? না, সেটা তত সহজ নয়। পরিবর্তনের কারণ হল তিনি মনের সব কথা উজাড় করে দিতে পেরেছিলেন। এই চমৎকার নিরাময়ের মূল কথা হলো—মানুষের সহানুভূতি ও কিছু উপদেশ। এই পরিবর্তনের কারণ হল কথা। কথার বিরাট আরোগ্য লাভের ক্ষমতা আছে।

মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতেও কিছুটা হল কথার আরোগ্য ক্ষমতা। ফ্রয়েডের আমল থেকেই মনস্তাত্ত্বিকরা দেখেছেন রোগী খুবই স্বস্তি লাভ করে সে যদি শুধু মন খুলে কথা বলতে পারে। এর কারণ কি? হয়তো এর ফলে আমাদের কষ্ট সম্পর্কে কিছু জ্ঞানলাভ হয়, ভালো বোঝা যায়। পুরো ব্যাপারটা অবশ্য কেউ জানেন না। তবে আমরা সবাই জানি, মন খুললে সঙ্গে সঙ্গেই বেশ স্বস্তি মেলে।

অতএব এরপর যখন কোন আবেগ জনিত সমস্যা আসবে তখন কারও সঙ্গে কথা বলিনা কেন? অবশ্য এটা বলছিনা যার সঙ্গেই দেখা হবে তার কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করে সব সমস্যাটা জানাবে। এটা কেউই পছন্দ করবেন না। আসলে যাকে বিশ্বাস করি তার কাছেই বলতে পারি। তার সঙ্গে দেখা করে বলতে পারবেন: 'আমার একটা সমস্যা আছে। আমি আপনার উপদেশ চাই—আশা করি আমার কথাটা একটু শুনবেন। হয়তো উপদেশ দিতে পারবেন, তাছাড়া এই সমস্যার ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গীতে যা দেখা সম্ভব আমার পক্ষে তা নাও হতে পারে। যদি উপদেশ নাও দিতে পারেন আপনি শুনলেও আমার উপকার হবে।'

বোস্টন ডিসপেনসারীতে কথা বলাই হল চিকিৎসার পদ্ধতি। এখানে কয়েকটা উপদেশ দেওয়া হচ্ছে—গৃহকর্ত্রীরা সেগুলো বাড়িতে কাজে লাগাতে পারেন।

১। একখানা নোটবই রাখতে পারেন। যাতে আঠা দিয়ে আপনার প্রিয় কবিতা, প্রার্থনা বা উধৃতি সেঁটে রাখতে পারেন। কোন বর্ষণসিক্ত অপরাহ্নে মন মেজাজ ঠিক না থাকলে নোটবই থেকে পাঠ করলে মন ভালো থাকবে।

২। অপরের দোষত্রুটি নিয়ে বেশি ভাববেন না। হয়তো আপনার স্বামীর বহু ত্রুটি আছে। সেসব কথা না চিন্তা করে তার গুণের দিকটাই ভাববেন। পরে ভাবলে দেখবেন এরকম লোক আপনার স্বামী হওয়ায় আপনি গর্বিত বোধ করছেন।

৩। আপনার পড়শীর সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করুন। তাদের সঙ্গে একটা বন্ধুত্বের আবহাওয়া সৃষ্টি করে তুলুন।

৪। রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে পরের দিনের কাজকর্মের একটা তালিকা তৈরী করে রাখুন। এতে কাজকর্মের সুবিধা হবে, কোন কিছু এলোমেলো হবে না।

৫। শেষ কথা হল, সব রকম দুশ্চিন্তা আর অবসাদ এড়িয়ে চলুন। বিশ্রাম

নিন। অবসাদ আর দুশ্চিন্তাই আপনাকে অসুস্থ করে তোলে।

হ্যাঁ, আপনি কোন গৃহকর্ত্রী হলে আপনাকে বিশ্রাম করতেই হবে! আপনার একাজে একটা বিশেষ সুবিধাও রয়েছে—আপনি যখন খুশি বিশ্রাম নিতে পারেন। যদি চান মেঝেতেও শুয়ে পড়তে পারেন। আশ্চর্যের কথা হল শক্ত মেঝেয় শোওয়া স্প্রিং লাগানো গদীর চেয়ে ভালো—এতে মেরুদণ্ড ভালো থাকে।

ভালো কথা, এবার কিছু ব্যায়ামের কথা বলি। এগুলো একসপ্তাহ চেষ্টা করে দেখুন—তাতে কি ফল হয় দেখবেন:

(ক) যখনই ক্লান্ত লাগবে সটান শুয়ে পড়ুন। দরকার হলে গড়িয়ে নিতেও পারেন। দিনে দুবার এটা করবেন।

(খ) চোখ বন্ধ করুন। সমস্ত চিন্তা দূর করে সূর্য বা তারার মত নিজেকে বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত ভাবতে থাকুন।

(গ) সমস্ত রকম দুশ্চিন্তা বন্ধ করুন—আর আস্তে আস্তে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে থাকুন। এবিষয়ে ভারতীয় যোগীরা ঠিক বলেছেন, ছন্দময় শ্বাস প্রশ্বাসে স্নায়ু শান্ত হয়।

॥ ছাব্বিশ ॥

দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তি দূর করার চারটি অভ্যাস

'প্রথম ভালো কাজের অভ্যাস : ডেস্ক থেকে একান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়া বাকি সব সরিয়ে ফেলুন।'

শিকাগো আর নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের প্রেসিডেণ্ট রোল্যাণ্ড এল. উইলিয়ামস বলেন : কোন মানুষ যদি সহজে কাজ করতে চান তাহলে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ফাইলপত্র ছাড়া তার টেবিলে জমা বাকি সব কাগজ সরিয়ে ফেলাই উচিত। আমি একে এক নম্বর ভালো কাজ করার পথ বলে মনে করি আর এটা সবচেয়ে সেরা যোগ্যতার মাপকাঠি।'

আপনি যদি ওয়াশিংটন ডি. সি-র লাইব্রেরী অব কংগ্রেসে কখনও বেড়াতে যান তাহলে ছাদের নিচে কবি পোপের লেখা এই কটি কথা লেখা আছে দেখতে পাবেন :

''নিয়মানুবর্তিতাই স্বর্গের প্রথম নিয়ম।'

ব্যবসা জগতেও প্রথম কানুনটি হওয়া উচিত নিয়মানুবর্তিতা। কিন্তু সত্যিই তাই কি? না, কারণ গড়পড়তা ব্যবসাদারদের টেবিল কয়েক সপ্তাহ হাত পড়েনি এমন সব কাগজপত্রেই বোঝাই হয়ে থাকে। ব্যাপারটা এমনই ঘটে। একবার নিউ অর্লিন্সের একজন প্রকাশক আমায় বলেন যে তাঁর সেক্রেটারি তার টেবিল সাফ করতে গিয়ে একটা টাইপরাইটার খুঁজে পায় সেটা নাকি দু'বছর আগে হারিয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

টেবিলে স্তূপীকৃত কাগজপত্র দেখলেই বিরক্তি, উত্তেজনা আর চিন্তার উদ্রেক হতে চায় কিন্তু ব্যাপারটা তার চেয়েও খারাপ। 'সব সময় হাজার হাজার কাজের কথা আর সেগুলো করতে সময়ের অভাব' শুধু যে উত্তেজনা আর ক্লান্তি বাড়িয়ে দেয় তাই নয় বরঞ্চ এটা আপনার ব্লাড প্রেসার, হার্টের রোগ আর পেটের আলসার রোগেরও কারণ হয়ে উঠতে পারে।'

পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব মেডিসিনের অধ্যাপক ডঃ জন এইচ. স্টোকস একবার আমেরিকান জাতীয় মেডিক্যাল কনভেনশানের সামনে একটা প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন—নাম ছিলো 'জৈবিক রোগের জটিলতার আসল কারণ'। ওই প্রবন্ধে ডঃ স্টোকস এগারোটি অবস্থা বর্ণনা করেছিলেন। এর মধ্যে প্রথমটা ছিলো এই রকম :

'বাধ্যতামূলক কিছু করার ধারনা : সামনের অফুরন্ত কর্তব্য যা করতেই হবে।' কিন্তু এই টেবিল সাফ রাখার মত সাধারণ কাজ করে আর কোন কাজের ধারনা মাথায় নিয়ে, কেমন করে এই উচ্চ চাপ দূর করে যা করতেই হবে সেটা সমাধা করা যাবে? বিখ্যাত মনোসমীক্ষক ডঃ উইলিয়াম এল. স্যাডলার কোন এক রোগীর কথা জানিয়েছেন

যিনি এই সহজ পথ গ্রহণ করার ফলে প্রায় স্নায়বিক অবসাদে ভেঙে পড়ার হাত থেকে রেহাই পান। ভদ্রলোক শিকাগোর কোন প্রতিষ্ঠানের মস্ত একজন কর্মচারি। তিনি যখন ডঃ স্যাডলারের চেম্বারে আসেন তখন তিনি দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ আর স্নায়বিক দুর্বলতার শিকার হয়েছেন। তিনি জানতেন তাঁকে শিগগিরই মাটিতে পড়তে হতে পারে, কিন্তু কাজ ছেড়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলোনা। তাঁর তাই সাহায্যের দরকার ছিলো।

'ভদ্রলোক যখন তার নিজের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন', ডঃ স্যাডলার জানিয়েছিলেন : তখনই আমার টেলিফোন বেজে উঠলো। ফোন এসেছিলো হাসপাতাল থেকে। দেরী না করে আমি সে সম্বন্ধে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেবার বন্দোবস্ত করলাম। পারলে আমি সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শেষ করি। ফোনটা নামিয়ে রাখতে না রাখতেই আবার সেটা বেজে উঠলো। এবারেও জরুরী দরকার, তাই কথাবার্তা বলতে সময় লাগলো। তৃতীয়বার বাধা পেলাম আমার এক সহকর্মী যখন মারাত্মক রোগে এক রোগীর জন্য পরামর্শ চাইতে এলেন। তাকে বিদায় দিয়ে যখন অপেক্ষারত ভদ্রলোকের কাছে এসে দেরী করিয়ে দেওয়ার জন্য মাপ চাইলাম, ভদ্রলোক উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। তাঁর চোখে মুখে সম্পূর্ণ আলাদা অভিব্যক্তি দেখতে পেলাম।'

'মাপ চাইবেন না, ডাক্তার!' ভদ্রলোক স্যাডলারকে বললেন, 'গত দশ মিনিটে মনে হয় বুঝতে পেরেছি আমার গোলমালটা কোথায়। আমি অফিসে ফিরে আমার কাজের ধারা বদলে ফেলতে চাই...কিন্তু যাওয়ার আগে আপনার কি আপত্তি আছে, আমি যদি আপনার কাজের ডেস্কটা একটু দেখি?

ডঃ স্যাডলার তাঁর ডেস্কের ড্রয়ারগুলো খুলে ধরলেন। সবই খালি—শুধু সামান্য ওষুধ পত্র ছাড়া। 'বলছেন কি, ডাক্তার আপনার শেষ না হওয়া কাগজপত্র কোথায় রাখেন? ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।

'সব কাজ শেষ।' স্যাডলার জানালেন।

'জবাব না দেওয়া চিঠিপত্র কোথায় রাখেন?'

'সব জবাব দেওয়া হয়ে গেছে' স্যাডলার জানালেন। 'আমার কাজকর্মের নিয়ম হলো, উত্তর না দিয়ে কোন চিঠি আমি ফেলে রাখিনা। আমি আমার সেক্রেটারিকে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চিঠির উত্তর দিই।'

সপ্তাহ ছয়েক বাদে ওই একই ভদ্রলোক ডঃ স্যাডলারকে তাঁর অফিসে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি বদলে গিয়েছিলেন—আর তাঁর ডেস্কও ঠিক তাই। তিনি ডেস্কের ড্রয়ার খুলে দেখালেন শেষ হয়নি এমন কাজ জমানো নেই। 'ছ' সপ্তাহ আগে আমার তিনটে ডেস্ক দুটো আলাদা অফিসে ছিল—সেগুলো কাজের ফাঁকে পর্বত প্রমাণ হয়ে উঠেছিলো। কখনই কাজ শেষ করতে পারতাম না। আপনার সঙ্গে দেখা করে আসার পর ওয়াগন বোঝাই করে প্রতিবেদন আর পুরনো কাগজপত্র সরিয়ে ফেলি। আর এখন আমি কোন কাজই ফেলে রাখিনা, একটা ডেস্কে বসে কাজ করে চলি, জমানো কাজে ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তা আনতে দিই না। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো আমি

সম্পূর্ণ সেরে উঠেছি। আমার স্বাস্থ্যে কোন গণ্ডগোল আর নেই।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চার্লস্ ইভান্স হিউজেস বলেন: 'মানুষ অতিরিক্ত কাজের ফলে মারা যায়না। তারা মারা পড়ে বিক্ষিপ্ততা আর দুশ্চিন্তার জন্যই।' হ্যাঁ, কথাটা সত্যিই, তাদের শক্তির বিক্ষিপ্ততার জন্যই—আর দুশ্চিন্তার জন্য। কারণ তারা কখনই তাদের কাজ শেষ করতে পারবে ভাবতে পারেনা।

'দ্বিতীয় ভালো কাজের অভ্যাস: গুরুত্ব অনুযায়ী কাজগুলি শেষ করুন।'

'রাজ্য জোড়া সিটিজ সার্ভিস কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা হেনরি এল. ডুহার্টি একবার বলেন যে, যত মাইনেই তিনি দেন না কেন দুটো জিনিস লোকেদের কাছ থেকে পাওয়া তিনি অসম্ভব বলেই দেখেছেন।

সেই দুটি অমূল্য ক্ষমতা হলো: প্রথমটি, চিন্তা করার ক্ষমতা। দ্বিতীয়টি, গুরুত্বের ক্রম অনুসারে কাজ করার ক্ষমতা।'

সামান্য অবস্থা থেকে মাত্র বারো বছরে ক্ষমতার শিখরে উঠে পেপসোডেণ্ট কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট হন যে ছেলেটি তার নাম চার্লস্ লাকম্যান। তিনি আয় করেছেন, বছরে একেক লক্ষ টাকা আর জীবনে এছাড়াও করেছিলেন বহু লক্ষ টাকা। তিনি জানিয়েছিলেন যে হেনরি এল ডুহার্টি যে দুটো গুণ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব বলে ভেবেছিলেন সেই দুটি গুণের প্রতিই তাঁর সাফল্যের জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা জানাতে চান। চার্লস্ লাকম্যান লেখেন: 'যতদূর আমার মনে পড়ে আমি ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে পড়তাম কারণ এখনই আমি অন্য সময়ের চেয়ে ভালো ভাবে চিন্তা করতে পারতাম। তখন ভালো ভাবে চিন্তা করে আমার সারাদিনের পরিকল্পনা করতে পারতাম আর কাজের গুরুত্ব অনুসারে কাজের ব্যবস্থা করতাম।'

আমেরিকার সবচেয়ে সফল বীমার সেলসম্যান ফ্রাঙ্ক বেটজার সারাদিনের কাজ করার পরিকল্পনা ভোর পাঁচটার পরে আদৌ করতেন না। আগের রাতেই তিনি তাঁর পরিকল্পনার ছক তৈরি করতেন—নিজের কাজের একটা সীমাও ঠিক করে রাখতেন—সীমা হলো পরের দিন আনুমানিক কত টাকার বীমা করাতে পারবেন। সেটা যদি করতে না পারতেন তাহলে টাকাটা পরের দিন যোগ করে নেন—এইভাবেই চলে।

আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানি কারও পক্ষে কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী সবসময় কাজ করা সম্ভব হয় না, তবে আমি এটাও জানি যে প্রথম কাজ প্রথমে করার একটা কোন পরিকল্পনা করে রাখাও ভালো; আর সেই কাজ করতে করতে এগিয়ে চলা সবচেয়ে ভালো উপায়।

জর্জ বার্নার্ড শ যদি আগের কাজ আগে করার ব্রত না নিতেন, তাহলে হয়তো লেখক হিসেবে তিনি ব্যর্থই হতেন, এবং সারা জীবন একজন ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার হয়েই কাটাতেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিলো প্রতিদিন অন্ততঃ পাঁচ পাতা লেখা। এই হৃদয়বিদারক পরিকল্পনা তাঁকে প্রায় নটা বছর ধরে দৈনিক পাঁচ পাতা করে লেখার প্রেরণা যুগিয়ে ছিলো, যদিও ওই নটা বছরে তিনি মাত্র ত্রিশ ডলার রোজগার করতে পেরেছিলেন—

রোজ মাত্র এক পেনি। এমন কি রবিনসন ক্রুশোও রোজ কি করবেন তার একটা কার্যক্রম বানিয়ে রাখতেন।

তিন নম্বর ভালো কাজ করার অভ্যাস, কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে সঙ্গে সঙ্গেই সমস্যার সমাধান করুন, যদি প্রয়োজনীয় তথ্য পান, অযথা ঝুলিয়ে রাখবেন না।'

আমার একজন প্রাক্তন ছাত্র, এইচ. পি. হাওয়েল আমায় বলেছিলেন যে তিনি যখন আমেরিকার বোর্ড অব স্টীলের ডাইরেক্টর বোর্ডের একজন সদস্য ছিলেন তখন ওই বোর্ডের সভা বেশ সময় নিয়ে চলতো—অনেক সমস্যার আলোচনা হতো কিন্তু খুব কম সমস্যারই নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। ফল কি হতো ? বোর্ডের প্রত্যেক সদস্য গোছা গোছা কাগজ বাড়ি নিয়ে যেতেন পড়ার জন্য।

শেষ পর্যন্ত মিঃ হাওয়েল বোর্ডের ডাইরেক্টরদের রাজি করালেন এক এক সময় একটা করে সমস্যা নিয়ে আলোচনা আর সমাধান করতে। কোন দীর্ঘসূত্রতা বা ফেলে রাখা চলবে না। হয়তো কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল সমস্যাটি সমাধান করবার জন্য আরও বেশী তথ্যের প্রয়োজন। সমস্যার সমাধান নানা রকম হতে পারে—কিছু করা অথবা না করা, কিন্তু নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে অবশ্যই আসতে হবে। তবে পরের কাজটি গ্রহণ করার আগে একটা সমাধান করতে হবে। মিঃ হাওয়েল জানিয়েছেন এর ফলে যা ঘটলো তা অবিশ্বাস্য—আর কোন কাজই বাকি থাকেনি। সব কিছুই পরিষ্কার। কোন সদস্যকেই আর কাগজের তাড়া বাড়ি নিয়ে যেতে হয়নি। আর কখনও অসমাপ্ত কিছু প্রস্তাবও পড়ে থাকেনি।

আমেরিকার স্টীল দপ্তরের জন্যই শুধু ঐ নীতি নয়, এটা আপনার বা আমার জন্যেও এই নিয়ম প্রয়োগ করতে পারি।

'ভালো কাজের চার নম্বর অভ্যাস' :

বহু ব্যবসায়ী অকাল মৃত্যুর মুখোমুখি হন, কারণ তাঁরা অন্য কাউকে কোন রকম দায়িত্ব না দিয়ে সব কিছুই নিজে করতে চান। এর ফলাফল কেমন হয় ? ছোটো-খাটো সব কিছু এবং গণ্ডগোল তাঁকে পাগল করে ছাড়ে। তাঁর ভাগ্যে জোটে ছুটোছুটি, চিন্তা, উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা। দায়িত্ব অন্যের হাতে দেওয়ার কাজটা শেখা বেশ শক্ত। এটা আমার ভালোই জানা আছে। আমার পক্ষে কাজটা অত্যন্ত কঠিন মনে হয়েছিল। আমার অভিজ্ঞতায় আমি আরও জানি ভুল মানুষের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে কি ভয়ানক সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে! তবুও দায়িত্ব দেওয়া কঠিন হলেও দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ আর ক্লান্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বড় পদে আসীন কাউকে এটা দিতেই হবে।

যে মানুষ বিরাট ব্যবসা গড়ে তুলতে পারেন অথচ সংগঠনের কাজ, দায়িত্ব দান আর পর্যবেক্ষণ জানেন না তিনি সাধারণতঃ পঞ্চাশে বা ষাটের কোঠায় পেঁছে হৃৎপিণ্ডের গোলমালে ভোগেন—যে হৃৎপিণ্ডের গোলমাল উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তাতেই হয়। কোন জ্বলন্ত উদাহরণ চাইছেন ? বেশ, তাহলে স্থানীয় সংবাদপত্রে শোকসংবাদ কলমে চোখ বুলিয়ে দেখুন।

॥ সাতাশ ॥

একঘেঁয়েমি জনিত অবসাদ ও উদ্বেগ কাটানোর উপায়

অবসাদের অন্যতম প্রধান কারণই হলো একঘেঁয়েমি। উদাহরণ হিসেবে একজনকে হাজির করতে দিন। ধরুন এলিসের কথাটাই। আপনারই বাড়ির কাছে সে থাকে। পেশায় সে স্টেনোগ্রাফার। একরাতে সে বাড়ী ফিরলো অবসাদে প্রায় ভেঙে পড়ে মাথার যন্ত্রণা নিয়ে। মায়ের অনুরোধে সে খেতে বসলো কিন্তু খেতে পারলো না। তখনই টেলিফোন বেজে উঠলো। ওর এক বয় ফ্রেন্ড ফোন করছিলো! সে নাচের আসরে যেতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আনন্দে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এলিসের। ওর মন চনমনে হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে পোশাক পালটে ও ছুটলো। এরপর রাত তিনটে পর্যন্ত নাচ গান করে বাড়ি ফিরলো এলিস—ক্লান্তির কোন চিহ্নই ছিলোনা। ওর এমন আনন্দ হচ্ছিলো যে ঘুম আসছিল না।

তাহলে কি আট ঘন্টা আগে এলিস ক্লান্ত ছিলোনা? নিশ্চয়ই ছিলো। সে অবসাদে ভেঙে পড়ছিলো কারণ নিজের কাজে ওর একঘেঁয়েমি এসেছিলো। এরকম আরও এলিসকে খুঁজে পাওয়া যাবে। আপনিও একজন হতে পারেন।

এটা সত্য যে আপনার আবেগজনিত মনোভাবই শারীরিক পরিশ্রমের চেয়ে অবসাদ সৃষ্টির জন্য বেশি দায়ী। কয়েক বছর আগে জোসেফ ই. বারম্যাক 'আর্কাইভস অব সাইকোলজি'-তে এক প্রবন্ধে বুঝিয়েছিলেন একঘেঁয়েমি কেমন করে অবসাদ সৃষ্টি করে। একটা পরীক্ষার মধ্য দিয়েই তিনি এটা জানান। ডঃ বারম্যাক কিছু ছাত্রকে কোন এক পরীক্ষার কাজে লাগিয়েছিলেন যেটায় তিনি জানতেন তাদের কণামাত্রও আগ্রহ ছিলো না। ফলাফল কি হলো? ছাত্ররা অভিযোগ করলো তারা অবসাগ্রস্ত, মাথার যন্ত্রণায় আক্রান্ত, চোখ টাটানিতে বিরক্ত আর তাদের ঘুম পাচ্ছিলো। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের পেটেরও গণ্ডগোল হয়। সবটাই কি 'কল্পিত?' না। বিপাকীয় পরীক্ষায় দেখা যায় যে শরীরে রক্তের চাপ আর অক্সিজেন গ্রহন কোন মানুষ একঘেঁয়ে বোধ করলেই কমতে থাকে। অথচ সে কাজে আগ্রহ আর আনন্দ বোধ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিপাকীয় ক্রিয়া বেড়ে যায়।

আমরা যখন পছন্দসই আর উত্তেজনাময় কাজ করি তখন কদাচিত আমরা অবসাদ-গ্রস্ত হই। উদাহরণ হিসেবে ধরুন, আমি কিছুদিন আগে কানাডিয়ান রকি পর্বত এলাকার লুইজি হ্রদ অঞ্চলে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলাম। সেখানে বেশ কিছুদিন আমি প্রবাল খাঁড়ি বরাবর মাছ ধরেছিলাম। এই আনন্দ করতে গিয়ে আমার মাথার চেয়েও উঁচু সব ঝোপের মধ্য দিয়ে পথ করে চলেছি, গাছের গুঁড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়েছি—অথচ আট ঘণ্টার টানা পরিশ্রম করার পরেও এতটুকুও ক্লান্ত হইনি। এমন হওয়ার কারণ কি? কারণ হলো উত্তেজনা আর দারুণ আনন্দে ছিলাম। দারুণ কাজ

করেছি বলে আমি ভাবছিলাম। মস্ত আকারের ছ'টা ট্রাউট মাছ ধরেছিলাম। ধরুন যদি মাছ ধরতে ধরতে আমার একঘেঁয়েমি আসতো, তাহলে আমার মনোভাব কেমন হতো? তাহলে এমন পরিশ্রমের পর সাত হাজার ফিটের উপর আমায় অবশ্যই অবসাদে ভেঙে পড়তে হতো।

পাহাড়ে চড়ার মতো পরিশ্রমসাধ্য কাজে একঘেঁয়েমিই পরিশ্রমের চেয়ে ঢের বেশি অবসাদগ্রস্ত করে দেয়। একটা উদাহরণ দিচ্ছি: মিনিয়াপোলিশের মিঃ এস. এইচ. কিংম্যান ব্যাপারটা আমায় জানান। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে কানাডা সরকার কানাডা আলপাইন ক্লাবকে প্রিন্স অব ওয়েলস রেঞ্জার্সের কিছু সৈন্যকে পর্বতারোহণ শেখানোর জন্য কিছু পথপ্রদর্শক দিতে অনুরোধ জানায়। মিঃ কিংম্যান ছিলেন ঐ সৈন্যদের পর্বতারোহণ শেখানোর একজন শিক্ষক আর গাইড। তিনি আমায় বলেছিলেন ওই সব গাইডদের বয়স ছিল বিয়াল্লিশ থেকে উনষাট বছর—তারা ওই সব তরুণ সৈন্যদের হিমবাহ আর তুষার স্তূপের উপর দিয়ে প্রায় চল্লিশ ফুট খাড়া চূড়োতেও নিয়ে যান। সেখানে তাদের ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পথে যেতে হয়, কোন রকমে পা রাখা যায় এমন পথেও উঠতে হয়। তারা কানাডিয়ান রকি পর্বতের উচ্চ শিখরে তার নাম করণ হয়নি এমন সব শিখরেও ওঠেন। কিন্তু পনেরো ঘন্টা ধরে এই পর্বতারোহণের পর স্বাস্থ্যবান তরুণ সেনারা (যারা প্রায় ছ'মাস কঠিন শিক্ষাক্রম অনুসরণ করেছিলো) প্রায় অবসাদে ভেঙে পড়ে।

ওদের ওই অবসাদ কি আগেকার কঠিন শিক্ষায় মজবুত না হয়ে ওঠার পেশীর জন্য? যারা কমান্ডো ট্রেনিং গ্রহণ করেছেন তারা কথাটা শুনে হেসে উঠবেন! না, তারা অবসাদগ্রস্ত হয়েছিল পাহাড়ে চড়ার একঘেঁয়েমির জন্য। তাদের কেউ কেউ এমনই ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে খাবার জন্য অপেক্ষা না করেই তারা ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের পথপ্রদর্শকেরা যারা সৈন্যদের চেয়ে বয়সে দুই বা তিনগুণ বড়—তারাও কি ক্লান্ত হয়? হ্যাঁ, তারা ক্লান্ত হলেও ভেঙে পড়েন নি। তারা নৈশভোজ সেরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্পগুজব করে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করে চলেছিলো। তারা ভেঙে পড়েনি কারণ তাদের আগ্রহ ছিলো।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এডওয়ার্ড থর্নডাইক অবসাদ নিয়ে পরীক্ষা করার সময় কিছু তরুণকে প্রায় এক সপ্তাহ ঘুমোতে দেননি নানা উৎসাহজনক কাজে ব্যস্ত রেখে। নানা রকম পরীক্ষার পর তিনি ঘোষণা করেন: 'এক ঘেঁয়েমিই হলো কাজে উৎসাহ কমে আসার কারণ।'

আপনি মানসিক পরিশ্রম করে থাকেন তাহলে আপনার কাজের পরিমাণ আপনাকে অবসাদ গ্রস্ত করে তোলে না। যে কাজ আপনি করেন না তাই আপনাকে ক্লান্ত অবসাদময় করে তুলতে পারে। যেমন ধরুন, গতসপ্তাহের কথাটাই, সে সময় আপনি হয় তো বারবার বাধা প্রাপ্ত হন। কোন কাজ শেষ হয়নি, চিঠির জবাব দেওয়া হয় নি, সাক্ষাৎকার করা যায়নি। সবই কেমন গোলমেলে হয়ে যায়। কিন্তু আপনি সেদিন কিছু না করেও বাড়ি ফিরলেন ক্লান্ত হয়ে মাথায় যথেষ্ট যন্ত্রণা নিয়ে।

অথচ পরের দিন অফিসে সবই চমৎকার কাজকর্ম হয়। আগেকার চল্লিশগুণ বেশি জ করেন আপনি। তা সত্বেও ঝকঝকে সাদা টাটকা গার্ডেনিয়া ফুলের মত হয়েই ড়ি ফিরলেন। আপনার এ রকম অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই হয়েছে। হয়েছে আমারও।

এ থেকে কি শিক্ষা পাচ্ছি আমরা? এই শিক্ষা যে, আমাদের অবসাদ আসে কাজের না নয় বরং ভাবনা চিন্তা হতাশা আর বিরক্তি থেকে।

এই পরিচ্ছেদ লেখার সময় আমি জেরোম কার্ণের সঙ্গীত বহুল 'শো বোট' নাটকটি খতে গিয়েছিলাম। নাটকের নায়কের মুখে শোনা যায়: 'একমাত্র ভাগ্যবান তারাই রা কাজ করে আনন্দ পায়।' এরকম মানুষেরা ভাগ্যবান এই জন্যই যে তাদের য়েছে অনেক বেশি ক্ষমতা, কম উদ্বেগ আর কম অবসাদ।

কিন্তু এসব কথা জেনে লাভ কি? আপনার এতে করার আছেই বা কি? একজন টেনোগ্রাফারের কথা বলছি—অকলাহোমার টুলসার এই স্টেনোগ্রাফার কি করেছিল নুন। তাকে সারা মাস ধরেই একঘেঁয়েমিভরা কাজ করে চলতে হতো। তার কাজ ল কাগজপত্র গোছানো, চিঠিপত্র তৈরি রাখা, এই সব। অত্যন্ত একঘেয়ে কাজ বলে ই একদিন নিজে বাঁচার জন্যেই কাজটা একটু আনন্দময় করবে বলে ভেবে নিল। রে নিজেই সে একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে ফেললো। প্রতিদিন সকালে গুলো ফর্ম সে তৈরি করতো সেগুলো গুণে রাখতে আরম্ভ করলো। তারপর সেই খ্যা বিকেলের দিকে যাতে অতিক্রম করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হল। সে তিদিনের কাজের হিসেব রেখে পরদিন সেটা পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে আরম্ভ রল। এর ফল কেমন হয়েছিল? সে অল্প কদিনের মধ্যেই ওর দপ্তরের বাকি টেনোগ্রাফারের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করে ফেলতে লাগলো। কিন্তু তাতে তার কি লো? সে প্রশংসা লাভ করলো, না···ধন্যবাদ পেলো? না,···পদোন্নতি ঘটলো? া···মাইনে পেলো? তাও, না?···তবে এর ফলে তার অবসাদের ভাব কেটে গেলো। স পেলো সেই একঘেঁয়েমি ভরা কাজ থেকে মানসিক আনন্দ এবং আরও শক্তি, আনন্দ ার অবসর যাপনের সুখ।

গল্পটা যে সত্যি সেটা আমার জানা, কারণ ওই মেয়েটিকেই আমি বিয়ে করেছি।

আরও একজন স্টেনোগ্রাফারের গল্প শোনাচ্ছি। তিনিও একঘেঁয়েমি ভরা কাজকে নন্দময় করতে চেষ্টা চালিয়ে সফল হন। তিনি আমাকে নিজের কাহিনী লিখে নিয়ে ছিলেন। সেটা তার নিজের ভাষাতেই বলছি:

'আমাদের অফিসে স্টেনোগ্রাফারের সংখ্যা হলো চারজন। চারজন নানাজনের ঠিপত্র দেখাশোনা করে। আমাদের কাজের চাপে মাঝে মাঝে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে য়। একবার একজন সহকারী অধিকর্তা আমাকে একটা বড় চিঠি টাইপ করার কথা লেন। আমি আপত্তি জানিয়ে বলি কয়েকটা কথা শুধরে নিলেই কাজ চলতে পারে। তুন করে টাইপ করতে হবে না। ভদ্রলোক আমাকে দু কথা শুনিয়ে জানালেন আমার চ্ছে না থাকলে অন্য কাউকে দিয়েই তিনি টাইপ করিয়ে নেবেন। প্রচণ্ড রাগ করেই মি চিঠিটা নিলাম। হঠাৎ আমার মনে হলো আমার জায়গায় থেকে কাজ করতে

পারলে অনেকেই ধন্য হতো। তাছাড়া ঠিক এই রকম কাজ করার জন্যেই আমাকে মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে। এরপরেই ভালো বোধ করতে লাগলাম। আচমকা ম ঠিক করে ফেললাম, যেন ভালো লাগে এমন মনোভাব নিয়ে এবার থেকে কাজ করবো— যদিও মনে মনে আমার ঘৃণাই হতো। তারপরেই আমি এই দারুণ দরকারী জিনি আবিষ্কার করে বসলাম। আমি যদি কাজটা ভালোবাসি মনে করে কাজ করে যাই তাহলে কিছুটা ভালো করে কাজ করতে পারবো। অতএব আমায় কদাচিৎ বাড়তি কা করার দরকার হতো। আমার এই নতুন পদ্ধতির ফলে ভালো কর্মচারি হিসেবে আমা সুনাম হলো। এরপর যখন একজন বিভাগীয় সুপারিন্টেডেন্টের একজন প্রাইভে সেক্রেটারির দরকার হলো তিনি আমাকেই চাইলেন, কারণ তাঁর মতে আমি অসন্তুষ্ট ন হয়ে বাড়তি কাজ করতে চাই এবং ঠিক এমনটাই তাঁর দরকার। এই ভাবে শুধু মানসি চিন্তাধারা বদলের ফলেই দারুণ কিছু ঘটে গেলো। এ এক দারুণ আবিষ্কার। অদ্ভু কিছুই এতে ঘটেছে।'

ক'বছর আগে হারল্যান এ. হাওয়ার্ড এমন একটা সিদ্ধান্ত নেয় যে তাতে তার জীব ধারাই সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। তিনি নীরস একটা কাজকে সরস করতে চেষ্টা করেন সত্যিই তার কাজটা একঘেঁয়েমিতে ভরা ছিলো—প্লেট সাফ করা, কাউন্টার ধোলা করা, উঁচু ক্লাসের খাওয়ার ঘরে আইসক্রীম সরবরাহ করা ইত্যাদি যখন করত, তখন অ ছেলেরা খেলাধুলোয় বা মেয়েদের সঙ্গে খুনসুটি করতে ব্যস্ত। হারল্যান হাওয়ার্ড ম প্রাণেই তার কাজকে ঘৃণা করতো। কিন্তু কাজটা যখন তাকে করে যেতেই হবে, তখ সে আইসক্রীম কি দিয়ে তৈরী সেটা জানবে বলে ঠিক করে ফেললো। তাছাড়া একট আইসক্রিম আর একটার চেয়ে কেনই বা ভালো। সে আইসক্রিমের রসায়ন পড়ে আরম্ভ করলো আর পরে দক্ষতাও অর্জন করলো। খাদ্য রসায়ন সম্পর্কে তার আগ্র এতই বেড়ে উঠলো যে শেষ পর্যন্ত সে ম্যাসাচুসেটস্ স্টেট কলেজে ভর্তি হলো। এরপ যখন নিউইয়র্ক কোকো এক্সচেঞ্জ, কোকো আর চকোলেট সম্বন্ধে একশ ডলার পুরস্কা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলো কলেজ ছাত্রদের জন্য—কে জয়ী হলো জানেন? হ ঠিকই ধরেছেন! হারল্যান হাওয়ার্ড।

কাজকর্ম জোগাড় করতে না পেরে সে তার বাড়ি ম্যাসাচুসেটসের আমর্হাস্টের ৭৫ নর্থ প্লেজাণ্ট স্ট্রীটে একটা ছোট্ট গবেষণাগার খুললো! কিছুদিনের মধ্যে দেশে একা নতুন আইন চালু হলো যে দুধের মধ্যেকার বীজাণু গুনতে হবে। হারল্যা হাওয়ার্ডকে কিছুদিনের মধ্যেই আমহার্স্টের অন্তত কুড়িটা প্রতিষ্ঠানের দুধের বীজাণ গোনার কাজে দেখা গেল। তাকে দুজন সহকারীও রাখতে হলো।

পঁচিশ বছর পরে এই ছেলেটির কি হবে জানেন? এখন যারা ব্যবসা পরিচালন করে চলেছেন সেই সব মানুষ ততদিনে অবসর নেবেন বা হয়তো পরলোকে যাবেন, আ তাদের স্থান নেবেন আজকের হাস্যোজ্জ্বল কারিৎকর্মা তরুণ ছেলেরাই। পঁচিশ বছ পরে আজকের হারল্যান হাওয়ার্ড হয়ে উঠবে তার পেশায় একজন অতি বিখ্যাত মানু অন্য দিকে তার সহপাঠিরা, যাদের সে আইসক্রিম বিক্রী করতো তারা হয়তো বেকা

থেকে সরকারকে অভিসম্পাত দিয়ে চলবে। হারল্যান এ. হাওয়ার্ডও হয়তো কোন সুযোগ পেতনা যদিনা সে একটা একঘেঁয়েমি ভরা কাজকে আনন্দময় করে তুলতে চাইতো।

বেশ ক'বছর আগে আর একজন তরুণও তার কাজ নিয়ে একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হয়েছিলো। তার কাজ ছিল কারখানার লেদ মেসিনে বল্টু তৈরি করা। ছেলেটির নাম ছিলো শ্যাম। কাজ ভালো লাগতো না বলেই শ্যাম কাজ ছেড়ে পালাতে চাইতো, কিন্তু তার ভয় ছিল অন্য কাজ যদি না পায়। কাজটা তাই করে যেতে হবে বলেই শ্যাম ঠিক করলো কাজকে আনন্দময় করে তুলতে হবে এই ভেবেই সে তার পাশের মেসিন চালকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লো। দুজনে পাল্লা দিয়ে বল্টু বানাতে আরম্ভ করলো। দুজনে দেখতো কে বেশি বানিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা ফোরম্যানের নজরে পড়লো। তিনি শ্যামের কাজের গতিতে দারুণ খুশি হয়ে তাকে আরও ভালো কাজে লাগালেন। এই হলো পরপর কতকগুলো পদোন্নতির সুরু। ত্রিশ বছর পরে, শ্যাম—স্যামুয়েল ভকলেন—হলেন বল্ডুইন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের প্রেসিডেন্ট। তিনি সারা জীবন ধরেই ওই মেকানিক থেকে যেতেন যদিনা নিজের কাজকে আনন্দময় করে তুলতে চাইতেন।

বিখ্যাত বেতার সংবাদ ঘোষক এইচ. ভি. ক্যাল্টেনবর্ণ একবার আমাকে বলেন কিভাবে তিনি নীরস একটা কাজকে আনন্দময় করে তোলেন। তার বাইশ বছর বয়সের সময় তিনি জাহাজে আতলান্টিক পাড়ি দেন। কিছু গবাদি পশুর তদারকির কাজ করেন। বাইসাইকেলে ইংল্যান্ড পরিক্রমার পর প্যারিস শহরে পৌঁছন ক্যাল্টেনবর্ণ। নিজের ক্যামেরা মাত্র পাঁচ ডলারে বাঁধা রেখে তিনি প্যারীর সংস্করণ নিউইয়র্ক হেরাল্ডে একটা কাজের আবেদন করে বিজ্ঞাপন দেন। কাজও একটা জুটে যায়—ছবি দেখার স্টিরিওস্কোপ মেশিন বিক্রি। মেশিনের কথাটা বয়স্ক মানুষেরা সবাই জানেন দুটো ছবি ঘোরাতে থাকলে একটা হয়ে ত্রিস্তর ছবি হয়ে উঠে।

ক্যাল্টেনবর্ণ শেষ পর্যন্ত ওই মেশিন প্যারীর দরজায় দরজায় ঘুরে বিক্রী করতে আরম্ভ করলেন—অসুবিধাও ছিলো কারণ ফরাসীতে তিনি কথা বলতে পারতেন না। তা সত্ত্বেও কিন্তু তিনি প্রথম বছরেই পাঁচ হাজার ডলার কমিশন পেয়ে সে বছরে ফ্রান্সের সবচেয়ে বেশি আয়ের বিক্রেতা হয়ে উঠলেন। ক্যাল্টেনবর্ণ আমায় জানিয়ে ছিলেন এমন কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব হয়েছিল একটা মাত্র কারণেই—আর সেটা হলো আত্মবিশ্বাস। হার্ভার্ডে এক বছর পড়াশুনা করার ফলেই এই আত্মবিশ্বাস তাঁর মধ্যে জন্ম নেয়।

তাহলে ফরাসী ভাষা না জানা সত্ত্বেও এ আত্মবিশ্বাস তাঁর এলো কি করে? আসলে কিভাবে বিক্রীর সময় কথাগুলো বলতে হবে সেটা তাঁর নিয়োগকর্তা চোস্ত ফরাসীতে তাঁকে লিখে দেওয়ার পর তিনি সেটা মুখস্থ করে রাখেন। কোন বাড়ির দরজায় ঘণ্টা বাজিয়ে দিতে গৃহকর্ত্রী দরজা খুললে, ক্যাল্টেনবর্ণ সুন্দর উচ্চারণে সেই মুখস্থ করা ফরাসীতে কথা বলে মেশিনটা ইঙ্গিত করতেন আর ছবিও দেখাতেন।

গৃহকর্ত্রী বাড়তি প্রশ্ন করলে তিনি শুধু টুপি তুলে বলতেন 'আমেরিকান…আমেরিকান' আর সঙ্গে লেখা সেই ফরাসী লেখাও দেখিয়ে দিতেন। গৃহকর্ত্রীরা আমোদ পেয়ে হাসতেন আর তার কাজও সমাধা হয়ে যেত। ক্যাপ্টেনবর্গ নিজেই স্বীকার করছেন কাজটা আদৌ সহজ ছিলোনা। তাহলে তার সাফল্যের কারণ কি? একটাই— নিজের কাজ সমাধা করার অদম্য উৎসাহ আর আনন্দময় করে তোলা। প্রতিদিন সকালে বাইরে বেরোনোর আগে তিনি একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন: 'ক্যাপ্টেনবর্গ, যদি খেতে চাও তাহলে এ কাজ তোমাকে করতেই হবে। আর করতে যখন হবেই তখন আনন্দেই সেকাজ করোনা কেন? নিজেকে কোন অভিনেতা ভেবে নাও আর মনে কর কোন মজাদার চরিত্রেই অভিনয় করছো।'

মিঃ ক্যাপ্টেনবর্গ নিজে আমায় বলেছেন প্রতিদিনের ওই স্বগতোক্তি তাঁকে যে কাজ একদিন ঘৃণা করতো তাতেই সফল হতে সাহায্য করেছে। আমেরিকান তরুণদের কাছে তার পরামর্শ হলো, 'প্রতিদিন কাজে নামা চাই। শারীরিক ব্যায়ামের মত আমাদের দরকার মানসিক কিছু ব্যায়ামও। তাই প্রতিদিন কিছু স্বগতোক্তি করা ভালো।'

এটা কি কোন হাস্যকর ব্যাপার? মোটেই না। এটা সম্পূর্ণ মনোবিদ্যার ব্যাপার। আমাদের জীবন হলো আমাদের মন যা তৈরি করে, আমারা ঠিক তাই। ঠিক মত চিন্তার মধ্য দিয়েই যে কোন কাজ আপনি কম নীরস করে তুলতে পারেন। শুধু ভাবতে চেষ্টা করুন কাজকে আনন্দময় করে তুলতে পারলে তার বদলে কি পাবেন আপনি। একবার ভাবুন এতে আপনার জীবনের আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে উঠতে পারে কারণ আপনি আপনার জাগ্রত থাকার সময়ের শুধু অর্ধেকটাই কাজে ব্যয় করেন। মনে রাখার চেষ্টা করুন আপনার কাজকে আনন্দময় করে তুললে তাতে পদোন্নতি বা আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। আর তা না হলেও অন্ততঃ আপনার দৈনন্দিন অবসাদ দূর হয়ে আনন্দের পরশ পেতে পারেন।

॥ আটাশ ॥

অনিদ্রার প্রতিকার

অনিদ্রায় জন্য আপনার কি দুশ্চিন্তা হয়? তাহলে একথা জানতে আপনার হয়তো আগ্রহ জাগবে বিখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ স্যামুয়েল উইণ্টারমেয়ার জীবনে কখনও ভাল করে ঘুমোন নি।

স্যাম উইণ্টারমেয়ার যখন কলেজে ঢোকেন তাঁর দুটো রোগ নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল—হাঁপানি আর অনিদ্রা। দুটোর কোনটাই তিনি সারাতে পারেন নি—তাই তিনি ঠিক করেন জেগে থাকার ভালো সুযোগটাই নেবেন। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে তিনি পড়াশোনা করবেন ভাবলেন। ফল কি হয়? তিনি সব ক্লাসেই সম্মান লাভ করলেন আর নিউ ইয়র্কের কলেজের বিখ্যাত বালক পণ্ডিত হয়ে ওঠেন।

আইন পড়ার সময়েও তাঁর অনিদ্রা গেলনা। তবু উইণ্টারমেয়ার চিন্তা করেন নি। 'প্রকৃতিই আমার দায়িত্ব নেবে, তিনি বলেছিলেন। হয়েও ছিল ঠিক তাই। অল্প ঘুম সত্বেও তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েনি এবং তিনি হয়ে ওঠেন এক খ্যাতনামা আইনজ্ঞ। তিনি আরও পরিশ্রম করতে থাকেন। কারণ অন্যরা যখন নিদ্রা যান তিনি তখন কাজ করতেন।

একুশ বছর বয়সেই স্যাম উইণ্টারমেয়ার বছরে পঁচাত্তর হাজার ডলার আয় করেছিলেন। কোর্টের তরুণ আইনজ্ঞরা তাই তাঁকে অনুকরণ করার জন্য ছুটেছিলেন। ১৯৩১ সালে তাঁকে একটামাত্র মামলার জন্য ফি দেওয়া হয় দশ লক্ষ ডলার! একেবারে নগদে! পৃথিবীতে এত টাকা ফি আর কাউকেই কেউ দেয়নি।

কিন্তু তাঁর অনিদ্রা সারেনি—মাঝরাত পর্যন্ত তিনি পড়তেন—তারপর ভোর পাঁচটায় উঠে চিঠি লিখতেন। মানুষ যখন ঘুম থেকে উঠত তাঁর কাজ তৎক্ষণে অর্ধেকটাই শেষ। তিনি একাশি বছর বেঁচেছিলেন। আশ্চর্য কথা এমন মানুষ, যিনি সারা জীবন প্রায় অনিদ্রায় কাটান। অথচ তিনি যদি এই অনিদ্রা সম্পর্কে ভাবনায় ভেঙে পড়তেন তাহলে নিঃসন্দেহে নিজের জীবন শেষ করে ফেলতেন।

আমরা জীবনের এক তৃতীয়াংশ সময় ঘুমিয়ে কাটাই—অথচ অনেকেই জানিনা ঘুম কাকে বলে। আমরা জানি এটা হল এক ধরনের অভ্যাস আর বিশ্রামের অবস্থা যাতে প্রকৃতি আমাদের এই বিশ্রামের সময় যত্ন করেন। কিন্তু আমরা জানি একজন লোকের কত ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন বা সত্যিই ঘুম চাই কি না।

অবিশ্বাস্য? তা হলে শুনুন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পল কার্ন নামে এক হাঙ্গেরীয় সৈন্যের মস্তিষ্কের সামনের দিকে গুলি লাগে। আঘাত থেকে তিনি রক্ষা পান। তবে আশ্চর্যের কথা তিনি অনিদ্রার শিকার হন। ডাক্তাররা সবরকম চেষ্টা করেন—সব রকম ওষুধ দেওয়া হয়—কিন্ত ফল একটাই কার্নের ঘুম আনানো সম্ভব হয়নি।

ডাক্তাররা জানালেন কার্ন বেশিদিন বাঁচবে না। কিন্তু সে তাঁদের বোকা বানাল। সে একটা কাজ পেল আর তার ফলে স্বাস্থ্য বেশ ভালো হয়ে উঠল। সে চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকলেও তার ঘুম আসতো না। তার ব্যাপারটা ডাক্তারী শাস্ত্রের এক রহস্য এবং ঘুম সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণাই পাল্টে দিয়েছে।

কারও কারও অন্যদের চেয়ে বেশি ঘুম দরকার। টসকানিনির দরকার হত মাত্র পাঁচ ঘণ্টা, অথচ ক্যালভিন কুলিজের দ্বিগুন লাগত। কুলিজ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এগারো ঘণ্টাই ঘুমোতেন। অর্থাৎ টসকানিনি তার জীবনের এক পঞ্চমাংশ সময় ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন আর কুলিজ জীবনের অর্ধেকটাই।

অনিদ্রার চেয়ে অনিদ্রার চিন্তাই আপনার ক্ষতি করে বেশি উদাহরণ হিসেবে আমার এক ছাত্রী ইরা স্যান্ডনারের কথাই বলি : ধারাবাহিক অনিদ্রার জন্য ইরা প্রায় আত্মহত্যা করতে চলেছিল।

ইরা স্যান্ডনার আমায় জানায়, 'আমি ভেবেছিলাম আমি পাগল হয়ে যাব। গোলমাল সুরু হয় গোড়ায় যখন আমি গাঢ় ভাবেই ঘুমোতাম—এমন কি অ্যালার্ম ঘড়ি বাজলেও আমার ঘুম ভাঙতো না। ফলে সকালে কাজে দেরী হয়ে যেত। আমার অফিসের মালিক জানালেন দেরী করলে চাকরি রাখা দায় হবে। আমি জানতাম আমি বেশি ঘুমোই।

'এক বন্ধু আমায় জানালো অ্যালার্ম ঘড়ির কথাটাই যেন বেশি করে ভাবি। এতেই অনিদ্রার সূচনা হল। অ্যালার্ম ঘড়ির যাচ্ছেতাই টিকটিক শব্দ আমার মাথা খারাপ করেছিল। তাতেই সারা রাত জেগে থাকতাম। আট সপ্তাহ এই রকম চলল। কি কষ্ট পেয়েছি বলে বোঝাতে পারব না। আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম পাগল হয়ে যাচ্ছি। কখনও কখনও মেঝের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়চারি করতাম আর জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ব ভাবতাম।

'শেষ পর্যন্ত একজন পরিচিত ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, 'ইরা আমি তোমায় সাহায্য করতে পারব না। কেউই পারবে না, কারণ এটা তুমি নিজেই সৃষ্টি করেছো। রোজ রাত্রে শুতে যাবে আর ঘুম আসছে কি না আসছে তা আদৌ ভাববে না। শুধু নিজেকে বলবে ; ঘুম না এলেও গ্রাহ্য করি না। সকাল পর্যন্ত জেগে থাকলেও কিছুই হবে না।' শুধু চোখ বন্ধ করে বলবে : 'যতক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকবো তখন কোন দুঃশ্চিন্তা করব না—আমি ঘুম চাই না, চাই বিশ্রাম।'

স্যান্ডনার বলেছিল, 'আমি তাই করলাম, আর দু সপ্তাহের মধ্যেই আবার ঘুমোতে লাগলাম। একমাসের মধ্যেই আট ঘণ্টা ঘুমোতে লাগলাম আর স্বাভাবিক হয়েও উঠলাম।'

ইরা স্যান্ডনার অনিদ্রার জন্য কষ্ট পায়নি। মেয়েটি কষ্ট পায় দুশ্চিন্তা করে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ নাথানিয়েল ক্লিটম্যান মানুষের ঘুম নিয়ে সবচেয়ে বেশি গবেষণা করছেন। বিশ্বে তিনি বিখ্যাত একজন নিদ্রা বিশেষজ্ঞ। তিনি স্বীকার করেছেন অনিদ্রায় মারা গেছেন এমন কারও কথা তাঁর জানা নেই। তিনি বলেছেন

দুশ্চিন্তাই মানুষকে কুরে কুরে খায় এবং শরীরকে দুর্বল করে ফেলে।

উদাহরণ হিসেবে বলছি, উনিশ শতকের নামি চিন্তাবিদ হার্বার্ট স্পেন্সার একটা বোর্ডিংএ থাকতেন এবং বকবকানিতে সবাইকে পাগল করতেন তাঁর অনিদ্রার কথা বলে। তিনি কানে ছিপি এঁটে শব্দ বন্ধ করে স্নায়ু শান্ত রাখতেন। একরাতে তাঁর সঙ্গে শুয়েছিলেন অক্সফোর্ডের প্রফেসর সেইশ। পরদিন স্পেন্সার জানালেন যে সারারাত তিনি ঘুমোননি। আসলে প্রফেসর সেইশ স্পেন্সারের নাক ডাকার শব্দে ঘুমোতে পারেন নি।

রাতে ভালো ঘুমোনোর জন্য প্রথম দরকার নিরাপত্তাবোধ। আমাদের মনে করতে হবে আমাদের চেয়ে বৃহত্তর কোন শক্তিই সকাল পর্যন্ত আমাদের দায়িত্ব নেবে। ডঃ টমাস হিসলপ বৃটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের বিখ্যাত মনরোগ চিকিৎসক বলেছেন: 'যা দেখেছি তাতে ঘুম আসার সবচেয়ে ভালো উপায় হল—প্রার্থনা। আমি একজন চিকিৎসক হিসেবেই এটা বলছি।' তিনি সব সময় প্রার্থনার দ্বারা নিরাপত্তাবোধ করতেন। সে সময় তিনি বাইবেল থেকে এই প্রার্থনাটি করতেন—স্বয়ং ভগবানই আমার মেষপালক, আমি আর কিছুই চাইনা।

অভিনেত্রী জেনেট ম্যাগডোনাল্ড আমায় বলেছিলেন যে তাঁর মনে যখন অবসাদ নামত তখন দুশ্চিন্তায় তাঁর ঘুম আসতো না। সে সময় বাইবেল পাঠ করে তিনি নিরাপত্তা বোধ করতেন।

কিন্তু আপনি যদি ধার্মিক না হন আর কঠিন ভাবেই জীবন কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন তাহলে শারীরিক উপায় নিন। তাঁর মত হল শরীরের সঙ্গে কথা বলা। সব রকম সম্মোহনের গোড়ার কথাই হল কথা বলা। যখন আপনি অনেকদিন ধরে ঘুমোতে পারেন না তখন মনে হয় আপনি নিজেই অনিদ্রাজনিত রোগটি এনেছেন। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে আপনার একমাত্র পথ হল এই সম্মোহন থেকে নিজেকে মুক্ত করা। নিজের দেহের পেশীদের বলে আপনি কাজ উদ্ধার করতে পারেন। আমরা জানি যে আমাদের মনও স্নায়ু পেশীগুলোর কাঠিন্য হেতু সহজ হতে পারেনা। তাই ঘুমের জন্য আমাদের পেশীগুলোকে সহজ করতে হবে। ডঃ ফিঙ্ক বলেছেন, কতগুলো বালিশ হাঁটু-এবং হাতের তলায় রেখে পাগুলো সোজা নুজি করে আমাদের হাত, পা, চোখ এবং পেশীগুলো সহজ হতে অভ্যস্ত করতে পারলে খুব শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়া সম্ভব হয়। ঠিক এইভাবে অভ্যাস করে আমি ভাল ফল পেয়েছি।

অনিদ্রা থেকে মুক্তি পাওয়ার সেরা উপায় হল নিজেকে বাগান করা। টেনিস, সাঁতার, গলফ ইত্যাদি খেলার মধ্য দিয়ে নিজেকে ক্লান্ত করে তোলা। ঠিক এই রকমই করতেন থিয়োডোর ড্রেজার। লেখক হিসেবে যখন তিনি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিলেন অনিদ্রার কথা ভেবে তিনি দুশ্চিন্তা করতেন। তারপর তিনি নিউ ইয়র্কের রেলে কাজ নিয়ে এমন পরিশ্রম করতেন যে ক্লান্তিতে ভালো করে খাওয়ারও সময় পেতেন না।

আমরা যদি যথেষ্ট ক্লান্ত থাকি তাহলে প্রকৃতিই হাঁটার ফাঁকেও আমাদের ঘুম

পাড়িয়ে দেবে। একটা উদাহরণ দিই, আমার যখন তেরো বছর বয়স আমার বাবা একটি গাড়ী ভর্ত্তি শুয়োর মিসৌরির সেন্ট জো শহরে চালান করেছিলেন। তিনি দুটো রেলের পাস পাওয়াতে আমাকে সাথে নিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত আমি কোন চার হাজার লোকের বড় শহর দেখিনি। যখন আমি ষাট হাজার লোকের সেন্ট জো শহরে নামলাম তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। ছতলা উঁচু বিশাল বাড়ী এবং মোটর গাড়ী দেখে আমি অবাক হয়ে ছিলাম! এখনও আমি মানসচক্ষে সেই গাড়ী এবং তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। সেই দিনটি ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর দিন। তারপর বাবা এবং আমি ট্রেনে করে মিসৌরির রেভেন উডে ফিরে আসি। রাত দুটোর সময় স্টেশনে নেমে চার মাইল হেঁটে আমরা খামারে পৌঁছাই। এটাই হল গল্পের আসল সত্য: আমি তখন এমন ক্লান্ত হই যে, হাঁটবার সময় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম, যেন আমি চলতি কোন ঘোড়ার পিঠে বসেই ঘুমিয়েছি। আর এখনও আমি বেঁচে আছি।

মানুষ যখন প্রচণ্ড ক্লান্ত থাকে তারা বজ্রপাতের শব্দেও ঘুমিয়ে পড়বে। স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ ফস্টার কেনেডী আমায় বলেছেন ১৯১৮ সালে পঞ্চম বৃটিশ বাহিনী যখন পশ্চাৎপসরণ করে, তখন তিনি দেখেছেন সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে চলতে চলতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের চোখের পাতা টেনে দেখা গেছে তাদের কোন সাড়া নেই, চোখের মণি উপর দিকে উঠে আছে। ডঃ কেনেডি বলেন, তারপর যখন আমার ঘুমের ব্যাঘাত হত, তখন আমার চোখের মণিকে ঠিক সেই অবস্থায় আনতে চেষ্টা করতাম এবং তখন কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তাঁর হাই উঠে ঘুম আসতো। এর উপর তাঁর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকতো না।

কোন মানুষ না ঘুমিয়ে আত্মহত্যায় সমর্থ হয়নি, কেউ পারবেও না। একটি মানুষের যতই মানসিক শক্তি থাক ঘুমতে তাকে হবেই। প্রকৃতি আমাদের খাদ্য বা জল ছাড়া যতদিন বাঁচতে দেয়, না ঘুমিয়ে তার চেয়ে ঢের কম দিনই দেয়।

আত্মহত্যা প্রসঙ্গে আমার একটি কথা মনে করিয়ে দেয়, ডঃ হেনরি লিঙ্ক তার 'মানবের পুনরাবিষ্কার' বইতে বলেছেন; একজন রুগী আত্মহত্যা করতে চাইছিল, ডঃ লিঙ্ক বুঝলেন কোন রকম উপদেশে কাজ হবে না। তারপর তিনি সেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষটিকে বলেছিলেন যদি আত্মহত্যা করতে চাও তাহলে বীরের মতই তা করার চেষ্টা কর! বাড়ির চারদিকে দৌড়তে থাক যতক্ষণ না পড়ে মারা যাও।'

লোকটা তাই করে, আর একবার নয় যতবার করে ততবারই তার ভালো লাগতে থাকে। ডঃ লিঙ্ক যা চাইছিলেন, তৃতীয় রাত্রে লোকটি শারীরিক ভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত সে এতই শ্রান্ত হয়ে পড়ে যে ঘুমিয়ে পড়তে দেরী হয় না। তারপর তিনি শরীর শিক্ষা বিভাগে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলায় অংশগ্রহন করেন। বর্ত্তমানে তিনি এত ভাল আছেন যে, চিরদিনের জন্য বেঁচে থাকার ইচ্ছা পোষণ করেন।

অতএব অনিদ্রার দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেতে পাঁচটি নিয়ম হল:

(১) যদি ঘুম না আসে তাহলে স্যামুয়েল উইণ্টারমেয়ারের মতই করুন। উঠে

বই পড়ুন বা কাজ করুন যতক্ষন পর্যন্ত না আপনার ঘুম পায়।

(২) মনে রাখবেন ঘুমের অভাবে কেউ মারা যায়নি। অনিদ্রা নিয়ে দুশ্চিন্তাই অনিদ্রার চেয়ে বেশি ক্ষতি করে।

(৩) প্রার্থনার চেষ্টা করুন।

(৪) শরীরকে সহজ করুন।

(৫) ব্যায়াম করুন—ক্লান্ত হলে সহজেই ঘুম আসবে।

॥ উনত্রিশ ॥

অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা দূর করার উপায়

সকলের অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা দূর করার উপায় যদি আমার জানা থাকত তাহলে এ বই লিখতাম না। আমি তাহলে বসে থাকতাম হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের পাশে। তবে একটা কাজ আমি করতে পারি : এ বিষয়ে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁদের কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করতে পারি আর কিছু বইয়ের নাম করতে পারি।

লেডিজ হোম জার্নালের করা এক সমীক্ষায় জানা গেছে আমাদের শতকরা সত্তর ভাগ দুশ্চিন্তাই অর্থনৈতিক। জর্জ গ্যালাপ বলেছেন যে সমীক্ষায় জানা যায় মানুষ ভাবে কিছু টাকা পয়সা হাতে এলেই আর তাদের সমস্যা থাকবে না—কেবলমাত্র শতকরা দশ ভাগ আয় বাড়লেই হল। কোন কোন ক্ষেত্রে এটা হয় বটে, তবে আশ্চর্যের কথা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটা খাটে না। উদাহরণ হিসেবে বলি, বাজেট সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, দরিদ্র কুলি, যার আয় বছরে হাজার ডলার তার থেকে সুরু করে একজন বড় চাকুরে যার আয় বার্ষিক এক লাখ ডলার তারও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন : 'আরও টাকা বাড়লেই মানুষের অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা যায় না। আমি বেশ লক্ষ্য করে দেখেছি টাকা পয়সা বেশি হাতে এলেই খরচও সেই অনুপাতে বাড়তে থাকে। এরকম হয় কেন? এর কারণ ওই সব মানুষ জানেনা কি ভাবে তাদের টাকা ব্যয় করতে হয়।' [আমি শেষের কথাটায় আপনাদের কিছুটা অখুশী করেছি তাই না? ভাল কথা, পরেবার আপনি যাতে অসন্তুষ্ট না হন তাই মিসেস স্টেপলেটন যা বলেছিলেন তাই মনে রাখবেন। তিনি বলেছিলেন, বেশীর ভাগ মানুষ ; কিন্তু আপনি নন। তিনি বলতে চেয়েছেন আপনার বোন, মামাতো ভাই এভাবে খুঁজলে হয়তো আরো ডজন খানেক পেতে পারেন।]

অনেক পাঠক হয়তো বলবেন, 'ওই কার্নেগী লোকটাকে তো আমার বিলের টাকা মেটাতে হয় না। আমার দায়িত্ব তো আর তাকে বহন করতে হয় না, আর আমার মাইনেতেও তাকে চালাতে হয় না। তা যদি হত তাহলে তিনি এমন ভাবে কথা বলতে পারতেন না।' তবে কথা হল আমারও অর্থকরী দুশ্চিন্তা ছিল। এককালে দশ ঘণ্টা ধরে কঠিন কায়িক পরিশ্রম করেছি মিসৌরীর খামারে। পরিশ্রমের জন্য ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছি। আর ওই হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বিনিময়ে কত পেয়েছি জানেন? ঘণ্টায় এক ডলার করে নয়, পঞ্চাশ সেণ্টও নয়—মাত্র পাঁচ সেণ্ট।

আমি জানি স্নানের ঘর আর জল ছাড়া কোথাও বিশ বিশ বছরটা কাটাতে কেমন লাগে। শূন্যের পনেরো ডিগ্রী নিচের তাপের কোন ঘরে শুয়ে থাকার যন্ত্রণা আমার জানা আছে। আমি এও জানি এক নিকেল (পাঁচ সেণ্ট) বাঁচানোর জন্য মাইলের পর মাইল হাঁটতে কেমন লাগে, যখন জুতো বলে কিছু থাকে না। পা হয় ক্ষত বিক্ষত পেটে থাকে না দানা।

অথচ ওই অবস্থাতেও কয়েকটা করে ডাইম (দশ সেণ্ট) বাঁচাতে পারতাম না— জমানোর কথা আমি ভাবতেই পারতাম না। আমি জানতাম বাঁচতে গেলে ব্যবসা

প্রতিষ্ঠানের মতই করতে হবে, পরিকল্পনা করে খরচ করতে হবে। কিন্তু আমরা বেশির ভাগই তা করিনা। লিও' সিমকিন, একজন বিখ্যাত প্রকাশক বলেছেন যে তাঁর পরিচিত একজন এই রকমই করে। সে শুক্রবার মাইনে পাওয়ার পর কোন দোকানে কিছু দেখলেই—যেমন একটা ওভারকোট কিনে ফেলে। তার মাথায় একদম খেলেনা বিদ্যুতের বিল, বাড়ি ভাড়া ইত্যাদি দিতে হবে। তার মত হল পকেটে যখন টাকা আছে তখন আর ভাবনা কি।

এখন ভাবা দরকার টাকাটা যখন আপনার তখন খরচ করার আগে পরিকল্পনাও আপনাকে করতে হবে বৈকি। কিন্তু কিভাবে পরিকল্পনা করবেন? নিচে আটটি নিয়মের কথা বলছি :

(১) **সব কিছু কাগজে লিখে ফেলুন।**

পঞ্চাশ বছর আগে আর্নল্ড বেনেট লন্ডনে একজন ঔপন্যাসিক হওয়ার বাসনায় যান, তিনি ছিলেন নিতান্তই গরীব। তাই তিনি তাঁর প্রতিটি পয়সার হিসাব রাখেতেন। টাকা কোথায় যাচ্ছে তিনি ভাবতেন? না। ব্যাপারটা তাঁর ভালো লাগতো। তাই বিরাট ধনী হওয়ার পরেও, বিখ্যাত হয়েও একাজ তিনি করে যান। তাঁর নিজের একটা প্রমোদতরীও ছিল।

বড় জন ডি· রকফেলার একখানা লেজার বই রাখতেন। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় প্রার্থনার আগে তিনি প্রতিদিনের হিসাব নিকাশ করতেন।

আপনি আর আমিও তাই করতে পারি। সারা জীবন ধরে? না, তা বলতে চাইনা। বাজেট বিশেষজ্ঞের মতামত অনুযায়ী আমরা যদি সমস্ত পাই পয়সার হিসাব পত্র প্রথম মাস থেকে অন্ততঃ তিনমাস পর্যন্ত রাখি, তাহলে টাকা কিভাবে খরচ হয় তা জানতে পারব। ও আচ্ছা আপনি তাহলে জানতে চান আপনার টাকা কোথায় গেল? ভাল কথা· তাই যদি আপনার মনে হয় তাহলে আপনি প্রতি এক হাজারের মধ্যে একজন। মিসেস স্টেপলেটন বলেছেন, বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা খুব স্বাভাবিক। সুতরাং তিনি ব্যয় সংক্রান্ত হিসেব নিকেশ একটা সাদা কাগজে লিখে রাখতে বলতেন। যখন তারা হিসেবটা দেখে তখন বিস্ময়ে বলে ওঠে : 'এই ভাবেই আমাদের টাকা পয়সাগুলো খরচ হয়?' এই কঠিন সত্যকে তারা অনুভব করেছিল। আপনি কি এটা পছন্দ করেন? তাহলে এরকম করতে পারেন।

(২) **প্রয়োজন মনে রেখে পরিকল্পনা তৈরী করে ফেলুন।**

মিসেস স্টেপলেটন বলেছেন যে এমন দুটি পরিবার থাকতে পারে যাদের বাড়ি একই রকম, আয় এবং পরিবারের আকারও একই, তা সত্ত্বেও তাদের বাজেট একরকম না হতেও পারে। এক কারণ কি? এর কারণ হল মানুষ আলাদা। বাজেটকে তাই হতে হয় ব্যক্তিগত। বাজেট তৈরীর এই ধারণা আপনাকে মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে নিরাপত্তামূলক আনন্দ দিতে পারে এবং প্রধান ভাবে আবেগময় দুশ্চিন্তা থেকে মন স্বাধীন রাখতে সাহায্য করে।

কিন্তু এটা করা হবে কিভাবে? মিসেস স্টেপলেটন বলেছেন, 'যে সব মানুষ

তাদের জীবনকে বাজেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে তারা সব চাইতে সুখী।' প্রথমতঃ আপনাকে আপনার সব খরচের একটা তালিকা করতে হবে। এইভাবেই এগোতে হয়।

(৩) বিজ্ঞভাবে খরচ করতে শিখুন।

কথাটার উদ্দেশ্য হল আপনার টাকা ষোল আনা উশুল করুন।

(৪) আয় নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

(৫) সন্তানদের টাকা পয়সার প্রতি দায়িত্বশীল করে তুলুন।

(৬) কোনভাবেই কিছুতেই জুয়া খেলবেন না।

আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি মানুষ কি আশ্চর্য ভাবে জুয়া খেলে বড়লোক হতে চায়। তাই জুয়া খেলার আগে ভালো করে ভেবে দেখুন ভাগ্য আপনার কতটা সহায় হতে পারে। এ বিষয়ে বহু বইও পাবেন।

(৭) অসুস্থতা, অগ্নিকাণ্ড আর জরুরী খরচের ব্যবস্থা রাখবেন।

(৮) নিজের আয় যদি বাড়াতে না পারেন, তাহলে দুশ্চিন্তা করবেন না। মনে রাখবেন আব্রাহাম লিঙ্কন আর জর্জ ওয়াশিংটনেরও অর্থাভাব ছিল।

॥ ত্রিশ ॥

"কিভাবে আমি দুশ্চিন্তা জয় করি"

[কয়েকটি সত্য কাহিনী]

ব্ল্যাকউড ডেভিস বিজনেস কলেজের মালিক সি. আই. ব্ল্যাকউডের অভিজ্ঞতার কাহিনী এই রকম :

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে আচমকা আমার মনে হল পৃথিবীর সব সমস্যাই বুঝি আমার মাথা ভেঙে পড়েছে।

চল্লিশ বছর ধরে আমি এক স্বাভাবিক, সাধারণ জীবন যাপন করে এসেছিলাম। আমি এক ব্যবসায়ী ছিলাম। ছোটোখাটো সমস্যা যে আসতো না তা নয়—তবে সেসব আমি সামলাতে পারতাম। কিন্তু আচমকা আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ছটা মারাত্মক সমস্যা দেখা দিল। প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা হতে লাগল আমার। প্রথমতঃ আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভেঙে পড়ার মুখে এসে দাঁড়ায় কারণ ছাত্ররা সবাই যুদ্ধে যোগ দিতে গেল। মেয়েরাও যুদ্ধের সরঞ্জাম উৎপাদনের কাজে লাগল। আমার ছেলেও যুদ্ধে যাওয়ায় বাবা মার যা চিন্তা আমারও তাই হল।

আমার বাড়ির জলের কুয়োটা শুকিয়ে এসেছিল। আমি জানতাম নতুন কুয়ো বসানো কতটা ব্যয়সাধ্য। অন্ততঃ খরচ হবে পাঁচশ ডলার।

আমার বড় মেয়ে হাইস্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছিল। তার কলেজে যাওয়ার ইচ্ছা—কিন্তু অত টাকা পাব কোথায়? আমি জানতাম, না যেতে পারলে দুঃখে তার বুক ভেঙে যাবে

একদিন সন্ধ্যায় অফিসে বসে ভাবনায় তলিয়ে গেলাম। আমার দুশ্চিন্তা তাতে বাড়ল বই কমল না। আমার সব সমস্যার কথা লিখে ফেললাম। আমি জানতাম রাতারাতি এসব সমস্যা মেটার আশা নেই। তাই ভাবতে লাগলাম আমার এইসব সমস্যার কতখানি মোকাবিলা বর্তমান অবস্থায় করতে পারব। কতখানি লাভ ওই সমস্যায় পেতে পারি।

এইভাবেই ছটা মাস কেটে গেল। আমি ক্রমে ভুলেই গেলাম আমার সামনে ওই সমস্যা আছে। ছমাস পরে আগের লেখা কাগজখানা আমার হাতে পড়লে সেটা পড়ে ফেললাম।

আমার সমস্যাগুলো কাটলো এইভাবে :

আমি আমার কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করছিলাম। অথচ দেখলাম এই সব কলেজকে সরকার বয়স্ক শিক্ষার কেন্দ্র করে তোলার ব্যবস্থা করলেন আর আমার কলেজও ছাত্রে ভরে গেল।

ছেলের ব্যাপারেও দেখলাম আমার দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না। সে যুদ্ধ থেকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসে।

বাড়ির কিস্তি নিয়ে ভাবনাও কেটে গেল। আমার মেয়েও কলেজে সহজেই ভর্তি হয়ে পড়াশুনো করতে লাগল।

এই কারণেই আমার পরিচিত সকলকেই বলি, যে সব ব্যাপার নিয়ে আমরা দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়ি তার শতকরা নিরানব্বই ভাগই ঘটে না।

এবার রোজার ডব্লিউ ব্যাবসনের (বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ) তাঁর কাহিনী শুনুন

আমি যখন দেখি বর্তমান কোন অবস্থায় অবসাদগ্রস্ত আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি, আমি সঙ্গে সঙ্গেই সব দুশ্চিন্তা দূর করতে পারি।

কিভাবে তা করি শুনুন। আমার পাঠাগারে ঢুকে চোখ বুঁজে ফেলি—তারপর কোন একটা বইয়ের তাকের কাছে এগিয়ে যাই। ওই তাকটা ইতিহাসের বইয়ে ঠাসা। এরপর চোখ বুঁজেই যে কোন একখানা বই টেনে নিই, আর সেইভাবেই সেটা বইটা খুলে ফেলি। তারপর চোখ খুলে একঘণ্টা ধরে বইখানা পড়ে চলি। যতই পড়ি ততই উপলব্ধি করি পৃথিবীর বুকে কি যন্ত্রণা ছিল সেকালে। সভ্যতা কিভাবে টলায়মান অবস্থায় ছিল। ইতিহাসের পাতায় শুধু ছড়িয়ে আছে বিয়োগান্ত সব যুদ্ধের বর্ণনা, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র, অত্যাচার আর মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতার বিবরণ। একঘণ্টা এইভাবে ইতিহাস পাঠ করে আমি বুঝতে পারি যে এখনকার অবস্থা খারাপ হলেও সেকালের তুলনায় তা কত ভালো! এই চিন্তাই আমাকে বর্তমানের অবস্থা মোকাবিলা করার সাহস এনে দেয়। আমি বুঝতে পারি পৃথিবী এগিয়ে চলেছে এবং আরও ভালো হচ্ছে!

* * * * *

'পাঁচটি উপায়ে আমি আমার দুশ্চিন্তা দূর করেছিলাম।'—বলেছিলেন প্রফেসর উইলিয়াম লিও ফেলপস্।

তাঁর কাহিনী শুনুন এবার:

আমার চব্বিশ বছর বয়সে আচমকা আমার দৃষ্টিশক্তি হারাতে বসেছিলাম। তিন চার মিনিট বই পড়লেই মনে হত চোখে কেউ সূঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে বই না পড়লেও অনুভূতিটা আমায় পাগল করতে সুরু করে। নিউইয়র্কের সেরা চোখের চিকিৎসককে দেখালাম কিন্তু কোন উপকার হল না। বিকেল সাড়ে চারটে বাজলেই শোবার কথা ভাবতাম। প্রচণ্ড ভীত হয়ে উঠলাম আমি। ভাবলাম শিক্ষকের কাজ ছেড়ে হয়তো মজুরের কাজই আমায় নিতে হবে। তারপরেই একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটে গেল—শারীরিক যন্ত্রণার উপর মনের প্রতিক্রিয়া কত সেটা টের পেলাম। আমায় চোখের অবস্থা যখন প্রচণ্ড খারাপ তখনই কিছু আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটদের সামনে বক্তৃতা দেবার আহ্বান পেলাম। হল ঘরখানায় গ্যাসের ঝোলানো আলো থাকায় চোখে এতই যন্ত্রণা বোধ করছিলাম যে মেঝের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। অথচ আশ্চর্য কথা যে আধঘণ্টা বক্তৃতা করলাম ততক্ষণে চোখে কোন যন্ত্রণা ছিল না। আমার বক্তৃতা শেষ হতেই আবার যন্ত্রণা সুরু হল।

আমি বুঝলাম কোন কাজে অন্যমনস্ক থাকলে আমার যন্ত্রণা থাকবে না। হয়তো তাতে সেরে উঠব। নিঃসন্দেহে এ রোগ শরীরের উপর মনের।

আমি তাই অন্যমনস্ক থাকার চেষ্টা করতে লাগলাম। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অবাক হয়ে দেখলাম রোগ সেরে গেছে।

আমি এরপর থেকে নিচের পাঁচটি উপায়ে দুশ্চিন্তা দূর করতাম :

(১) প্রতিদিন আমি বাঁচার মতই বাঁচতে চাইতাম—সব কিছুরই তাই শেষ দেখতে চাইতাম।

(২) যখনই কোন রকম অবসাদে ভেঙে পড়তাম সেই সময় ডেভিড অ্যালেক উইলসনের প্রেরণাদায়ক 'কালাইলের জীবনী'···বইয়ে এমনই মশগুল হয়ে পড়তাম যে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তার কথাই ভুলে যেতাম।

(৩) যখনই কোন কারণে মন ভালো থাকতো না তখন শারীরিক পরিশ্রমের খেলায় অংশ নিতাম।

(৪) কাজ করতে করতে বিশ্রাম নেওয়াই আমার নীতি। এতেই আমার সব অবসাদ কেটে যায়।

(৫) আমি সব সময় সমস্যাকে তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে চাই। দুমাস পরে যখন এ ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হবে না তখন এই মুহূর্তে তা নিয়ে ভাববো কেন?

* * * *

এবার আর. ভি. সি. বডলের কথা শুনুন :

১৯১৮ সালে পৃথিবীর সব কিছুকেই আমি এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করেছিলাম। এই সময় আমি আমেরিকা ত্যাগ করে চলে যাই পশ্চিম আফ্রিকায় আর সেখানে গিয়ে বাস করতে সুরু করি আরবদের মধ্যে। সেখানে বাস করি প্রায় সাত বছর। থাকতে থাকতে ওখানকার যাযাবর মানুষদের ভাষাও আমি আয়ত্ত করে নিই। শুধু তাই নয়, তাদের পোশাকও পরতে আরম্ভ করি। তাদের মত খাদ্যাভ্যাসও গড়ে তুলে তাদের জীবনধারণের নিয়মও মানতে থাকি। গত বিশ শতাব্দী ধরে ওদের জীবনধারার কণামাত্রও পরিবর্তন ঘটেনি। ভেড়ার পালের মালিক হয়ে আমি ওদেরই মত তাঁবুর মধ্যে মেঝেয় শুয়ে রাত কাটাতাম। বেশ মনোযোগ দিয়ে আমি ওদের ধর্মও লক্ষ্য করতে থাকি। এরপর আমি একখানা বই ও এসম্পর্কে লিখে ফেলি। বইটির নাম 'দি মেসেঞ্জার।'

আমার বলতে কোন বাধা নেই যে ওই সাতটা বছরই হল আমার জীবনের সবচেয়ে শান্তিময় আর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের দিন।

আমার জীবনে বেশ ভাল রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ ইতিমধ্যেই ঘটেছিল। আমার জন্ম প্যারী শহরে। আমার বাবা মা ইংরাজ। ফ্রান্সে আমি প্রায় ন'বছর বাস করেছিলাম। এরপর আমি ঈটনে পড়াশোনা করি, পরে স্যাণ্ডহার্স্টের সেনা কলেজে। এরপর ব্রিটিশ সেনাদলের একজন সামরিক অফিসার হিসেবে আমি ভারতে যাই। ভারতে গিয়ে পোলো খেলে, শিকার করে, হিমালয় পর্বতের আনাচে কানাচে ঘুরে বেশ

ভালভাবেই আমার সময় কেটেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণও আমি করি তারপর প্যারীর শান্তি আলোচনাতে সামরিক অ্যাটাশে হয়ে অংশ নিই। সেখানে যা দেখি তাতে নিদারুণ আঘাত পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই। চার চারটি বছর ধরে পশ্চিমী রণাঙ্গণে কশাই খানার মত হত্যাকাণ্ড চালানোর পর মনে করেছিলাম মানুষ বুঝি সভ্যতাকে বাঁচানোর জন্য লড়াই করতে চাইছে। কিন্তু প্যারীর শান্তি আলোচনায় আমি দেখলাম স্বার্থপর মানুষ আর তথাকথিত রাজনৈতিক নেতারা কিভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ বপন করে চলেছিলেন—প্রত্যেক দেশ তাদের নিজেদের স্বার্থে যা পড়েছিল তাই দখল করে চলেছিল। এই জঘন্য কাজের ফলশ্রুতিতে জন্ম নিতে চলেছিল জাতীয় বিরোধিতা আর গোপন কূটনৈতিক চাল এবং ষড়যন্ত্র।

যুদ্ধ, সেনাবাহিনী, সমাজ সব কিছুতেই আমার প্রচণ্ড ঘৃণা জমে গেল। জীবনে ওই প্রথম আমাকে নিদ্রাবিহীন রাত কাটাতে হল, কি করব আমি ঠিক করে উঠতে পারলাম না। লয়েড জর্জ আমাকে বললেন রাজনীতি করতে। তাঁর উপদেশ অনুযায়ী কাজ করব ভাবার সময়েই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। আর ঠিক তারই ফলে পরের সাত বছরের জন্য আমার জীবনটাই বদলে গেল। টেড লরেন্স অর্থাৎ লরেন্স অব অ্যারেবিয়ার সঙ্গে কয়েক সেকেণ্ডের কথাতেই সেটা ঘটে গেল। লরেন্স প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালের এক আশ্চর্য প্রতীক। আরব দেশেই তার কাজ আর জীবন কেটেছে। তিনি আমাকেও তাই করতে বললেন।

যাই হোক আমি সেনাবাহিনী ত্যাগ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। অন্য কেউ তো আমায় নেবেনা, তাই লরেন্সের কথা মতই আরব দেশে চলে গেলাম আর ওদের মধ্যেই জীবন কাটাতে চাইলাম। ওরা জীবনকে সর্ব শক্তিমানের নির্দেশ বলেই ভাবে অযথা দুশ্চিন্তা করে না। আমাকেই ওরা তাই করতে বলল। তবে বিপদের সময় তারা সাহসের সঙ্গেই তাকে মোকাবিলা করে। একবার সাহারায় প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাতেও তাই হয়। প্রচণ্ড সেই ঝঞ্ঝাতেও তারা হাল ছাড়েনি। বহু ভেড়া মারা যায় তাদের, তবুও তারা ভেঙে পাড়েনি।

আর একবার মোটরে মরুভূমি পার হওয়ার সময় দেখা যায় তেল কম নেওয়া হয়েছে। আমি শঙ্কিত হয়ে উঠি কিন্তু আরবরা বলে ওঠে ভয় পেও না, এটাই সর্ব শক্তিমানের ইচ্ছা। যা হওয়ার তাই হবে।' এরপর আমাদের হেঁটে ফিরতে হয় কিন্তু ওরা ভেঙে পড়েনি। গান গাইতে গাইতেই সকলে দীর্ঘ ওই মরুপথ অতিক্রম করে।

যে সাত বছর আমি সাহারায় ওদের সঙ্গে কাটাই সেই সময়ই আমার জীবনের সেরা সময়। যতদিন আমি সেখানে ছিলাম আমার কোনই দুশ্চিন্তা ছিলনা।

অনেক বলেন দুর্ভাগ্যকে মেনে নেওয়া দুর্বলতা। হয়তো তাই, বা তাই নয়। তবে আমার জীবনেই আমি উপলব্ধি করেছি যে হাজার ওষুধ খেয়েও যে অবস্থা আমি পাইনি, সাত বছর সাহারায় থেকে আমি তাই পেয়েছি।